চৈত্র, ১৩৩১

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ওঁ

প্রণবের ব্যাখ্যা

সত্যভূষণ শ্রীধরণীধর শর্ম্মা

১৩৩০ সালের মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" (পৃষ্ঠা ২৩১—৩২) প্রকাশিত "প্রণবাদিতে সকলেরই অধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে—"হিন্দুদিগের অন্য সংখ্যাতীত বিষয়ে বিরোধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকারে হিন্দুমাত্রেই একমত। ব্রাহ্মণ-পরিত্যক্ত হিন্দু আছে ব্রাহ্মণত্যাগী হিন্দু নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে উৎপত্তিকুল ও সম্প্রদায় অনুসারে যতই ভেদ থাকুক না কেন, ওঁকার ও গায়ত্রী গ্রহণে ব্রাহ্মণ নামধারী ব্যক্তি মাত্রেই একমত।" বিষয়টীর সবিস্তার আলোচনার জন্য বর্ত্তমান প্রস্তাবের অবতারণা।

যদি খ্রীষ্টিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তোমার ধর্ম্ম কি, খ্রীষ্টিয়ান তাহার ধর্ম্মমূলক বিশ্বাস একে একে বর্ণনা করিতে পারিবেন। সেই বিশ্বাস যাহার আছে সে খ্রীষ্টিয়ান, যাহার নাই সে খ্রীষ্টিয়ান নহে। মুসলমানকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে মুসলমান কলমার আবৃত্তি করিবেন। বৌদ্ধ পাঁচশীলা পড়িবেন। কিন্তু হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলে, এমন কোন উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না যে, একজন হিন্দু যাহা হিন্দুধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বলিয়া উল্লেখ করিবেন, তাহা অপর কোন হিন্দু বিনা আপত্তিতে তথাস্তু বলিয়া গ্রহণ করিবেন। পুনর্জ্জন্ম, কর্ম্মফল প্রভৃতি যে সকল মতে সাধারণতঃ হিন্দুদিগের বিশ্বাস, তাহাতে সাধারণতঃ বৌদ্ধদিগেরও বিশ্বাস। এজন্য ঐ সকল মত হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব বলিয়া উল্লেখের অযোগ্য।

এরূপ স্থলে অন্য পন্থা অবলম্বন না করিলে, হিন্দুত্ব যে কি, তাহার নির্দ্ধারণ অসম্ভব। প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক যে, হিন্দু এক জাতির নাম ও হিন্দু এক ধর্ম্মের নাম। এই ভারতবর্ষে খ্রীষ্টিয়ান মুসলমান ভিন্ন অপর যে সকল লোক

বাস করে, তাহাদের সাধারণ জাতিবাচক নাম হিন্দু। এ নাম প্রাচীন নহে। মুসলমান প্রভাবের কালে এই নামের সৃষ্টি না হইলেও ইহার এদেশে সাধারণে প্রচার হয়। প্রাচীন পারস্য ভাষায় সকারের স্থলে 'হ'কার উচ্চারিত হইত, যেমন এখনও পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়। তদনুসারে ভারতের পশ্চিম সীমাস্থ প্রাচীন সিন্ধুনদই প্রাচীন পারষিকের নিকট 'হিন্দু' বলিয়া পরিচিত ছিল। জেন্দা বেস্তায় 'হপ্ত হিন্দ' শব্দের উল্লেখ আছে, এ কথা তদ্বিষয়ক পণ্ডিতেরা বলেন। এই হিন্দু শব্দই শব্দের আদিতে হ'কার উচ্চারণে অক্ষম গ্রীকদিগের মুখে 'ইন্দস' ইন্দিয়া এই আকার ধারণ করে। ইদানীন্তন পারস্য ভাষায় কৃষ্ণবর্ণ এই অর্থে হিন্দু শব্দের প্রচলন আছে। ভারতবাসী অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া পারস্যবাসীর নিকট হিন্দু। তন্ত্র বিশেষে উক্ত হইয়াছে যে, "হীনং দূষতীতি হিন্দুঃ।" সে যাহা হউক, খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান ভিন্ন ভারতবাসীই যে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী, ইহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। ভুটিয়া, পাহাড়ী, কুকী প্রভৃতিকে বর্ত্তমান অবস্থায় হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া কোন মতেই উল্লেখ করা যায় না। ইহা স্পষ্ট যে, এক দিক হইতে চাহিলে হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ কোন সাধারণ বন্ধনী দেখিতে পাইবেন না।

অতএব হিন্দুর সাধারণ বন্ধনী আবিষ্কারের জন্য অন্য দিক হইতে অনুসন্ধান আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ভিন্ন হিন্দু নাই। হিন্দুনামধারী যাহাদিগকে ব্রাহ্মণ পরিত্যাগ করেন, তাহারাও ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ ও অমান্য করেন না। ব্রাহ্মণত্যক্ত হিন্দু আছে; কিন্তু ব্রাহ্মণত্যাগী হিন্দু নাই। ব্রাহ্মণগণ পঞ্চ দ্রাবীড় ও পঞ্চ গৌড় ও তাহার শাখা-প্রশাখা লইয়া বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। যৌন সম্বন্ধের কথা দূরে থাকুক, এই সকল শ্রেণীর মধ্যে সহভোজন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ; এবং ভক্ষ্যাভক্ষ্যের নিয়মও বিভিন্ন। কিন্তু যেমন ব্রাহ্মণ ভিন্ন হিন্দু নাই; তেমনই প্রণব ও গায়ত্রী ভিন্ন ব্রাহ্মণ নাই। যেমন হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, তেমনই সমস্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে ওঁকার গায়ত্রীর প্রাধান্য সর্ব্ববাদিসম্মত। বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়বিধ শাস্ত্রেই প্রণব ও গায়ত্রীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। গায়ত্রী সপ্রণব। ওঁকার উচ্চারণের পরে গায়ত্রীর উচ্চারণ। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ত্যাগী সন্ন্যাসী, তাঁহারা শিখা সূত্রের সহিত গায়ত্রী ত্যাগ করিলেও প্রণব ত্যাগ করেন না। এজন্য ওঁকারকে হিন্দুধর্ম্মের সামান্যগুণ এবং অন্য ধর্ম্মের সহিত প্রভেদক বিশেষ গুণ বলিয়া উল্লেখ দোষাবহ নহে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষে সপ্রণব মন্ত্রে ব্যবহার দেখা যায়; কিন্তু শুদ্ধ ওঁকারের ব্যবহার অবিদিত। যদি বা কুত্রাপি ব্যবহার থাকে, তাহা হইলেও প্রচলিত বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহার প্রাধান্য লক্ষিত হয় না। অন্ততঃ হিন্দুদিগের মুখ্য শাস্ত্র বেদে যেরূপ ভাবে ওঁকারের ব্যবহার ও পরমার্থ সাধনে প্রয়োগ, তাহা অন্যত্র নাই—এ কথা প্রত্নতত্ত্ববিদের আশঙ্কাশূন্য। এ কারণ হিন্দু ধর্ম্মের মর্ম্ম আবিষ্কারার্থে ওঁকারের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ যথাযথ ভাবে আলোচ্য।

হিন্দুগণ সাধারণতঃ নিজধর্ম্মকে সনাতন বলিয়া গ্রহণ করেন। অর্ব্বাচীনশব্দ মূলতঃ যাহার অর্থ পশ্চাদ্বর্ত্তী তাহা অধম এই অর্থে ব্যবহৃত। এক বেদ শাস্ত্রই নিত্য বা সনাতন বলিয়া গৃহীত। বেদের নিত্যতা সম্বন্ধে বেদোক্তি আছে। যথা—

যো ব্রহ্মাং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ
বেদাংশ্চ প্রহিনোতি তস্মৈঃ।

—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ। ৬।১৮

অর্থাৎ যিনি জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার অন্তরে বেদ সকল প্রেরণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে দ্রষ্টব্য যে—পরমার্থ-জ্ঞান সহজ জীব-বুদ্ধির অপ্রাপ্য। সেই জ্ঞান বিনা জীবের শ্রেয়ঃ সিদ্ধ হয় না। যাহার বাঙ্ময় প্রকাশের নাম শ্রুতি (১) তাহা পরমেশ্বরী নিখিত পুস্তিকারূপে ব্যক্তি বিশেষে সমর্পণ অথবা হঠাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষের মুখ হইতে নির্গত করেন নাই। সেই জ্ঞান তাঁহার আদেশে যিনি সৃষ্টি করেন, তাঁহার দ্বারাই জীব (২) কুলে সর্ব্বকালে প্রচারিত রাখিয়াছেন—ইহাই বেদের অভিমত এবং এই জন্যই বেদ নিত্য। শব্দ সৃষ্টির পূর্ব্বেও বেদ। সেই বেদ নিত্য বলিয়া কোন বিশেষ স্থানে, কালে, সমাজে বা ব্যক্তিতে ইহার পর্য্যবসান সম্ভবপর নহে। বেদে যে সকল নাম আপত-দৃষ্টিতে ব্যক্তির নাম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, তাহা কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম নহে। ব্যক্তি বিশেষের উদয় স্থান ও কাল বিশেষকে অপেক্ষা করে।

(১) ইংরেজিতে প্রতি বাক্য Revelation.

(২) "God has never kept Himself without a witness."

ব্যক্তির অভিব্যক্তির বা ব্যক্তি ভাবের আদি আছে, অন্ত আছে, স্থান নির্ণয় আছে। এজন্য নিত্য বেদে অনিত্য ব্যক্তির নাম আছে এরূপ হইলে, যে বেদ-বাক্যে সেই নামের উল্লেখ, সেই বাক্য যে ব্যক্তির সেই নাম তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা অদেশ-বর্ত্তী হইতে পারে না অর্থাৎ দেশ কালের অতীত বা তৎ-কর্ত্তৃক অপরামৃষ্ট নিত্য নহে। অতএব উক্ত প্রকারের নাম কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, ব্যক্তিত্বভাব বিশেষের নাম। সেই ভাবাপন্ন ব্যক্তি সর্ব্বকালে সর্ব্ব স্থানেই উদিত হইতে পারেন—ঐ প্রকার উদয়ের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। নিত্য যে বেদবাক্য তাহার অর্থ স্মরণ করিয়া তাহারই দেশকালপাত্রানুসারে প্রয়োগার্থে ব্যবহার ও পরমার্থ বিষয়ক স্মৃতি শাস্ত্র। পূর্ব্ব মীমাংসকগণের ইহাই অভিমত কি না, পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

হিন্দু গৃহীত অপর এক শ্রেণীর শাস্ত্র আছে, যাহার নাম তন্ত্র। বেদ যেমন ব্রহ্মাকে অবলম্বন করিয়া প্রস্থত, তেমনি তন্ত্রশাস্ত্র মহাদেব ও তাঁহার অংশ সম্ভূত ভৈরব-দিগকে অবলম্বন করিয়া প্রচারিত। বৈদিক আচার কাল সহকারে অসাধ্য হইয়াছে। এক্ষণে তান্ত্রিক আচারই ব্রাহ্মণ-প্রমুখ সমাজের একমাত্র আশ্রয়। আচার তান্ত্রিক হইলেও বিচার বেদ বিরুদ্ধ হইলে হেয়। ইহা সর্ব্বজনসম্মত। ইহাতে মতভেদ নাই।

প্রণব সর্ব্বশাস্ত্রানুসারে পরমাত্মার নামের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে প্রাপ্তব্য যে,

ওমিত্যে দুদ্গীথ মুপাসীত।
ও মিত্যুদ্গাতি তস্যোপব্যাখ্যানং॥

—খণ্ড ১।১।

অর্থাৎ ওম ইহাই উদ্গীথ। ইহাকে উপাসনা করিবে। ওঁ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সামগান করে। এজন্য ওঁকারের নাম উদ্গীথ। তাহারই এখানে উপব্যাখ্যান অর্থাৎ উপাসনার প্রকার বিভূতি ও ফল কথন। ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের উক্তি এই ঃ—

তদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্ঠং অস্মিন্ হি প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি। প্রিয় নাম গ্রহণ ইব লোকঃ। তদিহ ইতি পদং প্রযুক্তং অভিধ্যায়কত্বাৎ ব্যাবর্ত্তিতং শব্দ স্বরূপ মাত্রং প্রতীয়তে। তথাচ অর্চ্চাদিবৎ পরমাত্মনঃ প্রতীকং সম্পদ্যতে। এবং নামত্বেন প্রতীকত্বেন চ পরমাত্মোপাসন সাধনং শ্রেষ্ঠং ইতি সর্ব্ব বেদান্তেষু অবগতং। জপ কর্ম্ম স্বধ্যায়ান্তেষুচ বহু প্রয়োগাৎ প্রসিদ্ধমস্য শ্রৈষ্ঠং। (৩)

অর্থাৎ, "ওঁ, এই যে অক্ষর ইহা পরমাত্মার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নাম। ইহার প্রয়োগে তাঁহার প্রসন্নতা হয়—যেমন লোকের প্রিয় নাম গ্রহণে প্রসন্নতা। তবে এখানে ইতি শব্দের প্রয়োগ বশতঃ নাম ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ওঁকার শব্দ মাত্র অভিপ্রেত বলিয়া প্রতীত হইতেছে এবং প্রতিমাদির ন্যায় আত্মার প্রতীক বলিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। সর্ব্ব বেদান্তে প্রাপ্ত যে, এই প্রকার নাম ভাবে বা প্রতীক ভাবে পরমাত্মার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন। জপ কর্ম্ম ও স্বাধ্যায়ের আদ্যন্তে বহু প্রয়োগ বশতঃ ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রসিদ্ধ।" উদ্ধৃত আচার্য্য বাক্যানুসারে পরমার্থ সাধক স্বেচ্ছাক্রমে দুই ভাবের অন্যতর ভাবে ওঁকার গ্রহণে সক্ষম। এক ভাবে ওঁকার পরমাত্মার বাচক বা নাম এবং অন্য ভাবে তাঁহার অর্চ্চা, প্রতিমা, প্রতীক অর্থাৎ রূপক বা চিহ্ন। প্রথমোক্ত ভাবে ওঁকার অর্থযুক্ত। সেই নাম নিজের অর্থ দ্বারা বুদ্ধিকে পরমাত্মারই অভিমুখী করে। ওঁকার নামে বুঝায়—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা পরমেশ্বর। যাঁহার কার্য্য জ্ঞেয়, স্বরূপ অজ্ঞেয়, চিন্মাত্র সত্তা মাত্র, আনন্দ মাত্র। কবির উক্তি—

নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টে
কেবলাত্মনে।
গুণত্রয় বিভাগায় পশ্চাদ্।
ভেদমুপেয়ুষে॥

সত্ত্বরজস্তমঃ এই তিন গুণ মনের আড়াল করিয়া তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিলে তিনি একাক্ষর ওঁকার। এই তিনটী গুণ তাঁহারই শক্তি; তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে বর্ত্তাইতে অক্ষম। এজন্য ইহারা সত্তা বিহীন,—সত্তাস্বরূপ তিনি ইহাদেরও সত্তা। সেই সত্তা অখণ্ড, যেহেতু সত্তার দ্বারা সত্তার বিভাগ হওয়া অসম্ভব। আর অসত্তা যাহা নাস্তি তাহার দ্বারা বিভেদ বা অপর কিছুই হইতে পারে না। যাহা নাই তাহার কার্য্যও নাই—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে সমর্থ নহেন। উল্লিখিত শক্তি বা গুণের এক

(৩) ভাষ্যের অবশিষ্ট অংশ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অনাবশ্যক।

একটী ভিন্ন করিয়া তাঁহার বিশেষ রূপে গৃহীত হইলে তিনি ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্ত্তা, বিষ্ণু পালন কর্ত্তা ও মহেশ্বর লয় কর্ত্তা। যোগ সাধকের পক্ষে যিনি ওঁকার তিনিই ক্লেশ-কর্ম্মাদি বিরহিত সর্ব্বজ্ঞতার বীজ স্বরূপ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বর। "তস্যবাচকঃ প্রণবঃ" (৪) অর্থাৎ তাহার নাম হইতেছে প্রণব। "তজ্জপ স্তদর্থ ভাবনং॥" অর্থাৎ তাহার জপ ও তাহার অর্থ যে ঈশ্বর তাঁহার ভাবনা। তাহাতে যে কি হয় তাহা পরের সূত্রে প্রকাশিত; যথা—ততঃ প্রত্যক্ চেতনাধিগমোপ্যন্তরায়া ভাবাশ্চ; অর্থাৎ তাহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ বোধ ও তৎপক্ষে বিঘ্নের অভাব হয়। ভগবদ্গীতাতেও ইহাই প্রাপ্তব্য। যথা—

ওঁ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ্ মামনুস্মরণ্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং সযাতি পরমাং গতিং।

অঃ ৮।১৩

অর্থাৎ "ওঁ এই যে একাক্ষর ব্রহ্ম তাঁহাকে উচ্চারণ ও পরমেশ্বরকে যথোপদিষ্ট ভাবে স্মরণ পূর্ব্বক যিনি দেহত্যাগ করিয়া যান, তিনি পরম অর্থাৎ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠগতি যে মুক্তি তাহা লাভ করেন"। ভগবান মনুর ইহাই উপদেশ। যথা—

ক্ষরন্তি সর্ব্ব বৈদিক্যো জুহোতি যজতি।
অক্ষরত্বক্ষয়ং জ্ঞেয়ং ব্রহ্মচৈব প্রজাপতিঃ॥

অঃ ২।৮৪

অর্থাৎ, "বেদোক্ত ক্রিয়া কি হোম কি যাগ সকলেই স্বভাবতঃ এবং ফলতঃ নাশকে পাইবেন; কিন্তু জগতের পতি যে ব্রহ্ম, তৎস্বরূপ ওঁকারের নাশ কদাপি হয় না।"

(রামমোহন রায় কৃত অনুবাদ)

উদ্ধৃত স্মৃতির মূল যে শ্রুতি তাহা এই। যথা—

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তারণিং
ধ্যান নির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্ নিগূঢ় বৎ।

—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ ১।১৪

অর্থাৎ, নিজের দেহকে অরণি কি না অগ্নি উৎপাদনের কাষ্ঠ ও প্রণবকে উপরের অরণি করিয়া ধ্যানাভ্যাস রূপ ঘর্ষণ পূর্ব্বক কাষ্ঠ গুপ্ত অগ্নির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় দেবকে দর্শন করিবে।

আচার্য্যোক্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে অর্চ্চা, প্রতিমা ও প্রতীক শব্দের অর্থ চিন্তায় ওঁকার অবলম্বনে পরমার্থ সাধন সম্বন্ধীয় শ্রৌত উপদেশ অক্লেশে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা। অর্চ্চ শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত। এই শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিমা।

সাধন বা পূজাদি বিষয়ে প্রতিমা শব্দে চক্ষুর গোচর মূর্ত্তি বিশেষ বুঝায়। কিন্তু প্রণব, শব্দ বলিয়া শ্রুতি গোচর মাত্র, দৃষ্টিগোচর নহে। তবে প্রণব কি প্রকারে ব্রহ্মের প্রতিমা হইবার সম্ভাবনা? অতএব প্রতিমা শব্দের ধাতু প্রত্যয় অনুসারে যে অর্থ হয়, তাহাই অনুসন্ধেয়। প্রতিমীয়তে অনয়া ইতি প্রতিমা; অর্থাৎ যাহার দ্বারা মূলের বা আসলের সাদৃশ্য মাপা যায়, তাহাই প্রতিমা। উপাসনার সৌকর্য্যার্থে ধরা যাউক যে, ব্রহ্মের প্রতিমা হইতেছে শব্দ। এইটি ধরিয়া লইয়া তবে প্রণবকে ব্রহ্মের প্রতিমা বলা নির্দ্দোষ। নতুবা ব্রহ্মের প্রতিমা আছে, এ সিদ্ধান্ত শ্রুতিবিরোধ বশতঃ দোষাবহ। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (অঃ ৪।১৯।) দেখাইতেছেন যে,

নতস্য প্রতিমাস্তি যস্যনাম মহদযশঃ।

এখানে ভাষ্যে প্রাপ্তব্য যে, "তস্যৈব ঈশ্বরস্য অখণ্ড সুখানুভবত্বাৎ এতাদৃশ দ্বিতীয়াভাবাৎ প্রতিমা উপমানাস্তি। যস্যনামমহদ যশঃ=যস্য (অর্থাৎ) ঈশ্বরস্য নাম (অর্থাৎ) অভিধান মহৎ (অর্থাৎ) দিগাদ্যনবচ্ছিন্নং পরিপূর্ণং যশঃ (অর্থাৎ) কীর্ত্তিঃ"। অর্থাৎ ঈশ্বর অখণ্ড সুখের অনুভবত্ব; এজন্য তদ্রূপ দ্বিতীয়ের অভাববশতঃ তাঁহার প্রতিমা অর্থাৎ উপমা নাই। সেই ঈশ্বরের নাম মহদ্ যশঃ, অর্থাৎ দিক আদির দ্বারা অবচ্ছেদশূন্য সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ যশ, অর্থাৎ কীর্ত্তি। সুবোধ্য করিবার জন্য মূলে বিসন্দিপূর্ব্বক কএকটী চিহ্ন ও "অর্থাৎ" শব্দ কয়েকবার সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পণ্ডিত-গণ স্পর্দ্ধা ক্ষমা করিবেন। এখানে প্রতিমা শব্দ উপমা অর্থে আচার্য্য গৃহীত। এইরূপ অর্থভেদ গ্রহণেই উভয়ত্র এলাক্যত্ব সংরক্ষিত। এক্ষণে প্রতীক শব্দের অর্থ চিন্তনীয়। আচার্য্যপাদ প্রণবকে ব্রহ্মের প্রতীক বলিতেছেন, অথচ প্রণবে ব্রহ্ম উপাসনায় মুক্তি—ইহাও শ্রুতির উপদেশ বলিতেছেন। যথা—

তানি এতানি উপাসনানি সত্ত্ব শুদ্ধি করত্বেন বস্তু তত্ত্বাবভাবকত্বাৎ অদ্বৈত জ্ঞানোপকারকাণি। আলম্বন

(৪) পাতঞ্জল যোগসূত্র। ১ম পাদ.২৭ ও পরবর্ত্তী সূত্র। ক্লেশ-অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগদ্বেষ, অভিনিবেশ।

বিষয়াকত্বাৎ সুখ সাধ্যানিক।—ছান্দোগ্য ভাষ্য ভূমিকা।

অর্থাৎ, উল্লিখিত এই সকল উপাসনা অন্তঃকরণের শৈশুদ্ধিকর বলিয়া বস্তুর সত্য ভাবের প্রকাশক এবং তদ্রূপ প্রকাশক বলিয়া অদ্বৈত জ্ঞানের উপকারক। উপরন্তু আলম্বন কিনা ধ্যানের আশ্রয়রূপ পদার্থ (উক্তরূপ) উপাসনার বিষয় বলিয়া তাহা সুখসাধ্য।

প্রতীক শব্দের আভিধানিক অর্থ অঙ্গ বা এক দেশ। এবং এই অর্থে প্রতীক উপাসনার যে ফল, তাহাও স্থানান্তরে প্রকাশিত; যথা—

অপ্রতীক আলম্বনাৎ নয়তি ইতি বাদরায়ণ উভয়থা অদোষাৎ তৎক্রতুশ্চ। ব্রহ্মসূত্র। ৪।৩।১৫

এই সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য বলিতেছেন যে, "স্থিতমেতৎ কার্য্য বিষয়া গতির্ণপর বিষয়েতি। ইদমিদানীং সন্দিহ্যতে। কিং সর্ব্বান্ বিকারালম্বনান বিশেষেনৈবমানব পুরুষঃ প্রাপয়তি ব্রহ্মলোক মত কাংশ্চিদেবতি। কিং তাবৎ প্রাপ্তং? সর্ব্বেষামেবৈষাং বিদুষামন্যত্র পরস্মাদ ব্রহ্মণো-গতিঃস্যাৎ। তথাহি "অনিয়মঃ সর্ব্বাষাম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৩) ইত্যত্রোহবিশেষেণৈবৈষাবিদ্যান্তরেষু অবতারিতেতি। এবং প্রাপ্তে প্রত্যাহ অপ্রতীকাবলম্বনামিতি প্রতীকাব-লম্বনান্ বর্জ্জয়িত্বা সর্ব্বানন্যান্ বিকারালম্বান্নয়তি ব্রহ্ম লোকমিতি বাদরায়নাচার্য্য মন্যতে। নহ্যেবমুভয়থা ভাবমত্যুপগমে কশ্চিদ্দোষোহস্তি। অনিয়ম ন্যায়স্য প্রতীকব্যাতিরিক্তেষ্বপ্যুপাসনেষুপপত্তিঃ। তৎক্রতুশ্চাস্যো-ভয়থাভাবস্য সমর্থক হেতু দ্রষ্টব্যঃ। যোহি ব্রহ্মক্রতুঃ সন্ব্রাহ্মৈশ্বর্য্যমাসীদেদিতি শিষ্যতে। যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি ইতি শ্রুতেঃ। নতুপ্রতীকেষুব্রহ্মক্রতুস্ত্ব মস্তি। প্রতীক প্রধানত্বাদুপাসনসা। নন্বব্রহ্মক্রতুমানা-পরপি ব্রহ্ম গচ্ছতি ইতি শ্রূয়তে। যথা পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াম্ 'এএনান্ ব্রহ্মগময়তি' ইতি। ভবতু। যত্রৈবমাহত্যবাদ উপলভ্যতে। তদভাবেত্বোসর্পিকেন তৎক্রতুন্যায়েন ব্রহ্ম ক্রতুনামেতৎপ্রাপ্তি নেতরেযামি তি মন্যতে।

(কালীবর বেদান্ত বাগীশকৃত অনুবাদ।)

"সিদ্ধান্ত হইল যে, গতিশাস্ত্র (ব্রহ্মে গমন করে, এই কথা) কার্য্যব্রহ্মবিষয়ে পর্য্যবসিত। সম্প্রতি অন্য এক সংশয় এই যে, অমানব পুরুষেরা কি অবিশেষে সমুদায় উপাসকদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়? কি সে বিষয়ে কোনরূপ বিশেষ (নির্দ্দিষ্ট নিয়ম) আছে? কোন্ কোন্ ব্রহ্মবিকারাবলম্বী অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত হয়? (কি ব্রহ্মবিকারাবলম্বী মাত্রেই নীত হয়?) পাওয়া যায় কি? পাওয়া যায় যে, পরব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমুদায় উপাসক ব্রহ্মলোকগামী হয়। "অনিয়মঃ সর্ব্বাষাম্" এই সূত্রে উক্ত বিষয়ের বিচার অবতারিত হইয়া কথিত প্রকার সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই পূর্ব্বপক্ষ তৎপ্রাপ্তে সিদ্ধান্ত বলা হইল, অপ্রতীকাবলম্বীরাই ব্রহ্মলোকে নীত হয়। আচার্য্য বাদরায়ণ (ব্যাস) মানেন যে, প্রতীকোপাসক ব্যতীত অন্য যে কোন ব্রহ্মবিকারোপাসক, সকলকেই অমানব পুরুষেরা ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "অনিয়মঃ সর্ব্বাষাম্" পরে আবার বলা হইল, প্রতীকো-পাসক নহে, এই দুই কথা বা উভয় প্রকার গতি বলা হইল বলিয়া দোষ মনে করিও না। অর্থাৎ বিরুদ্ধ বলা হয় নাই। কারণ পূর্ব্বোক্ত অনিয়ম ন্যায় (সূত্র) প্রতীকো-পাসক ভিন্ন অন্য উপাসকের উদ্দেশে প্রবর্ত্তিত (এই ১৫ সূত্রের দ্বারা সে সূত্র সঙ্কোচার্থে পর্য্যবসিত হইবে)। এই উভয়থা ভাব অর্থাৎ একবার বলা হইয়াছে, সকলেই ব্রহ্মলোকে যায়, সে বিষয়ে কোন নিয়ম নাই, আবার বলা হইল, প্রতীকোপাসক যায় না,—এই দ্বি প্রকার উক্তি তৎক্রতু ন্যায় সমর্থন করিতে সক্ষম আছে। বুঝিতে হইবে যে তৎক্রতু ন্যায়ই ঐ দ্বি প্রকার বলিবার কারণ। (ক্রতু সঙ্কল্প অর্থাৎ ধ্যান করা। তৎক্রতুন্যায় যে যাহা নিরন্তর ভাবে বা ধ্যান করে সে তাহা পায়, এই নিয়ম বা শ্রুতিমূলা যুক্তি) যে ব্রহ্মক্রতু (ব্রহ্মধ্যানী) হয় সে যে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য পাইবে তাহা বিচিত্র কি? পাওয়াই সঙ্গত। শ্রুতিও বলিয়াছেন "তাঁহাকে যে যে ভাবে ভাবে তাহার নিকট তিনি সেইরূপ হন।" ভাবিয়া দেখ, প্রতীক উপাসনায় (প্রতীক-দ্বারীভূত আলম্বন। যেমন প্রতিমা অথবা নাম।) ব্রহ্মক্রতুত্ব অবসন্ন হয় না অর্থাৎ তাহাতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মধ্যান হয় না। প্রতীক উপাসনায় প্রতীকই প্রধান, ব্রহ্ম তাহাতে অপ্রধান থাকেন। (সেই কারণে অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যান না হওয়ায় সে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য পায় না।) অব্রহ্ম-ধ্যায়ীরাও ব্রহ্মলোকে যায়, এ কথা শ্রুতিতে আছে সত্য। যথা ছান্দোগ্য পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় কথিত হইয়াছে—তাহা

ইহাদিগকে ব্রহ্ম পাওয়ায় ইত্যাদি। পরন্তু থাকিলেও বাধা হইতেছে না। আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন, যেখানে আহত্যবাদ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিধান আছে সে স্থানে তাহা অবশ্যই হইবে। যেখানে আহত্যবাদ নাই সেস্থানে সামান্যতঃ প্রবৃত্ত তৎক্রতু শাস্ত্রের দ্বারা নিশ্চয় করিবে যে, ব্রহ্মক্রতুরাই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, অন্যে নহে।”

অনুবাদের দোষগুণ পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। বর্ত্তমানে ইহাই যথেষ্ট যে প্রতীক ও অপ্রতীক উপাসনার ফল বৈষম্য শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া আচার্য্য সঙ্গত। বাচস্পতি মিশ্র মহাশয় উদ্ধৃত সূত্রের টীকায় প্রতীক শব্দের বৃদ্ধ প্রয়োগ অনুসারে অর্থ করিয়াছেন যে, “আশ্রয়ান্তর প্রত্যয়স্যা শ্রয়ান্তরে প্রক্ষেপঃ প্রতীক ইতিহিবৃদ্ধাঃ” অর্থাৎ যাহাকে আশ্রয় করিয়া যে প্রত্যয় বা অনুভব অন্য আশ্রয় যাহাতে সে প্রত্যয়ের অভাব সেই অন্য আশ্রয়ে সেই প্রত্যয়ের নিক্ষেপই প্রতীক ইহাই বৃদ্ধ প্রয়োগ। যে সকল প্রতীক-শ্রোত্য আহত্যবাদের বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য ও অন্যবিধ বলিয়া যাহা অগ্রাহ্য তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি? দুই ভিন্ন স্থানে দুই ভিন্ন অর্থে প্রতীক শব্দের প্রয়োগ, এই ধারণা করিলে বিষয়টি মনে রাখিবার পক্ষে সে বিষয়ে অনৈক্য। প্রতীক শব্দের অঙ্গ বা একদেশ এই রূঢ়ী বা প্রচলিত অর্থে ছান্দোগ্য ভাষ্যে “প্রতীয়তে প্রত্যেতি বা” এই অর্থে প্রতিপূর্ব্বকই ধাতুর উত্তর ইকন প্রত্যয় সিদ্ধ প্রতীক শব্দ—ইহাই কি পণ্ডিতসম্মত নহে। তথায় ইহার অর্থ চিহ্ন, যাহার দ্বারা ব্রহ্ম চিহ্নিত বা পরিচিত। প্রণবকে ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্নরূপে গ্রহণ করিয়া প্রণব উপাসনায় বিশুদ্ধ সত্ত্বের অনায়াসে ব্রহ্মলাভ, ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মপ্রাপ্তি নামক সংসার বন্ধন বিমুক্তি হয়—ইহাই আচার্য্যের শ্রুতির অনুগত উপদেশ।

অপর দুইটী সূত্রের আলোচনায় বিষয়টী সুগমতর হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্ম সূত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদের ৪র্থ সূত্রটী এই। যথা—

“ন প্রতীকেন হিসঃ।”

(শঙ্কর ভাষ্য)

মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্মম্। অথাধিদৈবত মাকাশো ব্রহ্মেতি। ছান্দ ৩।১৮।১ তথা আদিত্যোব্রহ্মেত্যা দেশঃ। (ছাঃ ৩।১৯।১) স যো নাম ব্রহ্মেত্যুপাস্তে। (ছাঃ ৭।৫।৪) ইত্যেবমাদিষু প্রতীকোপাসনেষু সংশয়ঃ। কিং তেষ্বপি আত্মগ্রহকর্ত্তব্যোনবেতি। কিং যাবৎ প্রাপ্তং? তেষ্বপ্যাত্মগ্রহ এব যুক্তঃ। কস্মাৎ। ব্রহ্মণঃ শ্রুতিষ্বাত্মাত্বেন প্রসিদ্ধত্বাৎ। প্রতীকানামপি ব্রহ্ম বিকারত্বাৎ ব্রহ্মত্বে সত্যাত্মত্বোপ পত্তেঃ। ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রুমঃ। সপ্রতীকেষ্বাত্ম মতিং বধ্নীয়াৎ। নহ্যুপাসকঃ প্রীতকানি ব্যস্তাত্মত্বেনাকল্পয়েৎ। যৎ পুনঃ ব্রহ্ম বিকারত্বাৎ প্রতীকানাং ব্রহ্মত্বং ততশ্চাত্মত্ব মিতি। তদসৎ প্রতীকাভাব প্রসঙ্গাৎ। বিকার স্বরূপোপমর্দ্দনেনহি নামাদি জাতস্য ব্রহ্মত্ব মেবাশ্রিতং ভবতি। স্বরূপোপমর্দ্দশ্চচ নামাদিনাম কুতঃ প্রতীকত্বমাত্মাগ্রহো বা। নচ ব্রহ্মণ আত্মত্বাৎ ব্রহ্ম দৃষ্ট্যুপদেশেষ্বাত্ম দৃষ্টিকল্প্য কর্ত্তৃত্বাদ্য নিরাকরণাত্ত্বৎ। কর্ত্তৃতাদি সর্ব্ব সংসার ধর্ম্ম নিরাকরণেন হি ব্রহ্মত্ব আত্মত্বোপদেশ স্তদ নিরাকরণেন চোপাসনা বিধানং। অতশ্চো পসকস্য প্রতীকে সমত্বা দাত্মগ্রহো নোপপদ্য তে ন। হিরু চক স্বস্তিকয়ো রিতরেতর আত্মত্বং অস্তি। সুবর্ণাত্মনৈব তু ব্রহ্মাব্রহ্মণৈকত্বে প্রতীকভাব প্রসঙ্গাভাবোচামঃ। অতোন প্রতীকেন আত্মদৃষ্টিঃ ক্রিয়তে।

(কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদ।)

“মন ব্রহ্ম, এইরূপ উপাসনা করিবে। ইহা অধ্যাত্ম উপাসনা। অনন্তর আধিদৈব উপাসনা। আধিদৈব উপাসনা আকাশ ব্রহ্ম, এইরূপে কর্ত্তব্য। “আদিত্য ব্রহ্ম, এতৎ-প্রকার উপাসনার উপদেশ আছে।” নামই ব্রহ্ম যে এইরূপে উপাসনা করে।” এইরূপ অনেক প্রকার প্রতীক উপাসনা আছে সে সকলে সংশয় এই সেই সকল প্রতীকে অহংজ্ঞান উৎপাদন করিতে হইবে কি না। পূর্ব্ব পক্ষে পাওয়া যায়, ঐ সকল প্রতীকে (উপাসনার আলম্বনে) আত্মমতি করাই যুক্তিসিদ্ধ। কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্ম আত্মা বলিয়া প্রসিদ্ধ। যে কোন প্রতীক হউক না কেন, সমস্তই যখন ব্রহ্মবিকার (ব্রহ্মোপন্ন) তখন অবশ্যই সে সকল প্রতীক ব্রহ্ম। যাহা ব্রহ্ম তাহাই আত্মা। সুতরাং প্রতীকে আত্মভাব উৎপাদন বা স্থাপন অনুপন্ন নহে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্তে বলা হইল প্রতীকে আত্মমতি অর্থাৎ অহংজ্ঞান প্রাবাহিত করিতে হইবে না। কারণ এই যে, প্রতীকোপাসক কোন প্রতীককে আত্মভাবে দেখেন না, আত্মা বলিয়া অবগত নহেন। (মনকে অহং বলিয়া জানেন না, আকাশকে অহং বলিয়া জানেন না।)

বলিয়াছিলে যে প্রতীক সকল ব্রহ্মের বিকার বলিয়া ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আত্মা এইরূপ জ্ঞান পরম্পরায় প্রতীকেও অহং দৃষ্টি স্থাপিত করা যাইতে পারে। আমরা বলি, তাহা পারে না। তাহা অত্যন্ত অসৎ। কারণ, তাহাতে প্রতীকের প্রতীকত্ব বিলোপ হইতে পারে। নাম প্রভৃতি প্রতীক (উপাসনার আলম্বন) ব্রহ্মের বিকার সত্য, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম দৃষ্টি প্রবাহিত করিতে গেলে বিকার ভাব উপমর্দ্দিত (বিনষ্ট) হইবে এবং সে সকলে ব্রহ্মভাব আশ্রয় করিবে। যদি নামাদির স্বরূপ বিলুপ্তই হইল, তাহা হইলে প্রতীক থাকিল কৈ? কিসে অহংজ্ঞান প্রবাহিত করিবে? ব্রহ্মই আত্মা, এই ভাব স্থির রাখিলে ব্রহ্ম দৃষ্টির উপদেশে আত্ম দৃষ্টি (আত্মজ্ঞান) সিদ্ধ হওয়ার কল্পনা করিতে পার বটে; কিন্তু তাহাতেও ইষ্ট সিদ্ধ হইবে না। কারণ সেরূপ দর্শনে (জ্ঞানে, কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্ব সংসার ধর্ম্ম নিরাকৃত হয় না। ব্রহ্মই আত্মা, এই দর্শনই কর্ত্তৃত্বাদি সর্ব্ব সংসার ধর্ম্ম নিরাকরণ পূর্ব্বক উদিত হয়, তাহার অনিরাকরণ অবস্থায় ঐ সকল উপাসনার বিধান। ফলিতার্থ এই যে, উক্তবিধ কল্পনার উপাসক প্রতীকের সহিত সমান হইতে গেলেও কদাপি তাহাতে প্রতীকে অহংজ্ঞান জন্মিবে না। (জীবের ও প্রতীকের স্বরূপগত ভেদ থাকায় এবং বিধির শ্রবণ না থাকায় প্রতীকে অহংগ্রহ উপাসনা আদৌ সম্ভব হয় না।) যাহা রুচক তাহাই স্বস্তক (রূচক ও স্বস্তক পূর্ব্বকালের অলঙ্কার বিশেষ) এরূপে ঐক্য নাই। তবে কি না সুবর্ণরূপে ঐক্য আছে। (এও সুবর্ণ, সেও সুবর্ণ; এইভাবে ঐক্য আছে। অতএব, সুবর্ণত্ব প্রকারে অভেদ থাকিলেও তদ্দ্বয়ের (স্বস্তিকের ও রুচকের) স্বরূপে যথেষ্ট বিশেষ (প্রভেদ) আছে। সুবর্ণত্ব প্রকারে রুচক স্বস্তকের একতার ন্যায় ব্রহ্মাত্মভাবের একতা গ্রহণ করিতে গেলে প্রতীকাভাবের প্রাপ্ত হয়, এ কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে এবং সেই কারণেই প্রতীকে আত্মদৃষ্টি (অহংজ্ঞান) করিতে পারা যায় না।

আলোচ্য অপর সূত্রটি পূর্ব্বে সূত্রের আসন্ন পরবর্ত্তী।

ব্রহ্ম দৃষ্টিরুৎ কর্ষাৎ।

ইহার ভাষ্য উদ্ধারের পক্ষে অতি বিস্তৃত। ভাষ্যের একটী বাক্য চিন্তনীয়। যথা—“ব্রহ্মণ উপাস্যত্বং যৎ প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যা ধ্যারোপনং প্রতিমাস্বেব বিষ্ণ্বাদীনাম্ অর্থাৎ যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণু প্রভৃতি উপাসনা একের ভাব অপরে অধ্যারোপ দ্বারা সাধিত হয়। প্রতীকে ব্রহ্মের উপাসনাও সেইরূপ। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টের অধ্যারোপে যে কার্য্য হইতে পারে, উৎকৃষ্টে নিকৃষ্টের অধ্যারোপে তাহা সম্ভবপর নহে। রাজকর্ম্মচারীকে রাজা বলিয়া ব্যবহারে কার্য্যোদ্ধার; কিন্তু রাজাকে লইয়া কর্ম্মচারীরূপে ব্যবহারে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রস্তাবিত ভাবগুলি অল্প কথায় ব্যক্ত করিলে মনে স্থায়ী হইবে এই বিবেচনায়, উদ্ধৃত সূত্রগুলির শঙ্কর ভাষ্যের অনুগত রামমোহন রায় কৃত সংক্ষিপ্ত অর্থ নিম্নে লিখিত হইল। যথা—“প্রতীক বা অবয়ব উপাসক ভিন্ন যে উপাসক তাহাকে অমানব পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত করেন এই ব্যাসের মত হয়। যেহেতু প্রতীকের উপাসনাতে এবং ব্রহ্মের উপসনাতে যদি উভয়েতেই ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় তবে প্রভেদ থাকে না। তাহার কারণ যে যাহার প্রতি শ্রদ্ধা করে সেই তাহাকে পায় এই যে ন্যায় তাহা মূর্ত্তি পূজা করিয়া পাইলে অসিদ্ধ হয় এবং বেদেও কহিয়াছেন, যে যে কামনা উদ্দেশ করিয়া ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞ করে সে সেই ফলকে পায়।”— ব্রঃ সূং ৪।৩।১৫

“মন আদির দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিলে মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হয় যেহেতু বেদে এমত কথা নাই এবং অনেক ব্রহ্ম স্বীকার করা অসম্ভব হয়। যদি মন আদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম না হইল তবে ব্রহ্মেতে মন আদির স্বীকার করা যুক্ত নহে। মন আদিতে ব্রহ্ম বোধ করা যুক্তি হয় কিন্তু ব্রহ্মেতে মন আদির বুদ্ধি কর্ত্তব্য না হয়। যেহেতু ব্রহ্ম সকল হইতে উৎকৃষ্ট হয়েন যেমন রাজার অমাত্যকে রাজবোধ করা যায়। কিন্তু রাজাকে রাজার অমাত্যবোধ করা কল্যাণের হেতু হয় নাই।”—ঐ ৪।১।৪-৫

অপেক্ষাকৃত আরও অল্প কথায় উদ্ধৃত্ত বাক্য সমূহের মর্ম্ম প্রকাশের চেষ্টা নিষ্ফল না হইতেও পারে। ব্রহ্মেবদ্ধ-লক্ষ্য উপাসকের সপ্রতীক উপাসনায় দেবযানে ক্রম মুক্তি আর প্রতীকেই বদ্ধ লক্ষ্য উপাসকের অন্যগতি—ইহাই শ্রুতির উপদেশ বলিয়া ব্যাস ও শঙ্করের অভিমত। এইটি মনে রাখিয়া পূর্ব্বোদ্ধৃত ছান্দোগ্য ভাষ্যের ভূমিকায় প্রাপ্ত আচার্য্য বাক্য বিশদ হইবে ইহা কি দুরাশা?

ছান্দোগ্য প্রাপ্ত উপদেশ এই যে, সাধক ওঁকারকে পরমাত্মার প্রতীকরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাতে পরমাত্মার

রসতমত্ব অর্থাৎ আনন্দের পরাকাষ্ঠা অনুভব লাভের জন্য প্রয়াসী হইবেন। সেই অনুভব লাভের উপায় শ্রুতি দেখাইতেছেন, যথা—

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ, পৃথিব্যা আপো রসঃ, অপাম্ ওষধয়ো রসঃ, ওষধীনাং পুরুষো রসঃ, পুরুষস্য বাগ্ রসঃ, বাচ ঋগ রসঃ, ঋচঃ সাম রসঃ, সাম্ন উদ্গীথো রসঃ। এই শ্রুতি স্পষ্টার্থ বলিয়া ভাষ্যোদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। কেবল উদ্গীথ অর্থে এখানে ওঁকার ইহাই দ্রষ্টব্য। ভাষ্যটি এই উদ্গীথ প্রকৃতত্বাৎ ওঁকার অর্থাৎ উদ্গীথের স্বভাব ওঁকার। পরমাত্মা সাক্ষাৎ রস স্বরূপ এজন্য ওঁকার অবলম্বনে যিনি উপাসক তাঁহার পক্ষে ওঁকারই রসানাং রসতমঃ। উপাসনা সিদ্ধির জন্য এই ধারণার প্রয়োজন। শ্রুতি এখানে ওঁকারের অর্থ সম্বন্ধে দৃষ্টিশূন্য।

প্রস্তাবিত উপাসনা মুণ্ডক্যোপনিষদে সবিস্তারে উপদিষ্ট। সেই উপদেশের মর্ম্ম এই যে একই আত্মা পিণ্ডান্ত যে জীব দেহ এবং তাহার অতিরিক্ত যে ব্রহ্মাণ্ড তাহাতে সমভাবে প্রকাশমান এবং জাগরণ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেও সমভাবে প্রকাশমান। বর্ণিত প্রকারে সমভাবে অর্থাৎ অভেদে প্রকাশমান বলিয়াই এই তিন ভাবের কোন একভাবে বা একাধিকের সম্মিলনোত্থ যে কোনভাবে যথার্থতঃ বা স্বরূপতঃ প্রকাশমান নহেন, এইটি বুঝাইবার জন্যই তাঁহার তুরীয় বা চতুর্থভাব শ্রুতিতে উপদিষ্ট। যথা—অদৃষ্টং অর্থাৎ কোন জ্ঞাতার তিনি জ্ঞানের বিষয় নহেন, অতএব "অব্যবহার্য্যং" অর্থাৎ তিনি কোন কর্ত্তার কোন প্রকার ক্রিয়ার কর্ম্ম নহেন, "অগ্রাহ্যং" অর্থাৎ হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণের সম্ভবপর নহেন। "অলক্ষণং" অর্থাৎ তাঁহাতে কোন লক্ষণ কিনা লিঙ্গ বা অনুমান উৎপাদক চিহ্ন কিছু নাই বলিয়া অনুমান দ্বারা উপলব্ধব্য নহেন, "অচিন্ত্যং" অনুমানের বিষয় নহেন বলিয়া চিন্তা বা ধ্যানের বিষয়ও নহেন, "অব্যপদেশ্যং" অর্থাৎ শব্দের দ্বারা উল্লেখের বিষয় নহেন, "একাত্ম প্রত্যয় সারং" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিন অবস্থাতে সমভাবে প্রকাশমান আত্ম-চৈতন্য তিনি এই প্রত্যয় বা স্থায়ী বোধের সার হয়েন, "প্রপঞ্চোপশম" অর্থাৎ জগদাদি তিন অবস্থার ধর্ম্ম বিযুক্ত হয়েন, "শান্তং" অর্থাৎ রাগ দ্বেষাদি শূন্য হয়েন, "শিবং" অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরূপ হয়েন, "অদ্বৈতং" অর্থাৎ তাঁহার সম বা বিষম সত্তান্তর শূন্য হয়েন। তিনিই সেই যিনি আছেন বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আছে এই গুণান্বিত ভাবে প্রকাশমান। আছে বা থাকা যেমন সর্ব্ব পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম তেমনই থাকা সত্ত্বেও না থাকা তাহাদের গুণ বা ধর্ম্ম। থাকিবার সময়ে না থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এজন্য তাহারা স্বয়ং সত্তা নহে। কিন্তু তিনি সত্তা এই জিনিষ না থাকার সম্ভাবনার অভাবে থাকা তাহার গুণ বা ধর্ম্ম হইতেই পারে না এজন্য তাহাকে সৎ বা স্বয়ং সত্ত্ব বলা হয়। কিন্তু ইহাও একটা কথার কথা। যেহেতু সত্তার বহির্ভূত বলিয়া যাহা মনে হয় তাহার যখন অস্তিত্বই নাই তখন কাহা হইতে ভিন্ন দেখাইবার জন্য তাঁহাকে কে সৎ বলিবে? মূল কথা তিনি স্বয়ং সত্তা। অপর বলিয়া যাহারা প্রতীয়মান তাহারা আশ্রিত সত্তা। তিনি আছেন বলিয়া অপর সকল আছে ও আছি। অপর না থাকিলেও তিনি যাহা তাহাই। ব্যক্তি, গুণ ক্রিয়া, ভাল মন্দ প্রভৃতি সকলই সেই অপর। এইটুকু কহিবার জন্যই অদ্বৈত উপদেশ। এই উপদেশের পরিপাকে সগুণ নির্গুণ, সক্রিয় নিষ্ক্রিয় প্রভৃতি সর্ব্ব বিবাদের চির শান্তি। (৫)

যিনি প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অগোচর তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য জীবের এক মাত্র সম্বল শব্দ। যাঁহার নাম, অভিধান বা প্রতীক ওঁকার সেই নামীয় অভিধেয় বা স্বরূপ যাঁহার সম্বন্ধে মাণ্ডুক্য শ্রুতির যে উপদেশ আলোচিত হইল পরবর্ত্তী শ্রুতিতে ওঁকারে তাহার প্রয়োগ দর্শিত। পরমাত্মা যেমন জাগ্রতাদি তিন পাদ বা অবস্থার অধিষ্ঠাতা অথচ চতুর্থ বা তুরীয় আত্মা বলিয়া বর্ণিত, তেমনই ওঁকার ও অকার, উকার, মকার এই তিন মাত্রায় অবস্থিত অথচ মাত্রাহীন, অভিন্ন এক। আত্মার এক এক পাদ ওঁকারের এক এক মাত্রা। জগতের অধিষ্ঠাতা যে বৈশ্বানর নামে বর্ণিত আত্মা তিনি বিরাট পুরুষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎব্যাপী আত্মা। অকারও দৃষ্টি বিশেষে সর্ব্বশব্দব্যাপী। তিন অবস্থার গণনায় জাগ্রত প্রথম, মাত্রা গণনায় অকার প্রথম এরূপ

(৫) বর্ত্তমানে ইংরেজি ভাষার যেরূপ প্রচার তাহাতে প্রস্তাবিত ভাবটি ইংরেজিতে বলিলে হিতকর হইবার সম্ভাবনা। God is being or reality *per se*, all the rest are contingent being or reality. He is they are. They are not and yet He is. He is of nature distinct from all.

ম্যও আছে। স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা আত্মা যাহার নাম তেজস পুরুষ তিনি ওঁকারের মধ্য মাত্রা, উকার। কেন া অকার অপেক্ষা উকার উৎকৃষ্ট। স্বপ্ন যেমন জাগ্রতের কল পদার্থতে ব্যাপ্ত হইতে বাধ্য নহে—অনেক বিষয়ে াধীন, সেইরূপ উকারও সর্ব্ব শব্দতে ব্যাপ্ত হইতে বাধ্য হে, অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। স্বপ্ন যেমন জাগ্রত ও সুষুপ্তির ধ্যবর্ত্তী, উকারও তেমনই। অকার ও মকারের মধ্যবর্ত্তী। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা যাঁহার নাম প্রাজ্ঞ তিনি মকার। যেমন াগ্রত ও স্বপ্ন সুষুপ্তিতে ভেদ ত্যাগ করিয়া একীভূত সুষুপ্তিরূপ হয়, তেমনই অকার ও উকার ওঁকার উচ্চারণের াপ্তি কালে মকারে একীভূত হয়। যেমন সুষুপ্তি হইতে ুন জাগ্রতের পুনঃপ্রকাশ, তেমনই ওঁকার পুনরুচ্চারণের ময় মকার হইতে অকার উকারের পুনঃ প্রকাশ। অ-াত্র একাক্ষর, ওঁকার তুরীয় আত্মার স্বরূপ। তুরীয় যেমন বস্থাত্রয়ের অতীত, তেমনই ওঁ এই শব্দ মাত্রাত্রয়ের তীত।

গ্রন্থের শেষে আত্মার উপাধি ও স্বরূপ বিষয়ক পদেশের পরবর্ত্তী ওঁকারের উপাধি ও স্বরূপের উপদেশ। কিন্তু গ্রন্থের আদিতে উপদেশের পর্য্যায় বিপরীত—প্রথমে ঠীক যে ওঁকার তাহার প্রস্তাবনা; পরে স্বরূপ যে ব্রহ্ম াহার। যথা—

"ওঁ ইত্যেতদক্ষর মিদং সর্ব্বং
তস্যোপ ব্যাখ্যানং ॥"

অর্থাৎ ওঁ এই যে অক্ষর ইহাই সর্ব্ব। তাহারই প্রকৃষ্ট-রূপে ব্যাখ্যা (এই উপনিষৎ।) এই প্রথম মন্ত্র। দ্বিতীয় ন্ত্রে দেখাইতেছেন,—

"সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম।"

এখানে ভগবান ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, যেমন এই মস্তই ওঁকার, তেমনই এই সমস্তই ব্রহ্ম। এই দৃষ্টিতে কার ব্রহ্মরূপে উপাস্য। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে ওঁকার ই সমস্ত হইতে পারে না, এজন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন, অয়মাত্মা পরমার্থঃ সন্ প্রাণাদি বিকল্পস্য আস্পদো যথা া সর্ব্বেপি বাক প্রপঞ্চ, প্রাণাদ্যত্বে বিকল্প বিষয় ওঁকার ব। সচ আত্ম স্বরূপ মেবতদভিধেয়ত্বাৎ। ওঁকার বিকার ব্দ অভিধেয়শ্চ। সর্ব্ব প্রাণাদ্যাত্ম বিকল্পঃ অভিধান তিরেকেন নাস্তি।" অর্থাৎ অদ্বয় আত্মা পরমার্থ কি না

নিত্য অপরিবর্ত্তিত হইয়াও যেমন প্রাণাদি বিকল্পের কি না অনিত্যের আশ্রয়, তেমনই প্রাণাদি আত্ম বিকল্প যাহার বিষয় সেই বাক্যসমূহ ওঁকারই। সেই ওঁকার আত্মার নাম বলিয়া আত্মার স্বরূপ। সর্ব্ব শব্দ ওঁকারের বিকার। (আর) শব্দ যাহার নাম সেই প্রাণাদি সকলে আত্ম বিকল্প। নাম ব্যতিরেকে তাহাদের অস্তিত্ব নাই।

শব্দ মাত্রেই ওঁকারের বিকার এবং নাম ব্যতিরিক্ত নামীসের নাস্তিত্ব ভাষ্যে প্রাপ্ত এই দুইটি ভাব সুবোধ্য করিবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজনীয় হইবে না। ইহা এই, ইহা এই নহে এই প্রকার স্থির, সবিশেষ ধারণা কোন অনুভূত পদার্থ বা অনুভাবক সম্বন্ধে নাম ব্যতিরেকে ঘটে না—ইহা সর্ব্বজনবিদিত। জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ী উভয়েরই ব্যবহারার্থ নামের প্রয়োজন। এই কারণে ইহাদিগকে পদার্থ বলা হয়। পদ যে নাম তাহার দ্বারা সূচিত অর্থ যে গুণ ক্রিয়া সম্বন্ধ-বান দ্রব্য বা সত্তাই বিশেষ্য। বিশেষণ পরিত্যাগে যাহা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ নির্বিশেষ বিশেষ্যের ধারণা বা ব্যবহার অসম্ভব। সম বা বিষম অন্যের অভাবে তাহার "এই ইত্যাকার" নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ধারণা সম্ভবে না। আর গুণ ক্রিয়া সম্বন্ধ প্রভৃতির অভাবে পরিবর্ত্তন শূন্য বলিয়া তাহাকে লইয়া ক্রিয়া ব্যবহারও সম্ভবে না। এই দৃষ্টিতে পদার্থ নাম সুপ্রযুক্ত। যাবতীয় পদ, নাম বা শব্দ বর্ণমালার অন্তর্গত। অকার যাহার তান্ত্রিক নাম শ্রীকণ্ঠ ও ক্ষকার যাহার তান্ত্রিক নাম সুমেরু ইহারই অন্তঃপাতী বঙ্গীয় বর্ণমালা। এজন্য অঙ্গন্যাসাদি অনুষ্ঠান দ্বারা বর্ণমালার সর্ব্বময়ত্ব সূচি। অজপা হংস মন্ত্র অমাত্র একাক্ষর ওঁকার স্থানীয় প্রপঞ্চোপশম তুরীয় চৈতন্য।

বর্ণ স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুই ভাবে বিভক্ত। ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরের সাহায্য বিনা উচ্চারিত হয় না বলিয়া বীজ বা অচেতন এবং স্বরবর্ণ শক্তি বা চেতন (অং অঃ ইহারাও স্বর বর্ণের অন্তর্গত)। স্বর বর্ণের মধ্যে অকার ইকার ও উকার উচ্চারণ বিষয়ে স্বপ্রধান অন্যের আশ্রয়ের অপ্রত্যাশী। বাক যন্ত্রের সর্ব্ব নিম্ন স্থান হইতে অকার উচ্চারিত বলিয়া আদি আর উকার উচ্চারণে ওষ্ঠদ্বয় পুটিত হয় বলিয়া প্রয়োগান্তর ভিন্ন পুনরুচ্চারণ অসম্ভব এজন্য উকার অন্ত। অভিধান অভিধেয়ের অভিন্নতা দৃষ্টিতে অকার সর্ব্বাদি, উকার সর্ব্বান্ত। অকার উকারের সম্মিলনোত্থ ওকারে

বাকশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। অনুনাসিক সংযোগে পূর্ণতা-প্রাপ্ত ওঁকারই ওঁকার।

প্রাচীন পরম্পরা-প্রাপ্ত উপদেশে অনেক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানবান্ হিন্দু লিখিত ওঁকারকে পরমাত্মার যন্ত্র বা চিত্রিত রূপক বলিয়া গ্রহণ করেন। বেদে ওঁকারের যে রূপ তাহাতে মনুষ্যের মস্তক বিন্দু। কণ্ঠের অস্থি (blle Ieoni) অর্দ্ধ চন্দ্র। উভয়ের মধ্যে বিভেদক গ্রীবা স্থলই অর্দ্ধচন্দ্র ও বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী শূন্য স্থান। এই অস্থির নিম্ন হইতে দক্ষিণ বাহুর পার্শ্ব দিয়া কটীদেশে কুঞ্চিত হইয়া উদরের নিম্নে প্রসারিত বাম পার্শ্বগামী রেখা ওঁকার। কুঞ্চন স্থান হইতে দক্ষিণ মুখী হইয়া পরে উর্দ্ধগামী রেখা দক্ষিণ হস্ত। ওঁকারের বৈদিক আকৃতির সূচনা এই যে মনুষ্য দেহ পরমেশ্বরের যন্ত্র। তিনি অন্তর্যামী যন্ত্রী।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভাময়েৎ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (গীঃ ১৮ অঃ। ৬১।)

অর্থাৎ, হে অর্জ্জুন ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি মায়া শক্তির দ্বারা দেহযন্ত্রারূঢ় সর্ব্বভূতকে চালনা করেন।

প্রদর্শিত প্রণালী ক্রমে সপ্রণব উপাসনায় দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে মনুষ্য মাত্রেরই পরমার্থ সিদ্ধি। ইহাই সর্ব্ব ব্রাহ্মণশাস্ত্রের উপদেশ এবং ইহাই সর্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্ম। এ ধারণার সাধুত্ব নির্মৎসর পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন—এই বিনীত প্রার্থনা রহিল।

ইদং ব্রহ্মার্পণমস্তু।

দরিদ্রতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

জানি তুমি সব গুণরাশি-নাশী
সকল শক্তি-হরা ;
করুক তব দুখীর রক্ত
আঁখির সলিলে ভরা।
গড়েছে তোমার রুক্ষ মূরতি
সব চকমকি শিলা,
ডাকিনীর মত লহু চুষে খাও
অনন্ত তব লীলা।
অসীম ক্ষমতা মমতাবিহীন,
হীরা গলে যায় তাপে—
সচল তালকে মাটীতে নোয়াও
ক্ষীণ অঙ্গুলি চাপে।
হিমের নিলামে কমল ফেরার
সলিল প্রাসাদ ছাড়ে ;
গঙ্গা চলেন কয়লা বহিয়া
রত্নাকরের দ্বারে।
গুণী বট তুমি এ কথাও মানি,
এ কথাও যায় শোনা—
দুখের আগুনে পোড়ায়ে পোড়ায়ে
উজ্জ্বল করো সোণা ;
তুমি শ্রীহরির বাহন গরুড়—
অমৃতের অধিকারী ;
মহনীয় তুমি, সহনীয় তুমি,
সুহৃদ ও সরন ভারী।
তুমি যে আমার বাল্য বন্ধু
তুমি সেটা ভাল জানো ;
তবে কেন ভাই নূতন করিয়া
বিকট নয়না হানো !
বাঘের মতন তুলে নিয়ে যাও,
না কেঁদে রহিতে পারি,—
টানিবে নোংরা কাঁটাবন দিয়ে
সেইটে সইতে নারি।
সবল মরালে শর বিঁধে মারো
সহিতে পারিবে সেটা,
বিমল পালক ময়লা কর না
লাগায়ে কাঠীর আটা।
যূথিকারে তুমি খাতক ক'রো না
হীন 'সেয়াকুল' কাছে,
পাপিয়ারে তুমি চাতক ক'রো না,
কবি এ করুণা যাচে।

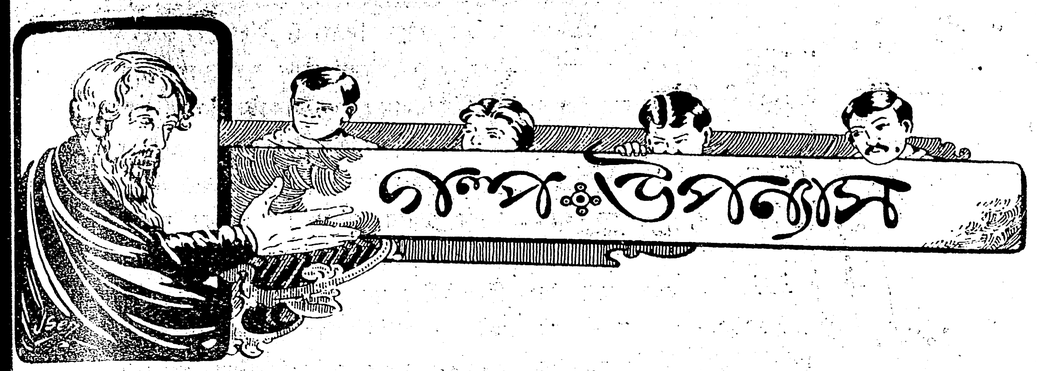

রাজগী।

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্

(১৯)

দশ বৎসর পরে নবাবগঞ্জের রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। এর মধ্যে অনেক দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছি, যদিও বেশীর ভাগ সময় কাটাইয়াছি কলিকাতায়। কাব্যব্যাধি আমার মোটেই ছিল না, এমন কি, যে দেশের ভিতর বাস করিয়াছি এবং যার ভিতর দিয়া যাতায়াত করিয়াছি, তার দিকে চাহিয়াও কোনও দিন দেখিবার অবকাশ আমার হয় নাই। আমি নিজেকে লইয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে, নিজের বাহিরে কোনও দিন চাহিতে পারি নাই। কিন্তু আজ আমার সেই চিরপরিচিত পূর্ব্ববঙ্গ, তার অশেষ রূপের পশরা লইয়া, আপনাকে আমার চক্ষের ভিতর প্রবেশ করাইয়া আমাকে আনন্দ-রসে অভিষিক্ত করিল।

ভাদ্রের শেষ, পূজা আসে আসে। নদীর জল কূল ছাপাইয়া সমস্ত দেশ ভাসাইয়া দিয়াছে। তার ভিতর ভাসিতেছে সহস্র সহস্র "কুমুদ-কহ্লার"। তার পাতাগুলি তাদের ক্ষীণ সৌষ্ঠব জলের উপর মেলাইয়া দিয়া বিপুল আনন্দে ভাসিয়া রহিয়াছে। উজ্জ্বল নীল আকাশ একখানা ঝক্ ঝকে স্ফটিকের ঢাকনার মত সমস্ত পৃথিবীকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। সেই জলরাশির মাঝে মাঝে সবুজ দ্বীপের মত এক একখানা বাড়ী। চারিদিককার ঘন সবুজ পরদার ভিতর দিয়া তার জীর্ণ ধূসর চালা মাঝে মাঝে উঁকি মারিতেছে। আর সমস্ত দিগন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে বর্ষাধৌত উজ্জ্বল স্নিগ্ধ সবুজ-গাছের অবিচ্ছিন্ন মালা।

সর্ব্বত্র এমন একটা ঝক্‌ঝকে উজ্জ্বল তরুণ ভাব—এমন একটা সজীব সজাগ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, আমার অকবির চক্ষুও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। এমন স্নিগ্ধ, এমন শান্ত, এমন উজ্জ্বল, এমন সুন্দর দেশ কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু দেশের রূপের চেয়ে বেশী মুগ্ধ করিল তার স্নেহ। সমস্ত দেশ যেন তার মঙ্গল আলিঙ্গনে আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী"তে একটা কথা পড়িয়াছিলাম, মনে পড়িল, "এমন মায়ের মত দেশ কোথায় আছে!" বজরার ছাদের উপর বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি কেবলি দেখিতে পাইলাম, আমার দেশের এই মাতৃমূর্ত্তি। আমার চিরদিনের মাতৃস্নেহ-বুভুক্ষিত হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় নবাবগঞ্জের রাজবাড়ীর দেউড়ী দেখা গেল। অস্তমান সূর্য্যের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তার উচ্চ চূড়া। তার দিকে চাহিয়া আমার চক্ষু ফিরিল না। আমার হৃদয় যেন দুই হাতে ঐ চিরপরিচিত গৃহকে বেষ্টন করিয়া ধরিতে চাহিল।

রজরা হইতে নামিয়া বাড়ীতে উঠিলাম। চারিদিক হইতে লোকজন আসিয়া আমাকে ঢিপ ঢিপ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। ছেলে বেলায় যখন এখানে ছিলাম, তখন বুড়ো বুড়ো ভদ্রলোকেরা আসিয়া আমাকে দিন রাত প্রণাম করিয়া গিয়াছে। বরাবর তাতে এতটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম যে, তাহাতে গায় লাগিত না। কিন্তু আজ এতকালের অনভ্যাসের পর আমার এই সব বুড়ো বুড়ো ভদ্রলোকদের কাছে প্রণাম লইতে ভয়ানক বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। যে শিক্ষায় ও সংসর্গে আমি এত দিন মানুষ হইয়াছিলাম, তাহাতে আমার ব্রাহ্মণ্য-গর্ব্ব দুই দিক হইতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। এক দিকে নরেন্দ্রবাবু তাঁর সাম্যবাদ লইয়া ইহার ভিত্তি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। আর একদিকে আমার ইয়ার বন্ধু ও রমণীর দল এ আভিজাত্যকে দিনরাত পদদলিত করিয়াছিল। তাই আমি বড় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম।

আমি বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। একে একে লোক আসিয়া পায়ের ধূলা লইতে লাগিল, সকলের সঙ্গে অল্পস্বল্প আলাপ করিলাম। তা' ছাড়া প্রজারা দলে দলে আসিয়া নজর দিয়া সেলাম করিল বা পায়ের ধূলা লইল। খুব বেশী প্রজা আসিল না, লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু তবু নজরের টাকায় আমার সম্মুখের টেবিলের উপরটা বেশ ভরিয়া উঠিল। এই নজরটা আমাকে আরও বেশী কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। ইহা আমার ন্যায্য প্রাপ্য নয়, এবং ইহা ঠিক সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত দানও নয়। পীড়ন করিয়া ইহা আদায় করা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইল না, কিন্তু বাহ্যিক উৎপীড়ন ছাড়া যে মামুলের একটা ভিতরকার পীড়ন আছে, তাহা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রূপেই ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। তা ছাড়া, পীড়ন হউক বা না হউক, এ টাকায় আমার যখন অধিকার নাই, তখন এটা লওয়া—হয় পরস্বাপহরণ, না হয় দান গ্রহণ। দুইটাই হীন বলিয়া আমার মনে হইল। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস হইল না। টাকাগুলি লইতে অস্বীকার করিতে পারিলাম না, কিন্তু হাত দিয়া তুলিতেও সঙ্কুচিত হইলাম। আমি একজন কর্ম্মচারীকে আদেশ দিলাম, সে টাকাগুলি তুলিয়া লইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এই টাকা দিয়া একটা ইঁদারা করিতে হুকুম দিলাম। ইঁদারার সঙ্গে পাম্প লাগাইয়া দিয়া গ্রামবাসীদের ভাল জল জোগাইবার ব্যবস্থা করিব, স্থির করিলাম। এ টাকাটা অন্ততঃ প্রজার হিতার্থেই খরচ হউক!

অনেকক্ষণ দরবারের পর বেশ একটু রাত্রি হইলে আমি অন্দরে গেলাম। অন্দরে যাইতে আমার বুক কাঁপিতে লাগিল। একবার মনে হইল যে অন্দরে দুইটি চিরপরিচিত মুখ দেখিতে পাইব না। রাণী-মা নাই, দাইমাও নাই। তাঁরা তাঁদের পাপের, পুণ্যের, স্নেহের, অস্নেহের সকল স্মৃতি ফেলিয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছেন। আজ বিশেষ করিয়া আমার মনে হইল তাঁদের স্নেহের কথা, তাঁদের পুণ্যের কথা!—আমার অপরাধ-কলুষ হৃদয়ে আমি আজ তাঁদের অপরাধের কঠোর বিচার করিতে পারিলাম না। স্মরণ করিলাম আমার শৈশবে তাঁদের স্নেহ ও যত্নের কথা, তাঁদের দেবসেবায় উৎসাহের কথা, গরীব ভিখারীর প্রতি তাঁদের দয়ার কথা, তাঁদের দানের কথা—আমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

আর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল সাবিত্রীর কথা স্মরণ করিয়া। সাবিত্রী এখন এ সংসারের অধিষ্ঠাত্রী—সে আমার স্ত্রী, ধর্ম্ম-পত্নী। তার শাসনপরায়ণ কঠিন অন্তরের কথা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তার সঙ্গে যে আমার এখন, এত দিন পরে দেখা করিতেই হইবে, সে কথা ভাবিতে আমার অন্তরাত্মা ভীত হইয়া উঠিল। আজ আমার অন্তর শুধু বিদ্রোহের বিরাগে চঞ্চল হইল না। আজ মনে হইল আমি অপরাধী, সে সাধ্বী—তার সামনে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইতে আমি ভয়ানক সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলাম।

মুখ হাত ধুইয়া আমি গিয়া খাইতে বসিলাম। খাওয়ার ঘরে সাবিত্রীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। সে দুয়ারের কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। তার তেইশ বছরের যৌবন তার অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া অপরূপ রূপরাশি বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। অনেক সুন্দরী দেখিয়াছি, ভারতের নানা দেশে ঘুরিয়া নারী-সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, সাবিত্রীর মত সুন্দরী দেখি নাই।

তাকে আমি এক ফোঁটাও ভালবাসি না, তার ও রূপ-যৌবনের জন্য আমার এক ফোঁটাও কামনা নাই, আমি চিরদিন তাকে আমার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ বলিয়া মনে করিয়াছি। তবু রূপসী হিসাবে তাকে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে সব নারীর উপর স্থান দিতে পারি।

সাবিত্রী দাঁড়াইয়া ছিল। তার মুখ স্থির, শান্ত, গর্ব্বিত। তার চক্ষু সে নত করিয়া ছিল, তার বিম্বলাঞ্ছিত ওষ্ঠাধর যেন একটু শক্ত করিয়া চাপিয়া ছিল। সে যে খুব জোর করিয়া আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা এক নজরেই বুঝিতে পারিলাম। তার দীর্ঘ ঋজু সুগঠিত দেহখানির ভিতর আগাগোড়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ফুটিয়া রহিয়াছে। সে অকরুণ বিচারকের মত কঠোর আবেগপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাহিয়া আবার চক্ষু নত করিল। তার পর আমার পায়ের কাছে নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিল।

এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেলাম। গর্ব্বিতা সাবিত্রীকে পদতলে দেখিয়া আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য একটু বিচলিত হইয়া গেলাম। এত রাশিকৃত রূপের মধ্যে যেটুকুর অভাব তার সমস্ত সৌন্দর্য্যকে অসম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, সেই বিনয়-নম্রতা যেন এই প্রণত সৌন্দর্য্যের ভিতর ফুটিয়া উঠিল; তাই আমি এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তার পর সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। তার মুখে একটুও ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম না। সে যেন সবটা কাজ একটা শিখান পার্টের মত করিয়া গেল,—এ প্রণামের ভিতর তার হৃদয়ের যে এক ফোঁটাও যোগ আছে, এ রকম মনে হইল না। আমার মোহ কাটিয়া গেল। আমি চট্ করিয়া বুঝিলাম যে, সাবিত্রী যাহাকে প্রণাম করিল সে আমি নয়, যে নিরুপাধিক স্বামিত্বের আমি একটা তুচ্ছ প্রতীক, সে তাহাকেই প্রণাম করিল। সে প্রণাম রক্ত মাংসের দ্বিজেশচন্দ্রের সঙ্গে তার কোনও যোগ সাধন করা দূরে থাকুক, তাকে দুই হাতে ঠেলিয়া তফাৎ করিয়া দিল।

আমার মনটা তার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। হঠাৎ আমার চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠিল বিধুর সেই মৃত্যু-মলিন মুখ। মনে হইল যে সাবিত্রীর কঠোর বিচার হইতেই বিধুর যত দুর্গতি, ও আমার অধঃপতন। আমার অন্তর কঠিন হইয়া গেল। প্রণত সাবিত্রীর প্রতি যে আশীর্ব্বাদ আমার অলক্ষিতে অন্তরে গঠিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা নিবৃত্ত করিয়া আমি নীরবে খাইতে বসিলাম।

সাবিত্রী আমার সামনে সেই শ্বেত-পাথরের মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। তার পর ঠাকুরকে, ঝিকে হুকুম করিয়া এটা-ওটা দেওয়াইতে লাগিল, আমাকেও এক আধবার এটা-ওটা খাইতে অনুরোধ করিল, ঠিক যেমন রাণী-মা করিতেন। আমি আবার একবার তার মুখের দিকে চাহিলাম। সে শান্ত, ভাবশূন্য, কঠিন দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে চাহিল। কি পাথরের মত নির্ম্মম সে দৃষ্টি! আমি আবার নীরবে খাইতে লাগিলাম।

আহারান্তে মুখ ধুইয়া শুইবার ঘরে গেলাম। দেখিলাম, সাবিত্রী সেখানে সোণার-কাজ-করা রূপার বাটায় পাণ লইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। সে বাটা খুলিয়া আমার সামনে ধরিল, আমি পাণ তুলিয়া একখানা চেয়ারে বসিলাম। সাবিত্রী আমার সম্মুখে বসিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি খেতে গেলে না?"

সে বলিল, "আজ আমার সাবিত্রী-ব্রতের উপবাস।"

আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না; চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সাবিত্রীও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শেষে সে বলিল, "ক'দিন থাকবে তুমি?"

আমি আবার তার মুখের দিকে চাহিলাম। পাথরের মূর্ত্তি সে—তার কঠোরতা আমার অন্তরকে ভয়ানক পীড়ন করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম না যে, চিরদিন বাড়ী থাকিব বলিয়াই আমি আসিয়াছি। বলিলাম, "ঠিক নেই।"

আবার চুপ। কেহ কোনও কথা কহিলাম না।

ঘরে একটা ঝি এতক্ষণ বিছানা-পত্র ঝাড়া-ঝুড়ি করিয়া মশারী ফেলিতেছিল।

সাবিত্রী বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার কয়টা কথা আছে। আজ অনেক রাত্রি হ'য়েছে, তুমি এখন শোও; কাল সময় পাও তো কথা কটা শুনো।" বলিয়া সে দৃপ্তা রাণীর মত উঠিয়া ঝির সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি একটু অবাক্ হইলাম, একটু বিরক্ত হইলাম, কিন্তু বাঁচিলাম। বাপ্! এই পাথরের মূর্ত্তি পাশে লইয়া যদি আমার রাত কাটাইতে হইত, তবে আমি হাঁপাইয়া উঠিতাম্! সাবিত্রী আমাকে যে রেহাই দিয়া গিয়াছে, তাহাতে আমি যেন রক্ষা পাইলাম।

(২০)

আমি বিপুল উৎসাহের সহিত জমীদারীর কাগজপত্র দেখিতে লাগিলাম। জমীদারীর কাজকর্ম্ম আমি কিছুই জানি না, তার কাগজপত্রের সব নামও জানি না। গোবিন্দ আমাকে সব বুঝাইতে লাগিল। চিঠা পৈটা, আমদানী, তলব বাকী, প্রভৃতি ও সেট্‌লমেন্টের সংক্রান্ত পাটা খতিয়ান প্রভৃতি নানাবিধ কাগজপত্র লইয়া সে এমন একটা জটিলতার সৃষ্টি করিল যে, তার মধ্যে আমি একদম খেই হারাইয়া ফেলিলাম। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু বুঝিবার জন্য বিপুল চেষ্টা করিয়া মাস খানেকের মধ্যে সমস্ত জমীদারী কারবারটার একটা মোটামুটি চেহারা আয়ত্ত করিয়া লইলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বুঝিলাম যে, এই জটিল ব্যাপারের একটা ভাল রকম সমাধান করিয়া, জমীদারীর পরিচালন-ভার গ্রহণ করা আমার সাধ্যাতীত।

রাধাচরণ আমাদের সুমারনবিশ। সে সমস্ত কাগজ পত্র লইয়া গোবিন্দের পাশে বসিত। গোবিন্দ গদীয়ান হইয়া বসিয়া ফরমায়েস করিত, আর সে খাতা বাহির করিয়া যেটা আবশ্যক সেটা দেখাইত। ঠিক আবশ্যকের অতিরিক্ত কোনও কথা সে কহিত না।

এক দিন আমি সন্ধ্যার সময় নদীর ধার দিয়া একা বেড়াইতেছি; রাধাচরণ তখন হাট হইতে ফিরিতেছে। তার বগলে ছাতা, পরণে ময়লা কাপড়, চেহারা মোটের উপর ভারী দীন ও মলিন। আজ দিনের মধ্যে তার সঙ্গে আমার এই পঞ্চমবার সাক্ষাৎ, তবু সে আমার সামনে অবনত হইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। তার বয়স বছর পঞ্চাশেক। ছেলেবেলায় তাহাকে আমি বেশ সম্মান করিতাম। তাকে এতটা বিনীত হইতে দেখিয়া আমার হাসিও পাইত, দুঃখও হইত।

এ কথা সে কথার পর সে বলিল, "মহারাজ কি বোটে যাচ্ছেন?"

আমি একখানা ছোট মোটর-বোট আনাইয়াছিলাম। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় আমি তাহাতে চড়িয়া একলা চারি দিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার দেশের নগ্ন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া বেড়াইতাম।

আমি বলিলাম, "নাঃ, আজ আর বোটে যাব না মনে ক'রছি।"

সে চারিদিকে চাহিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "যদি বোটে যেতেন, তবে আমি একটু মহারাজের সঙ্গে আসতাম। কয়েকটা কথা আমার বলবার ছিল।"

আমি বলিলাম, "বেশ তো, চলুন না, আমার আপত্তি নেই।"

বোটখানা ঘাটে বাঁধা ছিল, আমি চাবী খুলিয়া রাধাচরণকে উপরে উঠাইয়া নিজে তাহা ঠেলিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। তার পর যন্ত্রপাতি লইয়া কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করিয়া তাহাকে ছুটাইয়া দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনেকটা দূর চলিয়া গেলাম।

রাধাচরণ নানা রকম ভণিতা করিয়া বক্তব্যটা যথাসম্ভব দীর্ঘ করিয়া যে কথা আমাকে বলিল, তাহা শুনিয়া আমার রক্ত ধাঁ করিয়া গরম হইয়া উঠিল।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই ঃ—গোবিন্দ আমাকে ডুবাইতে বসিয়াছে। গত ১৪।১৫ বৎসরের মধ্যে কেহই জমীদারী দেখাশুনা করেন নাই। স্বর্গীয় রাণীমা জমীদারীর বিশেষ কিছুই বুঝিতেন না; তবু আগে তিনি একটু দেখাশুনা করিতেন বলিয়া, ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানজী ভয়ে ভয়ে বেশী কিছু করিতে ভরসা পান নাই। আর গোবিন্দের যদিও রাণীমার উপর ভয়ানক আধিপত্য ছিল, তবু সেও, দেওয়ানজী মাথার উপর থাকিতে, হাতে মাথা কাটিতে পারে নাই। দেওয়ানজী ও গোবিন্দ দুই জনেই তখনই বেশ গুছাইয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তবু খুব বেশী কিছু অনিষ্ট করিতে পারেন নাই।

তার পর আমার রকম সকম দেখিয়া রাণীমার ভয় হইল যে, আমি সাবালগ হইলে তাঁহাকে হয় তো পথের ভিখারী হইতে হইবে। তাই তিনি দেওয়ান ও গোবিন্দের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নিজের কাজ গুছাইবার চেষ্টায় মনোযোগ করিলেন। তার পর হইতে একটা ভীষণ রকম লুটতরাজ আরম্ভ হইল। রাণীমা দুই হাতে লুটিয়া সব নিজের

ভাইয়ের বাড়ী পাঠাইতে লাগিলেন। এই অপকার্য্যে দেওয়ানজী ও গোবিন্দ হইলেন তাঁহার সহায়। কাজেই তাঁদের লুটতরাজেও রাণীমার বাধা দিবার বিশেষ শক্তি রহিল না। আবার, আমি টাকার জন্য তাগাদার পর তাগাদা ও মনোহর সাঁর গদীতে চিঠির পর চিঠি ছাড়িতে লাগিলাম। এই ত্রিধারায় বহিয়া আমার সম্পত্তি এই কয় বৎসরের মধ্যে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

তার পর বৃদ্ধ দেওয়ান স্বর্গারোহণ করিলেন, তাহাতে সম্পত্তি লুটের ভাগ কমিলেও পরিমাণ কমিল না, বরং অনেকটা বাড়িয়া গেল। গোবিন্দ দুপুরে ডাকাতি আরম্ভ করিল। রাণীমার চোখে ধূলা দিতে তার যত সুযোগ ছিল, একটা বৃদ্ধ দেওয়ানজীর ছিল না। রাণীমার অভাবের পর তো সে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হইল। রাধাচরণ বলিল, "বুড়া দেওয়ানজীর তবু একটু ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা-চরিত্র ছিল। বর্ত্তমান দেওয়ানের সে বালাই নাই। বুড়া দেওয়ানজী আদায় তহশীলটা রীতিমত করিতেন, আর আদায়ের টাকা সুমারে জমা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান দেওয়ানজীর আমলে আদায় তহশীল চুলায় গিয়াছে, তিনি কেবল প্রজার কাছে দুই হাতে ঘুস কুড়াইতেছেন।"

গোবিন্দের এত বড় সম্পত্তি দেখাশুনা করিবার ক্ষমতা মোটেই নাই। কাজেই তার অক্ষমতার ফলে আদায়পত্র বন্ধ হইয়াছে; কতকগুলি মহাল আজ পাঁচ ছয় বৎসর বিদ্রোহী, প্রায় তিন লক্ষ টাকার খাজনা তামাদী হইয়া গিয়াছে। মফঃস্বলের নায়েব গোমস্তারা গাফিলি করিয়া সদর খাজনা না দিয়া কতকগুলি মহাল নিলাম করাইয়া বেনামীতে কিনিয়া লইয়াছে। অপর পক্ষে হাতের গোড়ায় গোবিন্দ যাহাকে পাইয়াছে তাহাকে বিধিমতে উৎপীড়িত করিয়াছে। প্রজাদের কাছে ঘুস আদায় করিয়া করিয়া তাহাদের উদ্বাস্ত করিয়া তুলিয়াছে, নায়েব গোমস্তার কাছে ঘুস খাইয়া পেট মোটা করিয়াছে; আর মারপীট করিয়া, ঘর জ্বালাইয়া নিতান্ত বাধ্য প্রজাদের বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে।

রাধাচরণ বলিল, "এই ধরুণ অছিমদ্দি সর্দ্দার,—সে সরকারের জন্য কতবার জান কবুল করে লড়াই ক'রেছে। এমন বাধ্য প্রজা আর ছিল না। সে মরে গেলে দেওয়ানজী তার স্ত্রীকে বেইজ্জত কল্লেন। তাই নিয়ে তার ভাই একটা ফৌজদারী করে। মামলায় সে হেরে গেল। তার পর দেওয়ানজী তাকে উদ্বাস্ত করে তার জোত জমী সব মিথ্যা মোকদ্দমা করে, বিক্রী করে' নিজে কিনে নিয়েছেন,—আর তার স্ত্রীকে যে নাজেহাল করেছেন, তা বল্‌বার নয়। অছিমদ্দির ভাই করিমদ্দি এখন কামারহাটিতে গিয়ে সাত আনীর প্রজা হ'য়েছে। সেখানে সে আমাদের সব প্রজাকে বিদ্রোহী করে তুলেছে। অছিমদ্দির স্ত্রী রাবেয়া এখন বাজারে গিয়া বেশ্যা হইয়াছে।"

অছিমদ্দি! সেই সরল-প্রাণ সেবাপরায়ণ অছিমদ্দি! তার সেই সুন্দরী সরলা বুদ্ধিহীনা পত্নী—আমিই বোধ হয় তার প্রথম সর্ব্বনাশ করি! বিপিন বলিয়াছিল যে, সে শতমুখে আমার ব্যাখ্যান করিয়াছে। আমি নিজকর্ণে শুনিয়াছি যে, সে তার স্বামীকে বলিয়াছিল, "রাজাবাবু বড় হ'লে আর রায়তের দুঃখ থাকবে না!" খুব কথা বলেছিলি রাবেয়া! খুব সত্য তোর আন্দাজ!

সেই সুদূর অতীতের কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার হাত পা অসাড় হইয়া আসিল। আমার বুকের ভিতর যেন শ্মশানের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। হায় রে আমার পোড়া অদৃষ্ট। আমি বিপথে যাইয়া কেবল আমার নিজের সর্ব্বনাশ করি নাই, সঙ্গে সঙ্গে অছিমদ্দির মত, রাবিয়ার মত আমার কত শত শত প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়াছি!

ভাবিতে আমার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল,—ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিল। আমার বোট যে আমি কোন্ দিকে চালাইলাম তাহা আমার হুঁস রহিল না। আমার সামনে বসিয়া রাধাচরণ যে কি কথা বলিতেছিল, তার এক বর্ণও আমি শুনিতে পাইলাম না। আমার কেবল কাণে বাজিল আমার গুরু, নরেন বাবুর একটা কথা, "এত ছোট আমাদের জীবন, ভগবানের দয়ার দান। এর দুটো দুটো বছর এমনি করে অপচয় ক'রেছ।" দুই বছর নয়, দশ বারো বছর আমি অপচয় করিয়াছি। কেবল হারাই নাই—এ কয় বৎসর, এত দিন ধরিয়া যত্ন করিয়া সংসারের উর্ব্বর ভূমিতে দুই হাতে বিষবৃক্ষের বীজ ছড়াইয়াছি। এত দিনে সে বৃক্ষে ফল ধরিতে সুরু হইয়াছে।

হঠাৎ সজাগ হইয়া টের পাইলাম যে, একটা মোড় ঘুরিয়া ভাটির মুখে বোট ছুটাইয়া দিয়াছি।

প্রবল স্রোতে এতটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি যে, বাড়ী ফিরিতে প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি হইবে।

তাড়াতাড়ি বোট ঘুরাইলাম। তখন রাধাচরণ বলিতেছে, "মনোহর সার কাছে আজ পর্য্যন্ত সাত লাখ টাকা দেনা হ'য়েছে। সম্পত্তির যা আদায় আজ কাল, তাতে তার সুদও পোষায় না—আপনাদের খরচ তো দূরের কথা। এখনও দেখে শুনে সম্পত্তি শাসন ক'রে খরচ পত্র কমিয়ে দিলে, এ দেনা শোধ হ'তে পারে; কারণ, এখনও সব ঝড়তি পড়তি বাদ দিয়ে আপনার ছিয়ানব্বই হাজার স্থিত আছে। কিন্তু এখন না সামলাতে পারলে আর উপায় নেই। মনোহর সা সম্পত্তি বন্ধকের জন্য বড় পীড়াপীড়ি ক'রছে। আমার মতে সেটা করে ফেলে সুদের হারটা কমিয়ে নিয়ে একটা ব্যবস্থা ক'রলেই ভাল হয়। আর যদি একজন ভাল লোক দিয়ে হিসাব নিকাশ করিয়ে, দেওয়ানজী আর নায়েবদের কাছ থেকে তাদের খাওয়া টাকা বের ক'রতে পারেন, তবে তো সমস্তই সহজ হ'য়ে যাবে।"

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। এত টাকা দেনা হইয়াছে! আমার বিপুল সম্পত্তি বিনাশের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে! কি সর্ব্বনাশ!

ক্রমে শুনিতে পাইলাম যে, যে সব স্কুল হাঁসপাতাল ডিস্পেন্সারী প্রভৃতি আমাদের ব্যয়ে চলিত, সেগুলি হয় সব উঠিয়া গিয়াছে, না হয় জেলাবোর্ড লইয়া গিয়াছে। আমার সম্পত্তির আয়ের এক পয়সাও এখন লোকহিতে অপব্যয় হয় না। বেশ কথা। শুনিয়া তৃপ্ত হইলাম।

রাধাচরণ আবার বলিল, "আর একটা কথা নিবেদন করি। ছোট রাণীমার খরচের হাতটা একটু কমান দরকার বোধ হয়। এখন সম্পত্তির যে অবস্থা তাতে তাঁর মত দান ধ্যান ব্রতপূজা চলা কঠিন। এই তিনি সেদিন ঠাকুর মশায়কে একটা দোতলা বাড়ী করে দেবেন ব'লেছেন। গুরুদেবের কাছে যখন কথা দিয়েছেন, তখন অবশ্যই দিতে হ'বে। ঠাকুর ম'শায় এক বাড়ী ফেঁদে ব'সেছেন, তাতে পঁচিশ হাজার টাকার কমে নিষ্পত্তি হ'বে বোধ হয় না। তার পর ঠাকুর ম'শায়ের নূতন পুত্রবধূকে তিনি সেদিন তাঁর একসুট গয়না দিয়ে ফেললেন। এদিকে মহোৎসবের মাত্রা তিনি ভয়ানক বাড়িয়ে দিয়েছেন। টোলের জন্য যত রাজ্যের মূর্খ ব্রাহ্মণদের জন্য তিনি পঁচিশ টাকা ক'রে বার্ষিকের বরাদ্দ ক'রেছেন। মা আমার ধর্ম্ম-প্রাণ, লোকের দুঃখ কষ্ট সইতে পারেন না। কিন্তু আপনি একটু বুঝিয়া বলবেন যে, এখন অবস্থা বিবেচনায় একটু দান ধ্যান কম করলেই ভাল হয়।"

আমি বুঝাইব! আমার কি সে অধিকার আছে? বাড়ী ফিরিবার পথে একটা ঘাটে নৌকা লাগাইয়া, আমি রাধাচরণকে তার বাড়ীর কাছে নামাইয়া দিলাম। যাইবার পূর্ব্বে সে পাঁচ সাতবার আমার পায়ের ধূলা লইয়া আমার পায়ে ধরিয়া বলিয়া গেল যে, সে যে এ সব কথা বলিল, এ সব যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়। হইলে দেওয়ানজী তাহাকে সবংশে নিধন করিয়া ছাড়িবেন। (ক্রমশঃ)

চট্টগ্রামের কয়েকটী দৃশ্য

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার দত্তগুপ্ত

সমগ্র চট্টগ্রাম ব্যাপিয়া যে অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সম্পদ ছড়াইয়া আছে, খণ্ড-খণ্ড ভাবে তাহার অতুলনীয় শোভার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় কিম্বা কলা-কুশলী লেখকের লেখনীতে তাহার যৎসামান্য প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে তাহার বিচিত্র রূপ অপার্থিব ও অবর্ণনীয়। চট্টগ্রামে প্রকৃতির ত্রিবিধ বিচিত্র রূপ সম্মিলিত হইয়াছে বলিয়া, ইহাকে প্রকৃতির রহস্যভূমি বলিলে ইহার যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। পালি গ্রন্থে ইহার নাম রহস্যভূমি। ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই সম্ভবতঃ বৌদ্ধগণ এই শস্যশ্যামলা, নদ-নদী-পর্ব্বত-সমুদ্র-নির্ঝরিণী ও অসংখ্য জলপ্রপাত-পরিবেষ্টিত চট্টলভূমিকে রহস্যভূমি নামে অভিহিত করিয়াছেন। একাধারে নদী, গিরি ও সমুদ্রের সম্মিলনে রহস্যভূমি প্রকৃতির যথার্থ স্নেহের নিধি হইয়া পড়িয়াছে। চট্টগ্রামের মেখলায় কর্ণফুলী নদী আপনার বিচিত্র ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে। মস্তকে গিরিশৃঙ্গ মুকুটস্বরূপ শোভা পাইতেছে এবং

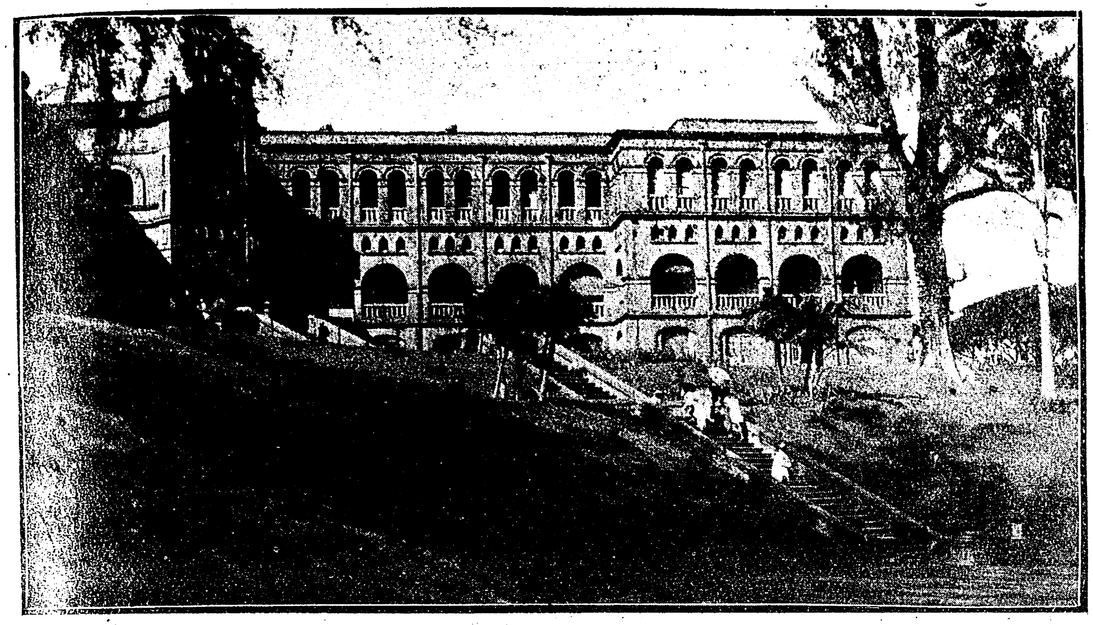

কোর্ট বিল্ডিং

পদতলে নীল সমুদ্র অশ্রান্ত কলরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছে। ইহার গোপন গিরিগহ্বরেও কত শত প্রস্রবণ জন্মলাভ করিয়া, আপন শোভায় আপনি মুগ্ধ হইয়া আছে। প্রকৃতির অন্তরের সেই নিভৃত প্রদেশের কান্ত-মধুর-রূপ আজ উদ্ঘাটিত করিতে পারা গেল না; কিন্তু তাহার বাহিরের যে রূপ সতত সকলের সম্মুখে

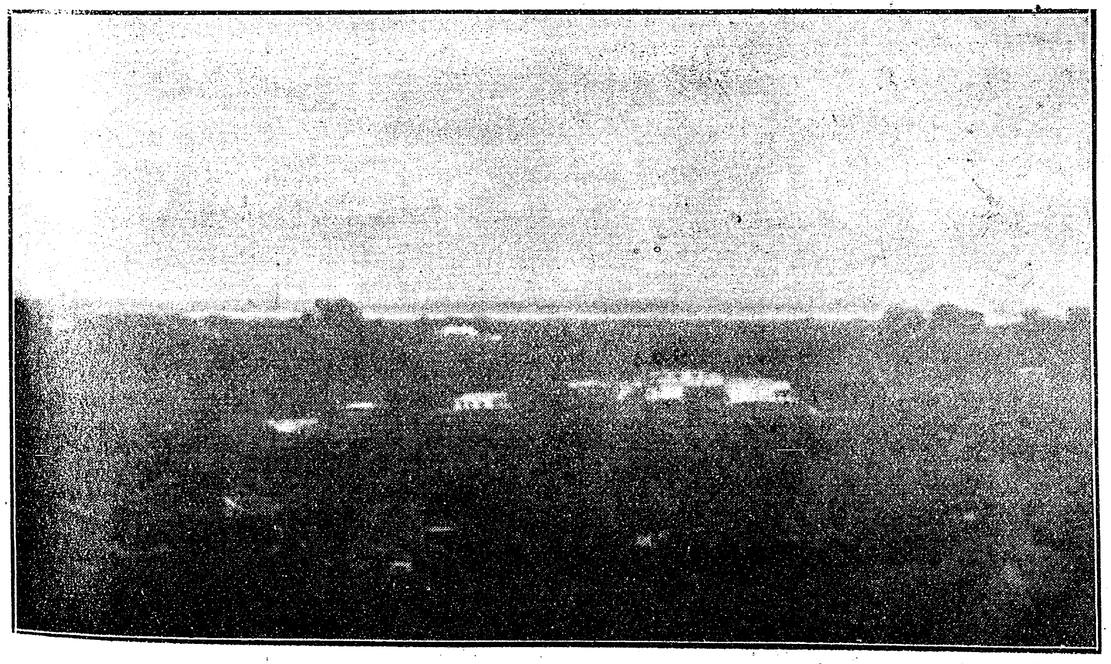

কোর্ট বিল্ডিং হইতে একটি মনোরম দৃশ্য

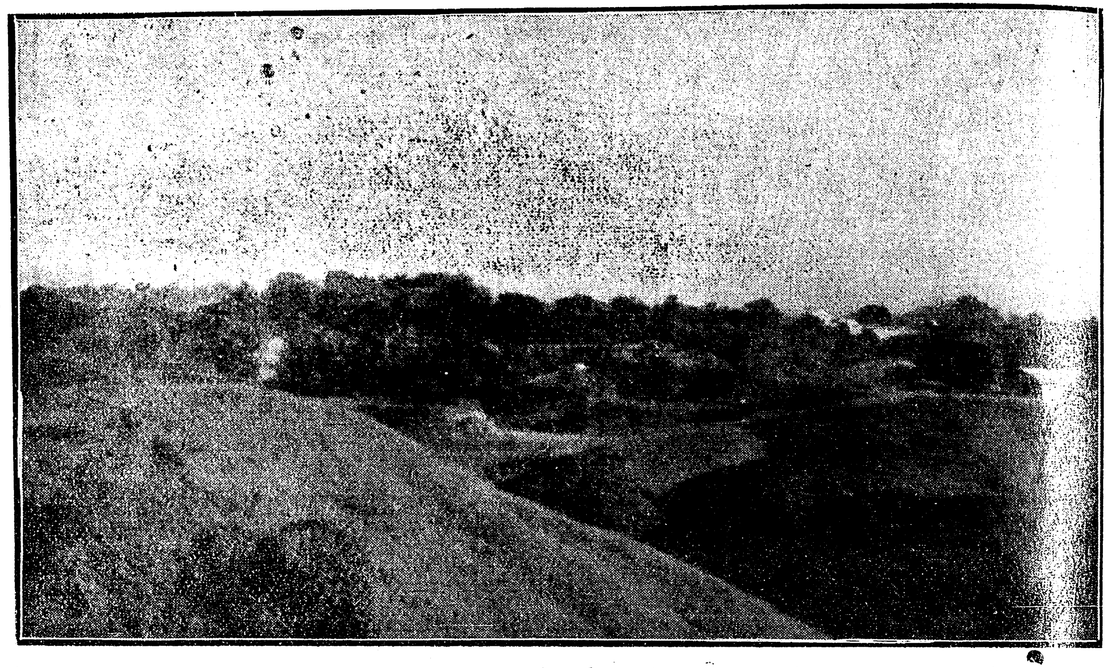

কোর্ট বিল্ডিং হইতে অপর একটি দৃশ্য

প্রতিভাত হইয়া আছে, তাহার কিঞ্চিৎ এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

(১) কোর্ট বিল্ডিং। ইহা একটী গিরিশৃঙ্গের উপর অবস্থিত। এই স্থান হইতে চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

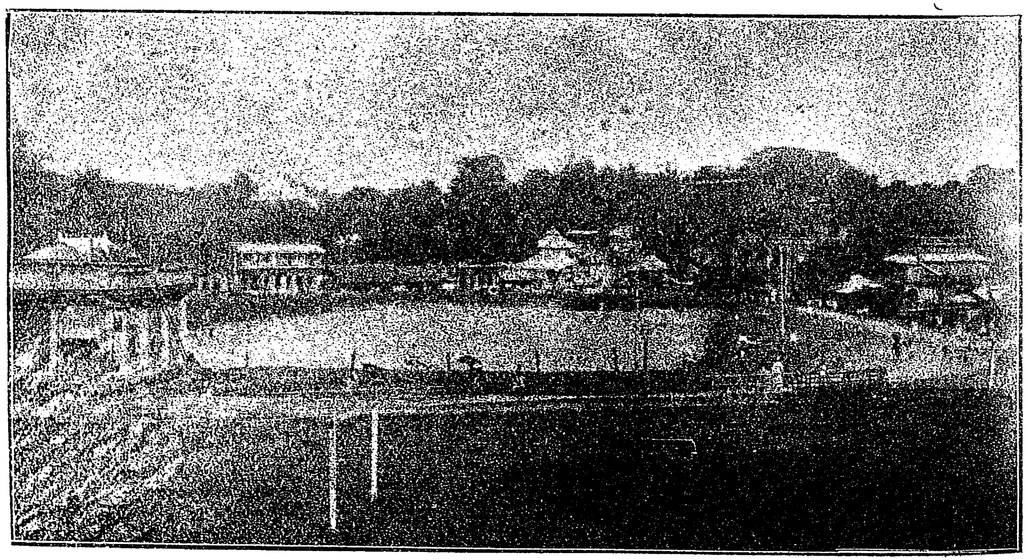

সহরের মধ্যস্থিত লালদীঘি ও অন্দরকিল্লা রোড

অতীব রমণীয়। এখানে গমনাগমনের সুবিধার জন্য পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে।

(২) কোর্ট বিল্ডিং হইতে চট্টলের একটী মনোরম দৃশ্য।

টেলিগ্রাফ্ বিল্ডিং

(৩) কোর্ট বিল্ডিং হইতে অপর একটী দৃশ্য।

(৪) সহরের মধ্যস্থিত লালদীঘি ও চট্টগ্রামের সর্ব্ব প্রধান আন্দরকিল্লা রোড্।

(৫) টেলিগ্রাফ বিল্ডিং। ইহাও একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। টেলিগ্রাফ আফিস বিল্ডিং হইতে কর্ণফুলী নদীর মোহানার দৃশ্য অতীব রমণীয়

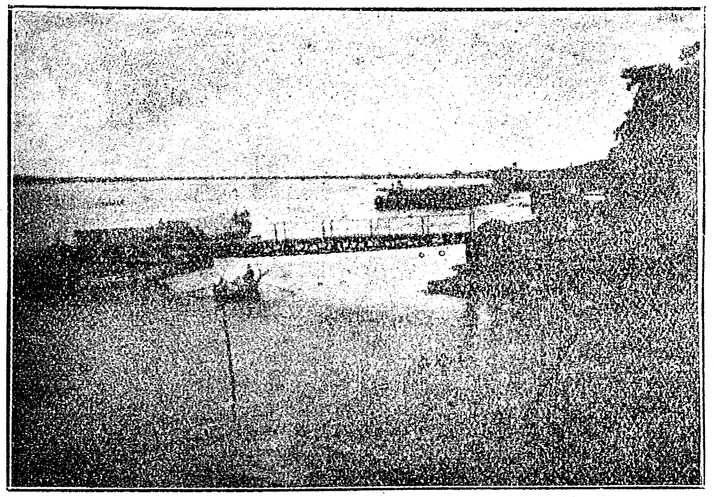

কর্ণফুলীর একটী দৃশ্য। সম্মুখে এতদ্দেশীয় নৌকা। ইহাকে দেশীয় ভাষায় "সাম্পান" বলে

(৬) কর্ণফুলীর একটী দৃশ্য। সম্মুখে এতদ্দেশীয় নৌকা। ইহাকে দেশীয় ভাষায় "সাম্পান" বলে। লুসাই পাহাড়ের কাউয়াদং (Kowadong) দেদং ও ফিনাঙ (Phynong) এই তিনটি সরিৎ একত্র হইয়াই কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত সরিৎত্রয়ের সম্মিলন-স্থান হইতে কর্ণফুলী নদীর দৈর্ঘ্য ১৫০ মাইল।

(৭) কর্ণফুলীর একটী দৃশ্য।

(৮) চট্টগ্রাম খাস্তগির High English বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখ দৃশ্য। বিদ্যালয়ের সম্মুখ ভাগে যে রাস্তাটী দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম। বিদ্যালয়ের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী পাহাড়—মধ্যস্থলে সমতলভূমির উপর স্কুল গৃহটি অবস্থিত।

(৯) মিউনিসিপালিটীর বহির্দ্দেশে অবস্থিত পুলিস কোয়াটার।

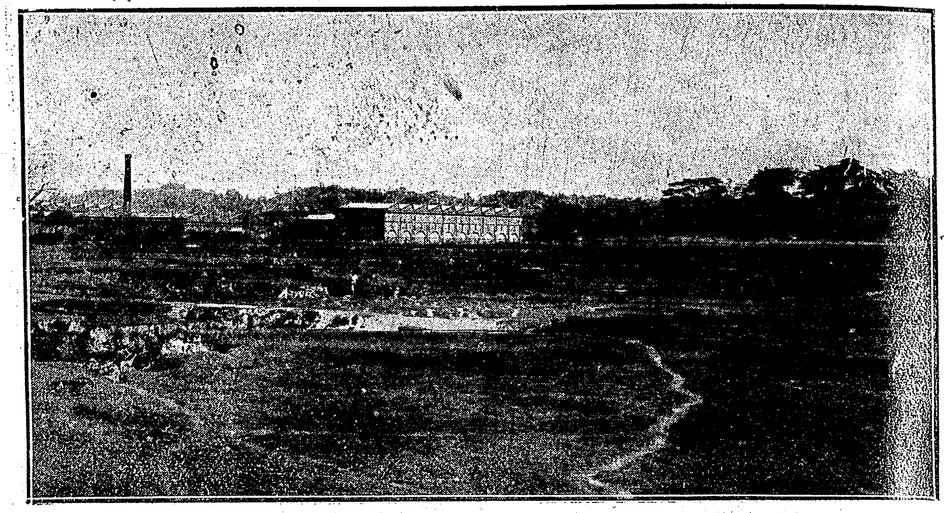

পাহাড়তলীর একটি দৃশ্য

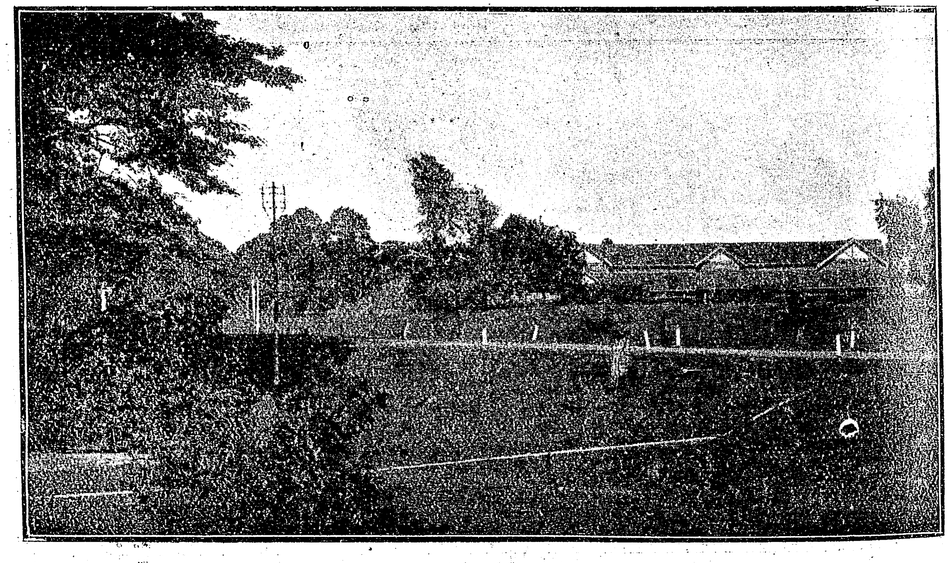

এ, বি, রেলওয়ে হাসপাতাল রোড্

কক্সবাজার খেয়াঘাট

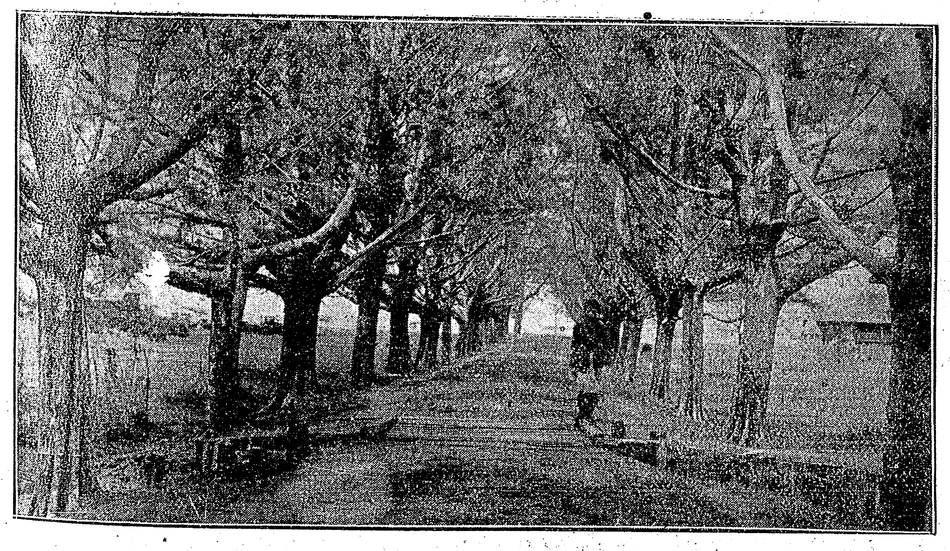

সমুদ্রতীরবর্ত্তী কক্সবাজারের রাজপথ

কর্ণফুলীর অপর একটি দৃশ্য

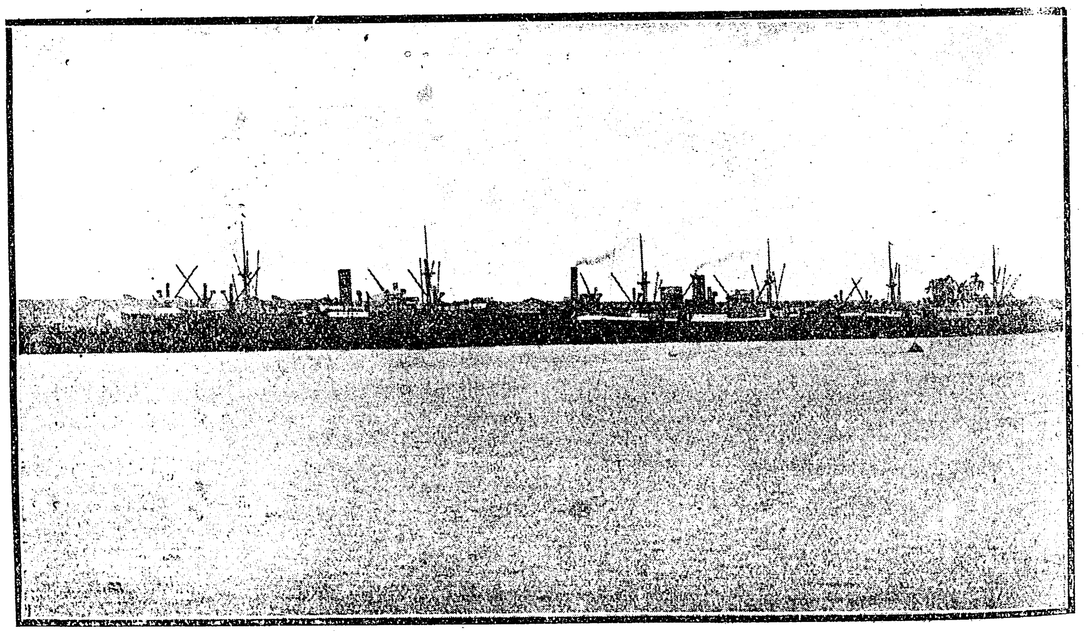

কর্ণফুলীর একটি দৃশ্য

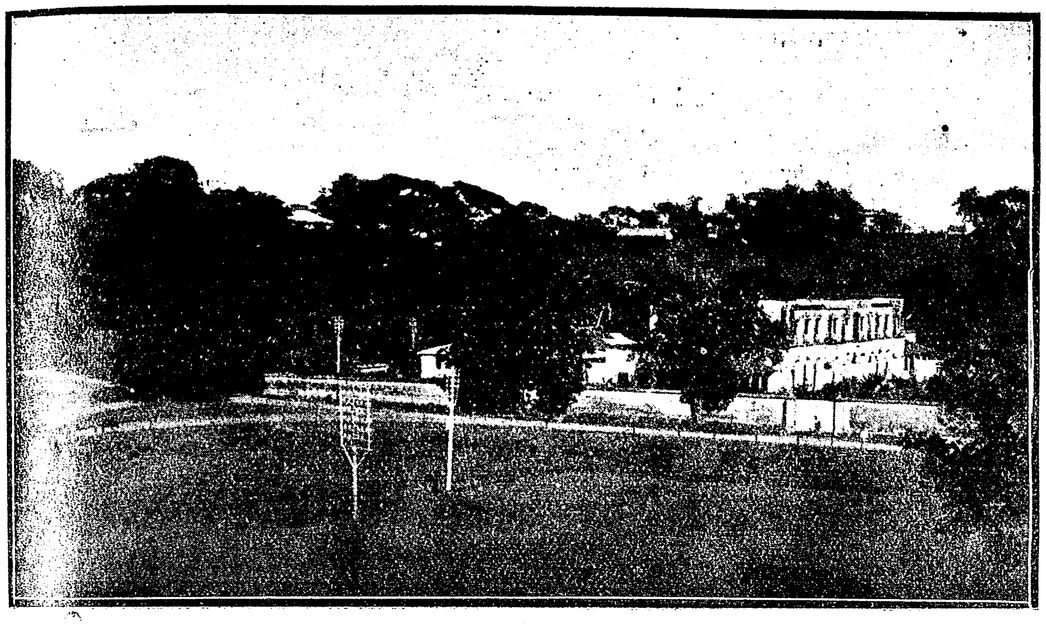

চট্টগ্রাম খাস্তগির বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্মুখ দৃশ্য

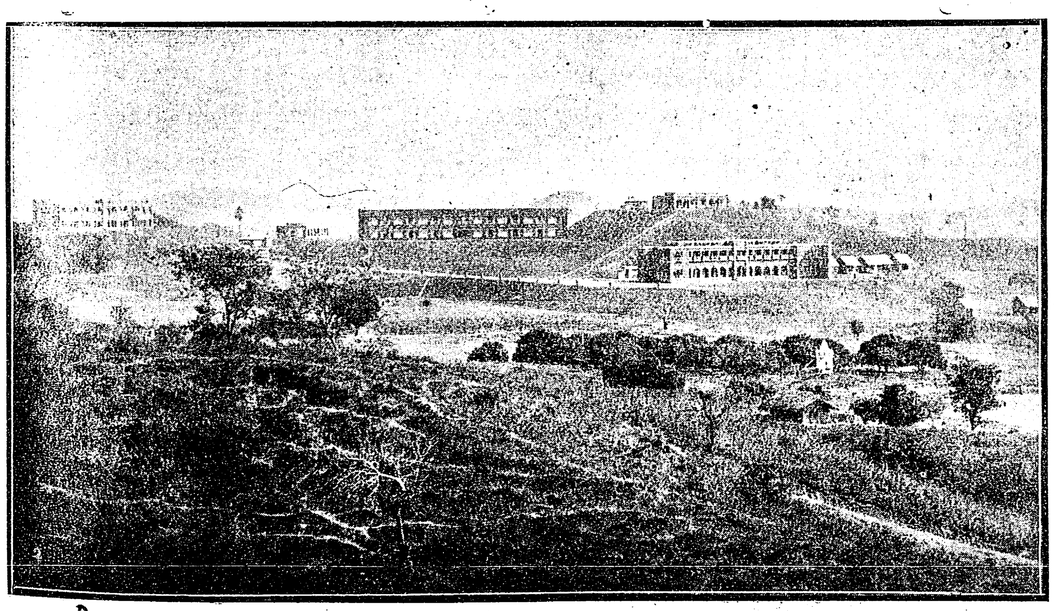

মিউনিসিপালিটির বহির্দ্দেশে অবস্থিত পুলিস কোয়ার্টার

(১০) পাহাড়তলীর একটী দৃশ্য। পর্ব্বত শ্রেণীর পাদ দেশে অবস্থিত বলিয়াই ইহার নাম পাহাড়তলী।

(১১) এ, বি, রেলওয়ে হাসপাতাল রোড্।

(১২) কক্সবাজার (Cox-Bazar) একটী স্বাস্থ্যকর ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী রমণীয় স্থান।

পূর্ব্বে ইহাকে ফালোংক্ষি বলা হইত। কক্স সাহেব এখানে বাজারের পত্তন করিয়াছেন—এই নিমিত্ত ইহার নাম কক্স-বাজার। দেশ-বিদেশ হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারী বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী কক্সবাজারে আসিয়া বসবাস করেন। এটী চট্টগ্রামের অন্তর্গত একটী মহকুমা। সহর হইতে ষ্টীমারে সমুদ্র-পথে মাত্র ৬ ঘণ্টার পথ। দিন শেষে বিদায়-রবির ক্লান্ত-রঙ্গীন কিরণ যখন পশ্চিম-সমুদ্রের অতলস্পর্শী সিন্ধুর সহিত কোলাকুলি করিতে থাকে, সেই মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক মধুর রূপটির নিকট চিত্রকরের অঙ্কন-পটুতা, কবির কল্পনা, বক্তার বাক্‌চাতুর্য্য ও লেখকের শব্দ-বিন্যাস কৌশল প্রভৃতি আপনা হইতেই পরাজয় স্বীকার করে। যিনি সমুদ্রের সৈকতভূমিতে থাকিয়া স্বচক্ষে সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন, তিনিই ইহার কান্ত-মধুর রূপ দর্শনে নির্ম্মল আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, যেন ব্যথিতের হা হুতাশ—কালের ভৈরবী মূর্ত্তি এখানে নাই;—আছে শুধু এক অনির্ব্বচনীয় নিখিল ভরা আনন্দ—আর আনন্দ।

(১৩) সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কক্সবাজার রাজ-পথটি অতীব রমণীয়। রাস্তার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিটপী-শ্রেণী ইহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। সন্ধ্যা সমাগমে এই ছায়া-ঘেরা বিজন পথটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পথিকের প্রাণ-মন দুই আকৃষ্ট হয়। বৃক্ষ শ্রেণীর কিয়দ্দূরে কক্সবাজার Government Office দৃষ্ট হইতেছে। চট্টগ্রাম জিলাটীকে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র বলিলেই ইহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে চট্টগ্রামের ন্যায় এমন রমণীয় সহর আছে কি না সন্দেহ।

[চট্টগ্রাম ডবলমুরিং জেটী (Double mooring Jetty) সহর হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। ভুলক্রমে পূর্ব্ব সংখ্যক তথায় ২২ মাইল ছাপা হয়।—লেখক]

কপোতাক্ষী তীরে

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

কপোতাক্ষী ! স্মরি' তব মৃদু কলধ্বনি,
ফরাসী প্রবাসে কবি বিরহ ব্যথায়,
গায়িলা যে গীত !—সম মহামূল্য মণি—
খচিত মর্ম্মর বুকে কি দিব্য প্রভায় !
উচ্ছল-ঊর্ম্মিল-নীল-অনাবিল-নীরে,
আছে মধু কবিতার করুণ ঝঙ্কার !
অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে আঁকা চিররম্য তীরে,
বাল্যের বিমল ছবি বিশ্ব প্রতিভার !
স্নিগ্ধ-স্বচ্ছোজ্জ্বল-বারি-মুকুরে-বিম্বিত
(সার্থক ও নাম তব খ্যাত চরাচর !)
শ্রীমধু মূরতি শ্যাম !—হিল্লোলে কম্পিত
সে রূপ-মাধুরী ভরা প্রকৃতি সুন্দর !
উর বাণী-বর-পুত্র এ তীর্থ-দেউলে,
লহ অর্ঘ্য, স্মৃতি-পূজা, চিত্ত-বনফুলে ! *

* ১২ই মাঘ, ১৩৩১ সনে মধুসূদনের জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষী তীরে 'কপোতাক্ষ নদ' শীর্ষক কবিতা উৎকীর্ণ স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে।

পল্লী-বিধবা ও শিক্ষা

শ্রীগিরিবালা রায়

আজ আমি বাঙ্গালার পল্লী-বিধবাদের সম্বন্ধে গুটিকতক কথা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ নগণ্য লেখিকার কথা একেবারে উড়াইয়া দিবেন না।

বাঙ্গালার সহায়সম্পদহীনা হিন্দু বিধবাদের অবস্থা যে কতদূর মর্ম্মান্তিক, সমাজের বিধি-নিষেধের উপর দাঁড়াইয়া যে তাঁহারা কি ভয়াবহ জীবন-ভার বহন করেন, সে কথা চিন্তা করিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

হিন্দু বিধবার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালনই কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম, পরোপকারই তাঁহাদের ব্রত, ত্যাগ ও সংযমই তাঁহাদের আদর্শ—মানিলাম; কিন্তু কয়জন বিধবা এ সুযোগ, এ শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? যাঁহারা পরিণত বয়সে বিধবা হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন বিধবাগণের সম্বন্ধে তবু আশা করা যায় যে, তাঁহারা নিজ ব্যবস্থা নিজে কতক পরিমাণে করিতে সমর্থ হয়েন; কিন্তু বাল-বিধবাগণের জীবন বড়ই দুঃসহ। শিক্ষার অভাবে আমাদের পল্লীগ্রামের কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই প্রায় অতি সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া থাকেন। পর-নিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, দ্বেষ, কলহপ্রিয়তা—এ সব লইয়াই প্রায় তাঁহাদের সাংসারিক জীবন। সুতরাং বালবিধবা আত্মীয়াকে যত্ন করিবার, ভালবাসিবার মত মন ও শক্তি-সামর্থ্য—কিছুই তাঁহাদের না থাকা অত্যাশ্চর্য্য না হইতে পারে, কিন্তু আজকাল শিক্ষিত নামধারী বাবুরাও—বিধবা ভ্রাতৃবধূ কি বোন অথবা অন্য কোন আত্মীয়া যেই থাকুন, তাঁহাকে সমান প্রীতি দেখান তো দূরের কথা,—দাসী চাকরের প্রাপ্য করুণাও তাঁহারা দান করেন না। তবু তাঁহাদের কাছে থাকিতে উহারা বাধ্য। সধবা মেয়েরা ত এক লহমার ঘটনা-চক্রে নিজেরাও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন; তথাপি স্বামীদের আদর্শই তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সধবা নারী বিধবা নারীর কদর একটু বুঝিতে চাহেন না। তাহার কারণ—মেয়েদের নিজেদের বুদ্ধি-বিবেকের উপর নির্ভর করিবার বিন্দুমাত্র সাহস নাই বলিয়া।

বিশেষ আজকালকার হাল ফ্যাসানের সংসারে প্রায়ই দেখা যায় যে, নিজ সন্তান পরিবার ছাড়া অন্য আত্মীয়ের ভার বড় কেহ বহন করিতে চাহেন না। কদাচিৎ দুই-একটি একান্নবর্ত্তী কর্ত্তব্যপরায়ণ সংসার দেখা যায় সত্য,—কিন্তু একটা সংসার দেখিয়া তো জগৎ-সংসারের ব্যবস্থা করিলে চলিতে পারে না। এখন সেদিন নাই, সে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা নাই। অর্থ নাই, একের উপার্জ্জনে দশের দিন চলা এখনকার মতে বিধেয় নহে। তবে শুধু পূর্ব্বের ব্যবস্থার দোহাই দিয়া এ সব পাপের ফল একা বিধবারাই ভোগ

করেন কেন? প্রকৃত প্রাণের দরদী না হইলে, শুধু মৌখিক ভালবাসায় একটা জীবন চলিতে পারে না। অথবা তাহার কর্ত্তব্য পালনে সে আনন্দ ও উৎসাহ পায় না। পরের জন্য স্বার্থ-ত্যাগে বড় একটা সুখ আছে, যদি সে বুঝিতে পারে—ইহাতে তাহারও কিছু উপকার আছে। প্রত্যেক জীবই সুখান্বেষী, আরাম-প্রয়াসী; বিধবা হইলেই তাহার অন্তরের বৃত্তিগুলি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এরূপ বোধ হয় কেহই স্বীকার ও বিশ্বাস করিতে পারেন না।

সমাজ বিধবাদের প্রতি অতি নির্দ্দয় ও কঠিন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বদা তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি বিধবাদের গতিবিধির উপরে আছে। সামান্য একটু ছুতা পাইলেই, তাঁরা কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সে ব্যবস্থায় তাঁদের উপকার তো হয়ই না, বরং অধোগতির পথ আরো মুক্ত হয়; জীবনে একদিনের ভুলের জন্য,—বিচারকের দণ্ডে—আর ফিরিয়া জীবনটা গড়িয়া তুলিবার পথ থাকে না। সমাজচ্যুতি, একঘরে অর্থাৎ ধোপা বন্ধ, নাপিত বন্ধ,—পাড়ায় দিন-রাত্রি তাঁদের সম্বন্ধে কুৎসা গাহিয়া বেড়ানই হয় তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা। কিন্তু এই যে সমাজের এত সতর্কতা সত্ত্বেও পতিতা বিধবার সংখ্যা বস্তুতঃ কম নহে—তাহার কারণ কি এই সমাজের অতি-শাসন বা অবিমৃষ্যকারিতাই নয়?

আমাদের আদর্শ অনেকই আছে, কিন্তু সেই আদর্শের মূল কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন কি? পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য তাঁহার বাল-বিধবা কন্যা লীলাবতীকে কিরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন? বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধের বৃহৎ মন্ত্রণাগৃহে রায়-রাইয়াঁদের সঙ্গে পরামর্শ-ক্ষেত্রে, আমাদের একজন বাঙ্গালী বিধবা রমণী (রাণী ভবানী) সমান আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত সু-যুক্তি তাঁহার মস্তিষ্ক হইতেই বাহির হইয়াছিল। এই রাণী ভবানী, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও হিন্দু বিধবার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গিয়াছেন। একাহার, ভূমিশয্যা কিছুতেই তাঁহার ত্রুটী ছিল না। তাই বলিতেছি, এখনকার বিধবাদের মত পরের লাথি না খাইয়া আর পরমুখাপেক্ষিনী না হইয়া, নিজের পায়ে ভর করিবার সাহস অবলম্বন করিলে বৈধব্য জীবনের কোন ধর্ম্মের হানি হয়, এমন কল্পনা কাহারও মনে না থাকাই সঙ্গত। যে দেশের নারীগণ ধর্ম্মের জন্য কৃপাণ ধরিত, সে দেশের নারীগণ নিজ মর্য্যাদা রক্ষার দাবীটুকুও এখন করিতে পারে না কেন? দুর্ব্বলা, শক্তি-হীনা বলিয়া পঙ্গু হইয়া সমস্ত শক্তি তাহাদের ধ্বংসের পথে যাইতেছে।

মনের জোরে শারীরিক শক্তিও বৃদ্ধি পায়, এটা বিজ্ঞান-সম্মত কথা। এখনকার মেয়েদের ন্যায় তখনকার মেয়েদের এই দুরবস্থা ছিল না। তখন ছিল—ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও সমান শিক্ষা। মস্তিষ্কচালনা, যুদ্ধ-বিদ্যা, শাস্ত্র অধ্যয়ন, রাজ-নীতিক গূঢ়-তত্ত্ব—সর্ব্ব-ক্ষেত্রেই সমান অধিকার তাঁরা পাইতেন। এখন তো সে সব স্বপ্নের কথা। আমাদের এই ভারতেই তারাবাই, লক্ষ্মীবাই, অহল্যাবাই, রাজপুত ও মারাঠী রমণীগণ অদ্ভুত শিক্ষার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর এখন আমরা নিজেদের হইয়া একটা কথা বলিবার অধিকার পর্য্যন্ত রাখি না, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়? আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা মেয়েদের কোন কথা বলিতে দেখিলে অম্‌নি চীৎকার করিয়া উঠেন যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া গেল সব রমণী রসাতলে,—চাই সে ইংরাজি জানুক আর নাই জানুক। অবশ্য এঁদের কথায় ভয় পাইলে আর আমাদের এখন চলিবে না। প্রাচ্যের রমণী প্রাচ্যকে পুরুষ অপেক্ষা কম ভালবাসে না। সে সীতা সাবিত্রী লইয়া এত মাথা কুটাকুটি, তাঁদের গোড়া কয় জনে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন? তাঁরাও পূর্ণ-শিক্ষিতা স্বাধীনা রমণী ছিলেন। হ্যামৎসেন-পত্নী আদর্শ-শিক্ষিতা, জ্ঞানবতী রমণী ছিলেন। তাই নারী-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়া, বধূকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন—স্বামীসহ বন গমনে। রাজা অশ্বপতি, কন্যা সাবিত্রীকে রথারোহণে পাঠাইয়াছিলেন নিজ স্বামী বাছিয়া আনিতে, ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন কি? তাই বলিতেছি—দেশের দুর্ভাগ্য যে, মেয়েদের হইয়া কোন মেয়ে দুইটা কথা বলিলেই সে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা ও কুলবধূদের মাথা খাইতেছে বলিয়া গালি খায়। তাঁহাদের মতের শিক্ষা—বোধোদয়ের বিদ্যা; বাঙ্গলা হরপ শিখিয়া দুই পাতা পড়িতে পারা। সে বিদ্যার চোটে মেয়েদের যার তার লেখা নাটক-নভেল কণ্ঠস্থ করা, আর স্বামীর কাছে দীর্ঘ-দীর্ঘ প্রেম-পত্র লেখা—এই পর্য্যন্ত

তাহাদের জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। সুতরাং এই সব কারণেও মেয়েদের উচ্চ-শিক্ষার প্রয়োজন। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, গণিতে, দর্শনে তাঁহাদেরও পুরোপুরি দখল থাকা আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্র বুঝিতে হইলেও তাঁহাদের বিশেষ শিক্ষার দরকার। নারীদের কর্ত্তব্য কি, তাহা নারীদের অনুধাবন করা কি সুযুক্তিসঙ্গত নহে? সংযম-ত্যাগের আদর্শ সংসারে বিরল,—কাহার দেখিয়া কে শিখিবে? সংসারে একা ত্যাগ করিবে শুধু বিধবাগণই! প্রত্যেক সংসারই এই ঘোর ভ্রান্তির বশীভূত।

শুধু পল্লী-বিধবাদের কথা কেন, এই কলিকাতা সহর-বাসী ধনীলোকদের গৃহেও প্রায় অনেক পরিবারেই দেখা যায়—দু'একটি বিধবা আত্মীয়া আছেন, সংসারের সব ঝি-রাঁধুনীর কাজ করিতে। ঝি-রাঁধুনীর তবু একটা নিজস্ব স্বাধীনতা আছে, কাজ করে—পয়সা নেয়। এ-যে বিনে মাহিনায়, আর আধপেটা খেয়ে!

বিধবা মেয়েরা সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রতি প্রত্যেকের সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া-দেখিয়া নিজেরাও ঘোর সঙ্কীর্ণ-চেতা হইয়া পড়েন। কোন একটি মেয়ে যদি তাহাদের নিয়মের মাপ-কাঠি হইতে একটু এ-দিক্ ও-দিক্ করিল, তবেই তাহার আর রক্ষা নাই। কেহ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের ভুল বুঝাইয়া দিবেন না, সর্ব্বত্র তাঁহাদের দোষের ডঙ্কাই বাজাইয়া বেড়াইবেন,—ইহাই না কি তাঁহাদের সনাতন রীতি।

সত্য-কথা বলিতে কি, আমাদের দেশের পতিতা মেয়েদের মধ্যে প্রায় বেশীর ভাগই অল্প-বয়স্কা বিধবা। তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে আরো দেখা যায় যে,—প্রায় অনেকেই প্রবৃত্তির তাড়না অপেক্ষা পেটের জ্বালায় ও সমাজের নির্য্যাতনের ফলে এই আপাত-মধুর পাপের পথে ধাবিত হইয়াছে। সে দিন এখন আর নাই যে হাজার অনুশোচনা সত্ত্বেও কোন একটি পতিতা মেয়েকে কেহ প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে পারে। আমরা বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে জানিতে পারি, সন্ন্যাসী উপগুপ্ত মথুরা-বাসিনী একটি পতিতাকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়া-ছিলেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। সে সব যুগ এখন অন্তর্হিত, কিন্তু পাপের লীলা ঠিকই আছে। যে-সব লম্পটের দোষে আজ হতভাগিনীদের এই দুরবস্থা, তাহারাই কিন্তু সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়া থাকে। যদি কোন মেয়ে কখনো প্রবৃত্তির দোষে কিছু অপরাধ করিয়া থাকেন, তাতেই বা তার এত অভিশপ্ত জীবন বহন করিতে হয় কেন? প্রবৃত্তির নিয়মানুসারেই মানুষের মনের গতি চলিবে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং কি প্রকারে এক-ই সংসারে দুইটী মেয়ে (কোন কোনস্থলে তাহারা সমবয়স্কাও হইয়া থাকে) সম্পূর্ণ বিপরীত নিয়মে চলিতে পারে, ও তাহাতে তাহাদের আদর্শ জীবন গঠিত হইতে পারে? যাঁহার স্বামী আছে, তাঁহার সাত খুন মাপ। যত বড় বিলাসিতাই হউক না কেন,—সম-বয়স্কা বিধবা জা কি ননদ অথবা অন্য আত্মীয়াই হউক,—তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহারা তাহা অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদেরই বিলাসের সব সামগ্রী বহন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে এই সব বিধবা আত্মীয়াকে। তাহাতেও তাঁহাদের নিস্তার থাকে না। যদি পাণ হইতে চুণ খ'সে, তবেই কর্ত্তব্য-ভঙ্গের অপরাধে বহুবিধ বাক্যবাণ, অনেক স্থলে তদপেক্ষা অধিক শাস্তি পাইতে হয়। আশ্চর্য্যের কথা এই যে—শাশুড়ী পর্য্যন্ত বিধবা বউকে স্নেহের চক্ষে দেখেন না। তিনিও সময় বুঝিয়া সধবা পুত্র-বধূর স্বার্থ-হানির আশঙ্কায় বিধবা পুত্র-বধূকে যথেষ্ট নির্য্যাতন করিয়া থাকেন। এই শাশুড়ীগণই আবার কেহ কেহ শিশু সন্তানদের লইয়া বিধবা হইয়া আত্মীয়দের নিকট বহু লাঞ্ছনা পাইয়া দশ-দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া তবে ছেলেদের অর্থোপার্জ্জনক্ষম করিয়া থাকেন।

যে সংসারে বালিকা বিধবা হয়, তাহাকে যদি প্রকৃত ভাবে সকল মনোবৃত্তি দমন করিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহার অভিভাবকদের তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ জীবন যাপন করিতে হয়, নতুবা কখনো এমন অদ্ভুত নিয়মে শুভ উৎপন্ন হইতে পারে না।

পল্লী-গ্রামের বহু অল্পবয়স্কা বিধবাকে দেখা যায় যে—তাঁরা দারুণ শীতে ভোর পাঁচটায় উঠিয়া শুধু এক বস্ত্রে (দ্বিতীয় বস্ত্র গ্রহণ না কি তাঁহাদের পাপ) সংসারে বহু-বিধ কাজ নিজ হস্তে করিয়া থাকেন। সমস্ত দিন খাটিয়া প্রত্যেকের সুখ সুবিধা দেখিয়া বেলা পাঁচটায় তাহাদের হবিষ্যান্নের যোগাড়ে যাইতে হয়। "পর-সেবাই ধর্ম্ম" এই মহাবাক্য যথার্থ সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সেবা করিবে ধর্ম্ম শুধু

তাহারই একলাকার নয়, যাহাদের সেবা করিবে তাহাদেরও তো একটা ধর্ম্ম থাকা উচিত। জানি না সেই শুদ্ধ শান্ত পূর্ণ-ব্রহ্ম ঋষিগণ শুধু অভাগা বিধবাদের জন্যই এ নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন কি না। মূল কথা—এইরূপ জীবন যাপন অপেক্ষা, যদি তাঁরা উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তবে নিজ জীবিকা নিজে অর্জ্জন করিয়াও সৎকাজের জন্য অনেক সময় পাইতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ বারংবার বলিয়া গিয়াছেন—"আগে মেয়েদের উন্নত কর, নতুবা এই অধম জাতির উপায় নাই।" মেয়েদের উন্নতি তো দূরের কথা, পুরুষজাতির সহৃদয়তায় তাঁহাদের জাতি ক্রমশঃ নিম্নস্তরেই যাইতেছে। প্রভুরা সর্ব্বদা কর্ত্তা সাজিয়া চক্‌মকি ঠুকিয়া আলোক-জ্যোতিঃ দেখাইতেছেন। বিধাতা বোধ হয় জন্ম দিবার পূর্ব্বেই চিত্রগুপ্তের খাতায় "পুরুষদের স্বর্গ, মেয়েদের নরক অবশ্যম্ভাবী" এ ব্যবস্থা লিখিয়া রাখেন।

দেশ, কাল, পাত্র হিসাবে সমাজ সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যেমন দেবমন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া ঘর, দরজা, ঘটী, বাটী, থালা কোন জিনিসেরই সংস্কার না করিলে ক্রমে নষ্টের পথেই যায়, তেমনি সমাজেরও চির-পুরাতন ব্যবস্থা ধরিয়া থাকিলে, সমাজ নষ্টের পথেই চলিবে। সমাজই হইয়াছে জাতির জীবন-মরণ। চট্ করিয়া নূতনে যাওয়া গর্হিত, কিন্তু চির-পুরাতন ধরিয়া থাকাও ঠিক্ নহে। আস্তে আস্তে সংস্কার করিলে তবে জাতিও ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে উঠিতে পারিবে।

আর্য্য ঋষিগণ হিন্দু সমাজকে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। এখন ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়াছে, আবর্জ্জনাটুকুই পড়িয়া রহিয়াছে। অলসতার জন্যই হিন্দু মরিতে বসিয়াছে। স্বামীজি যে বলিয়া গিয়াছেন "আমাদের অদ্ভুত ধর্ম্ম ও'দের শিক্ষা দিব, আর ও'দের সামাজিক নিয়ম আমরা গ্রহণ করিব" তাহার অর্থ বিলাতী উচ্ছৃঙ্খলতা গ্রহণ নহে,—তাহাদের কর্ম্ম প্রবণতা গ্রহণ করা।

দেওঘরে সাধু বালানন্দের নিকট এক দিন গিয়াছিলাম। তিনি আমাদের উপদেশ দিলেন—"শ্রূয়তাং ধর্ম্ম সর্ব্বস্বং যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পর পীড়নম্॥" তাঁর মুখ হইতে তখন এই ছোট্ট শ্লোকটী বড়ই মধুর শুনিয়াছিলাম। সমাজ অসহায়া বিধবার প্রতি যে দয়া দেখাইতেছেন, তাহাতে সমাজের পুণ্যের বোঝা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে সন্দেহ নাই। যাক্, ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও জীবন-যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন। সাংসারিক কার্য্য মেয়েদের, অর্থোপার্জ্জন ছেলেদের—কে তাহা অস্বীকার করিতেছে? গ্রীষ্মকালের দুপুর রৌদ্রে—যে মেয়ের ভাগ্যে আছে—তাঁহার স্বামী আফিস্ কলেজে থাকুন, তিনি ঘরে বসিয়া ছেলে মেয়ে লইয়া ঘুম-পাড়ানি গীত গাহুন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবার হেতু নাই। মেয়েরা মাতৃত্বের অধিকারিণী, এই কারণেই ঘরকন্নায় মেয়েদের একান্ত প্রয়োজন। নির্ভরের জন্য নয়, আরামের জন্য নয়, ভোগের জন্য নয়;—মুক্তির জন্য। মাতৃত্বকে মেয়েরা এত ভালবাসে যে তাহাকে বন্ধন বলিয়া তাহারা মনে করে না,—এ যে তাহাদের পরম মুক্তি। কিন্তু ভাগ্য-বিধাতার নিদারুণ দণ্ডে এসব হইতে যাহারা সম্পূর্ণ বঞ্চিতা, তাঁহাদের জীবন-যাত্রার একটা পন্থা চাই তো? নিজের জীবনটা দলিয়া পিষিয়া ধ্বংসের দিকে পাঠাইয়া দেওয়াই তো আর একটা জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। বিধবা বিবাহ হইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষ বড় বড় পণ্ডিতগণ এ বিষয় লইয়া বহু গবেষণা করিতেছেন। তাঁহাদের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে কি সিদ্ধান্ত স্থির হয় তাহা দেখিবার জন্যই লেখিকা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব।

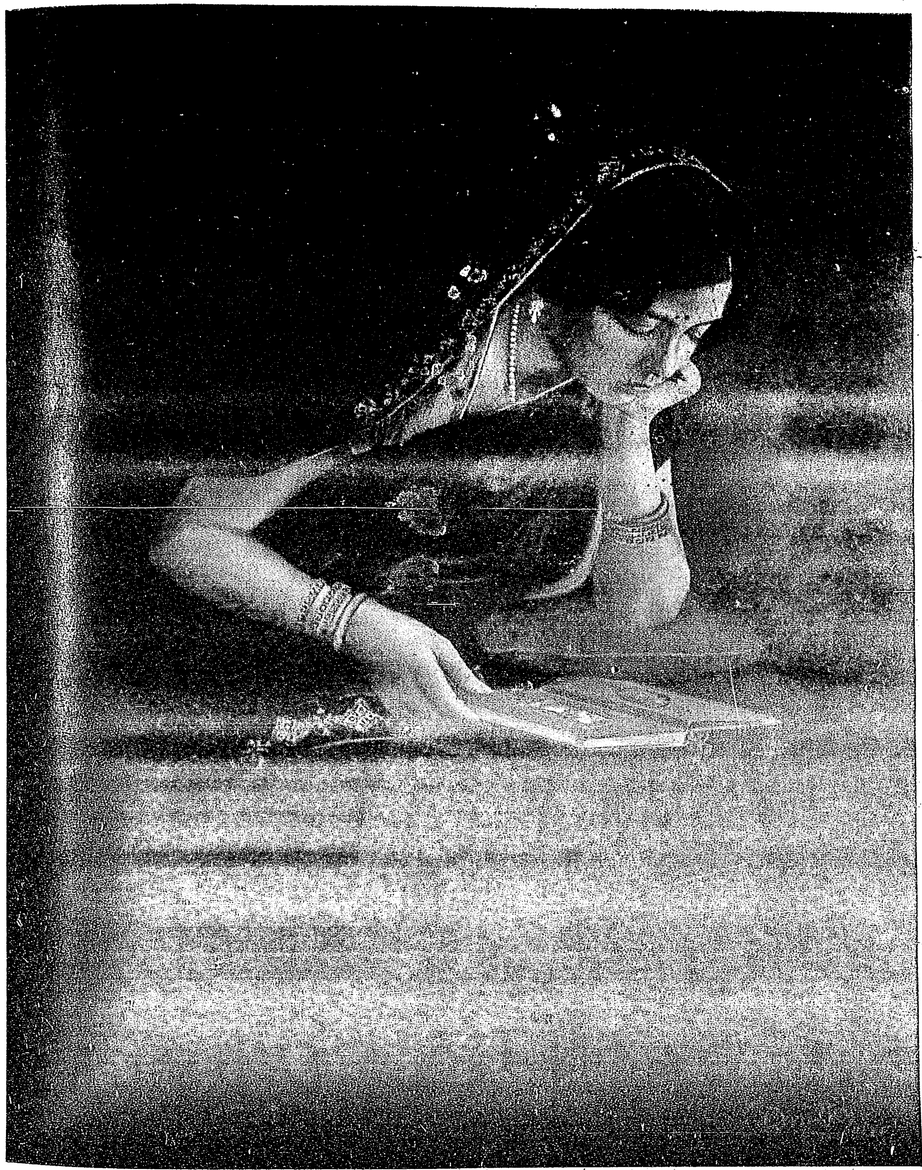

তন্ময়

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দে

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৮

পাটনা সহর হইতে অনেক দূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া অসিত পূর্ব্বাকাশে নবীন সূর্য্যের উদয়ের শোভা দেখিতেছিল। দুই দিকে সুদূর-বিস্তৃত আমবাগান, মধ্যে অপ্রশস্ত রাজপথ। বহুদূর পর্য্যন্ত লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। মাঝে মাঝে দুই একখানা ভগ্ন অযত্ন-পতিত বাসগৃহ জীর্ণ অবস্থায় কোনমতে দাঁড়াইয়া সুদূর অতীতে এ স্থানে মানুষের বসতির সাক্ষ্য দিতেছিল। উষার মৃদুরঞ্জিত অরুণ আলোর রেখা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট আঁধার অরণ্যানীর মাথায় মাথায় জাগিয়া উঠিতেছিল। সদ্য-জাগ্রত বিহগকুলের আনন্দ-কলরবে চারিদিক তখন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

অসিতের বয়স ২৬।২৭, দীর্ঘ সুগঠিত অঙ্গসৌষ্ঠব, মুখশ্রী গম্ভীর, গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি,—সহসা তাহাকে দেখিলেই দর্শকের মনে একটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের ভাব উদয় হয়।

অসিত অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতর ফিরিয়া আসিল। ষ্টোভে চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া সে একখানা বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে, সেই সময় নিঃশব্দে আর একটি যুবক তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়াই অসিতের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বই ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ব্যগ্র ভাবে বলিল, এই যে পরেশ! এত দেরি হলো তোমার? কাল থেকে তোমার অপেক্ষায় আমি এই জঙ্গলে বসে আছি। তার পর, খবর কি সব? ওদিককার কাজ সব ঠিক হয়ে গেল?

পরেশ চুপ করিয়া মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ শুষ্ক, দেহ ঘর্ম্মাক্ত। অত্যন্ত শ্রান্ত ভাবে সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছিল।

অসিতের প্রশ্নের প্রতি সে কোন মনোযোগ না দিয়া বলিল, এক কাপ্ চা আগে চট্ করে এগিয়ে দাও ত দাদা! তার পরে সব কথা-বার্ত্তা হবে 'খন! উঃ! সারা রাত্তির ধরে ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসতে হয়েছে! দম্ বেরিয়ে গেছে একেবারে!

অসিত আর কিছু না বলিয়া চায়ের কেটলিতে চা ভিজাইতে দিল। তার পর ষ্টোভে দুধ চড়াইয়া কুলুঙ্গী হইতে একটা বিস্কুটের টিন পাড়িয়া আনিয়া পরেশের সামনে রাখিল।

"বাঃ! এ যে একবারে রাজভোগ! এ জঙ্গলের মধ্যে এটা কোথায় পেলে?" লুব্ধ দৃষ্টিতে পরেশ টিনটার দিকে চাহিল।

—"কাল এখানে আসবার সময় সহর থেকে নিয়ে এসেছিলুম। আর কিছু হোক্ বা নাই হোক্, চায়ের যোগাড়টা ত ভাল করে রাখতে হবে?" অসিত এক পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া পরেশকে আগাইয়া দিল। তার পর নিজের পেয়ালায় চা ঢালিয়া লইয়া বলিল, এইবার বল দেখি তোমার খবরটা কি? কাল এলে না যে? কোথায় ছিলে?

পরেশ চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত চক্ষু মুদিয়া বলিল, হচ্ছে! হচ্ছে! ক্রমশ সব রহস্যই প্রকাশ করা যাবে। একটু জুত করে চা'টা এখন খেতে দাও বাবা! সারা রাত্তিরের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর এ জিনিসটা যে কি 'অমৃতোপম' লাগছে, তা তোমার মত কাঠগোঁয়ার বুঝবে কোথা থেকে? সত্যি! আমার মনে হচ্ছে, চায়ের উপরে আমি একটা কবিতা লিখে ফেলি!

অসিত একটু হাসিয়া বলিল সাধু সংকল্প! তবে সেটা একটু শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ করে ফেলো,—নয় ত ভাব জুড়িয়ে যেতে পারে! কিন্তু তুমি রাত-ভোর বন-বাদাড় ভেঙ্গে আসতে গেলে কেন? কেউ কিছু সন্দেহ করেছে না কি?

—"শুধু সন্দেহ? একেবারে পিছু পিছু ধাওয়া! কাল বিকেলে ষ্টেশন থেকে যেমন বেরিয়েছি, তখন থেকেই

মনে হল, একটা লোক আমার উপর লক্ষ্য রাখছে। ভাল করে সেটা জানবার জন্যে আমি হন্ হন্ করে এগিয়ে খানিকটা দূর চলে গেলুম। অনেকক্ষণ পরে পিছনে চেয়ে দেখি, অন্ধ ফুটপাত ধরে সেও সঙ্গে সঙ্গে আসছে। একটা গলির ভিতর ঢুকে তখন একটা দোকানে ঢুকে পড়লুম। প্রায় এক ঘণ্টা সেখানে বসে বসে কাটিয়ে দিয়ে, প্রায় সন্ধ্যার সময় উঠে গলি থেকে বেরিয়ে দেখি, সে লোকটা একটা আলোর পোষ্টের কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। তার হাত এড়াবার উপায় ভাবতে ভাবতে কতক দূরে এসে দেখি, একটা জায়গায় খুব সোরগোল হচ্ছে,—একটা ছোকরা মেয়েদের মত সাজগোজ করে মিহি সুরে গান ধরে ঘুরে ঘুরে নাচছে, আর দুজন লোক তার গানের সঙ্গে মাথা নেড়ে, নানা অঙ্গভঙ্গী করে, হেলে দুলে সারেঙ্গী আর তবলা বাজাচ্ছে। রাস্তার লোকে হাঁ করে সেই অদ্ভুত তামাসা দেখছে। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। তার পর সময় বুঝে অন্ধকারের মধ্যে এক দিক থেকে বেরিয়ে গিয়ে চলতে লাগলুম। রাত্রে এক চাষীর দাওয়ায় আশ্রয় নিয়ে ঘণ্টা দুই তিন কাটিয়েছি। তার পর রাত থাকতে উঠে এই ক্ষেত-খামার, বাগান-টাগানের ভিতর দিয়ে চলে আসছি। সোজা পথে গেলুম না,—কে আবার কোথায় ওৎ পেতে বসে আছে, কাজ কি?"

অসিত বলিল, সে ভালই করেছ। এখানে যে ক'দিন থাকতে হবে, তত দিন এ আস্তানার সন্ধান কেউ না পেলেই ভালো। তার পর, ওদিকে সব কি হলো?

পরেশ তার চায়ের পেয়ালা আগাইয়া দিয়া বলিল, সে সব ভেস্তে গেছে! কিন্তু তুমি এখন আর এক কাপ দাও অসিত-দা—এক বাটিতে হলো না কিছু। তার পর সে দুইখানা বিস্কুট মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, খবর অনেক আছে। তোমার কাছে সব কথা বলবার জন্যেই ত তারা আমায় তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরিয়ে দিলে। কিন্তু ওদিককার যা কিছু এত দিনের কাজ, যা কিছু আয়োজন, সব পণ্ড হয়ে গেল,—এইটেই বড় আপ-শোষের কথা!

অসিত চা ঢালিয়া দিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পরেশও তাহার ভাব দেখিয়া, আর কিছু না বলিয়া, নীরবে চা খাইতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে অসিত বলিল, যাক্, দু' এক দিনের সামান্য চেষ্টায় কোন মহৎ কাজ হয় না। বারবার ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই আমরা সফল হব। এতে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। এখন বল, তারা কি বলতে তোমায় পাঠিয়েছে।

তাহারা দুইজনে নিম্নস্বরে কথা বলিতে লাগিল ও ক্রমশঃ সেই আলাপের মধ্যে এমন মগ্ন হইয়া গেল যে, আর কোন কিছু মনে রহিল না। বেলা বাড়িয়া চলিল, তাহাদের সম্মুখে অভুক্ত খাদ্য পড়িয়া রহিল, চা জুড়াইয়া জল হইয়া গেল,—তাহারা তাহা জানিতেও পারিল না।

অকস্মাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে ও নারী-কণ্ঠ-নিঃসৃত আর্ত্তনাদে সেই নির্জ্জন স্থান মুখর হইয়া উঠিল। অসিত ও পরেশ চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহারা দুইজনেই বারাণ্ডায় গিয়া দেখিল, একখানা প্রকাণ্ড মোটরের টায়ার ফাটিয়া, সেখানা রাস্তার ধারের একটা গাছে ধাক্কা লাগিয়া কাৎ হইয়া পড়িয়াছে; এবং একটি যুবক ভিতরের আরোহীদের বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে।

পরেশ একবার অসিতের মুখের দিকে চাহিল। অসিত বলিল, চল, এখানেই তুলে আনতে হবে।

দুইজনে চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া নামিয়া গেল। যুবকের সাহায্যে তাহারা গাড়ীর ভিতর হইতে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও একটি মহিলাকে নামাইয়া পথের উপর দাঁড় করাইল।

মহিলাটির হাত কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। বৃদ্ধ সে দিকে চাহিয়াই ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, উঃ! নির্ম্মলার হাতে বড় চোট লেগেছে কিরণ! ভয়ানক রক্ত পড়ছে যে! কি করা যায়?

কিরণ তখন একটু আশ্রয়ের জন্য চারিদিকে দেখিতেছিল। অসিতকে দেখিয়া বলিল, মশায়! এখানে কাছা-কাছি কোথাও বসবার মত জায়গা আছে কি?

অসিত তাহাদের ভাঙ্গা বাড়ীখানা দেখাইয়া দিয়া বলিল, সামনে এইটে ছাড়া আর কোথাও স্থান নেই। ওটাকে যদিও ঠিক বাড়ী বলা যায় না, তবু··

"যথেষ্ট! যথেষ্ট! এঁকে একটু বসাবার মত জায়গা পেলেই বাঁচা যায়। এস নির্ম্মলা!" বলিয়া কিরণ নির্ম্মলার হাত ধরিল।

অসিত সকলকে লইয়া উপরে আসিল। পরেশ মিঃ ঘোষকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনার কোথাও লাগে নি ত?

"আমার? নাঃ, আমার বিশেষ কিছু হয় নি। কিন্তু নির্ম্মলা—ওঃ! ওর বড় কষ্ট হচ্ছে! এখানে কোন ডাক্তার কাছাকাছির মধ্যে পাওয়া যাবে কি?"

অসিত একবার নির্ম্মলার বিবর্ণ যন্ত্রণা-কাতর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, বলিল, এখানে চার পাঁচ ক্রোশের ভিতর ডাক্তার ওষুধ কিছুই পাওয়া যাবে না। বলেন ত আমি ওঁর হাতের রক্তটা ধুয়ে একটা ব্যাণ্ডেজ করে দিতে পারি,—তাতে কতকটা আরাম পেতে পারেন।

কিরণ বলিল, উপস্থিত তাহলে ওঁর হাতটা আপনি ব্যাণ্ডেজ করেই দিন,—আমি একটু এগিয়ে একখানা গাড়ী বা ট্যাক্সির সন্ধান করি গে। সহরে না পৌঁছতে পারলে ত কোন ব্যবস্থাই করতে পারা যাবে না!

"তাই যাও, তাহলে যেমন করে হোক এখন বাড়ী পৌঁছতেই হবে।" মিঃ ঘোষ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইতেই অসিত বলিল, আপনি উঠছেন কেন? গাড়ী আনাবার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি,—আপনি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন। যে স্থানে এসে পড়েছেন, এখানে আপনাদের সাহায্যের জন্যে আর কিছুই করা যায় না। পরেশ, দেখ ত উঠে একবার,—গাড়ী বা ট্যাক্সি যা সামনে পাবে, একখানা এঁদের জন্যে নিয়ে এস।

পরেশ নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল। অসিত দড়ীর উপর হইতে একখানা পরিষ্কার চাদর টানিয়া লইয়া লম্বালম্বি ভাবে ছিঁড়িয়া ব্যাণ্ডেজের মত পাকাইয়া লইল—পরে পরিষ্কার জলে নির্ম্মলার আহত স্থান ধোয়াইয়া ক্ষিপ্র নিপুণ হস্তে হাতটি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল।

এই অপরিচিত যুবকের করস্পর্শে নির্ম্মলার ক্লিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ মুখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হাত বাঁধা হইবার পর সে অনেকটা সুস্থ বোধ করিল—ও তাহার স্নিগ্ধ কৃতজ্ঞ দৃষ্টি অসিতের মুখের দিকে তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, হাতটা এখন অনেক ভাল মনে হচ্ছে। এতক্ষণ হাতের ভিতর যা কন্‌কন্ করছিল।

অসিত মুখে কিছু না বলিলেও, তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কিরণ সকৌতুকে বলিয়া উঠিল, মশায় কি মেডিকেল কলেজের ষ্টুডেণ্ট? না—রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কোন সেবক?

অসিত সহসা তাহার সম্বন্ধে এই কৌতুকপ্রদ প্রশ্নে হাসিয়া বলিল, কেন বলুন ত? হঠাৎ আমার সম্বন্ধে আপনার এরূপ ধারণা হলো যে?

—"আপনি যে রকম সুন্দর ব্যাণ্ডেজ করে ফেল্লেন, তাই দেখে আমার মনে হচ্ছে, এ ত অজ্ঞ লোকের হাতের কাজ নয়,—পাকা হাত না হলে এ রকম দক্ষতা দেখা যায় না—তাই আমার অনুমান..."

অসিত বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল, আপনার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির প্রশংসা করলেও, আপনার অনুমান এ ক্ষেত্রে একেবারেই ভুল,—আমি ও দুটি পর্য্যায়ের কোনটির মধ্যেই নয়। তবে এ সব কাজ আমাদের কতকটা শিখতে হয়েছে বটে,—কত সময় কত দরকারে লাগে।

কিরণ এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া গৃহের সজ্জা দেখিতেছিল। একধারে দড়ির উপর খান-দুই পরিধেয় বস্ত্র, ঘরের একটি কোণে ষ্টোভ, তার অন্য পাশে চায়ের সরঞ্জাম ছড়ানো, সকালের অভুক্ত চা ও বিস্কুট তখনো সেখানে পড়িয়া ছিল। একটা কুলুঙ্গীর উপর একটা ছোট অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি ও একখানা থালা ও খানকতক বই তোলা ছিল। গৃহের মধ্যে একমাত্র শয্যা—একখানা মাদুর, তার উপর মিঃ ঘোষ ও নির্ম্মলা বসিয়া ছিলেন।

সে বলিল, তবেই হল। আমার অনুমান একেবারে ভুল বলতে পারেন না আপনি। আমি বলেছি—শিক্ষিত হাত ছাড়া এমন কাজ হয় না,—এবং সাধারণতঃ যে শ্রেণীর লোকে এ সব শিক্ষা করে থাকেন, তাঁদের কথাই মনে হয়েছিল। আপনি সে শ্রেণীর যদি নাও হন, তবু এসব শিক্ষা করতে হয়েছে ত?

"তা অবশ্য বলতে পারেন" বলিয়া অসিত একান্ত করুণার্দ্র নেত্রে মাদুরের উপর শায়িত নির্ম্মলার ক্লান্ত করুণ মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

নির্ম্মলা অবসন্ন শরীরে মাটিতে মাদুরের উপর লুটাইয়া এলাইয়া পড়িয়াছিল। তার চক্ষু মুদ্রিত, গাঢ় কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ

নিটোল শুভ্র পুরন্ত গণ্ডের উপর বিশ্রাম করিতেছিল। মিঃ ঘোষ উদ্বিগ্ন চিত্তে গাড়ীর আশায় কন্যার মাথার কাছে নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া ছিলেন।

কিরণ বলিল, আর একটা কথা,—আমরা না হয় এখানে একটা দৈব দুর্ঘটনায় এসে পড়েছি,—কিন্তু আপনারা দুজনে এখানে কোথা হতে এসে পড়লেন? এটা ত মানুষের বসতির স্থান বলে মনে হচ্ছে না! দু' চার ক্রোশের মধ্যে ত জন-মানবের কোন চিহ্ন নেই দেখছি!

অসিত বলিল, তা নেই সত্যি! তবে আমরা এখানে মাঝে মাঝে এসে থাকি। এটা আমাদের একটা ছোট খাট আস্তানা।

"এখানে থাকেন? সত্যি না কি?" কিরণ এবার সবিস্ময়ে অসিতের মুখের দিকে চাহিল। সে মনে মনে একটা কিছু ভাবিতেছে বুঝিয়া অসিত হাসিয়া বলিল, এবারও আমার সম্বন্ধে একটা কিছু অনুমান করছেন না কি?

কিরণ এবার গম্ভীর ভাবে বলিল, এ ক্ষেত্রে অনুমানটা ঠিক প্রয়োগ করতে পারছি না। কারণ, স্থানটি এমন কিছু লোভনীয় নয়, যার জন্যে স্বেচ্ছায় মানুষ এখানে এসে বাস করতে পারে। তবে এক যদি কেউ যোগ-সাধনা করতে চায়—

অসিত বাধা দিয়া সপরিহাসে বলিল, ঠিক ধরেছেন এবার! জানেন ত, নির্জ্জনে না হলে যোগ সাধনা হয় না?

কিরণ উঠিয়া অত্যন্ত সন্দিগ্ধভাবে বলিল, এগুলো তবে যোগের বই বুঝি? সে একখানা বই খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে দুই এক পাতা পড়িয়া সেখানা রাখিয়া অন্য বইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তার পর একবার অসিতের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া অসিতও আর কোন কথা বলিল না। কিছুক্ষণ পরে কিরণ মিঃ ঘোষকে বলিল, আপনারা বসুন, আমি একবার আমাদের গাড়ীখানার অবস্থা কি রকম—ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে আসি। ওটা আবার নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে ত?

মিঃ ঘোষ এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। কিরণ চলিয়া গেলে তিনি অসিতকে বলিলেন, সত্যই কি আপনারা এই জঙ্গলের ভিতর থাকেন? আমি আরো কয়েকবার এই পথে যাতায়াত করেছি। এ ভাঙ্গা বাড়ীটার প্রতি অবশ্য কোন দিন লক্ষ্য করি নি। কিন্তু এদিকে কখনো কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়েছে বলে ত মনে হচ্ছে না।

অসিত বলিল, আমরা ত সর্ব্বদা এখানে থাকি না, কখন কখন আসি, হয় ত দু এক দিন থাকি, আবার চলে যাই। যে সময়টায় থাকি—তাও প্রায় বাড়ীর ভিতরেই পড়া শুনা নিয়ে থাকি, পথে বেরোবার কোন দরকারই হয় না। তাতেই আমাদের সঙ্গে কারো দেখা হওয়া সম্ভব নয়।

নির্ম্মলা এসব কথা শুনিয়া, এতক্ষণ সবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিয়া গৃহের অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিতেছিল। সে বলিল, এই রকম জায়গায়—এত নির্জ্জনে একলা থাকতে আপনাদের কোন কষ্ট হয় না? কি করে থাকেন? খাওয়া দাওয়ারই বা কি ব্যবস্থা করেন?

অসিত হাসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। বলিল, কষ্ট কিসের বলুন? আমরা জীবন থেকে সব রকম বাহুল্য বর্জ্জন করে চলতে অভ্যস্ত হয়েছি। তাই আর কোন কষ্টই আমাদের কষ্ট বলে মনে হয় না। অভাব, দুঃখ, কষ্ট এসব অনেকটা আমরা নিজেরা তৈরি করেছি—তারি ফলে কষ্ট পাই। যথার্থ অভাব আমাদের খুবই কম।

মিঃ ঘোষ এ কথা শুনিয়া সহসা অত্যন্ত খুসি হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, এই ত যথার্থ জ্ঞানীর মত কথা! উনি ঠিক কথাই বলেছেন নির্ম্মলা! আমাদের চার পাশের যত কিছু দুঃখ, কষ্ট, অভাব—সবই আমরা নিজেরা গড়ে তুলেছি। সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করলে—যেমন সব আগেকার কালে জ্ঞানী লোকেরা থাকতেন, সে ভাবে থাকলে,—অভাব যে কত অল্প, তা এখনকার লোকে ধারণাও করতে পারে না!

নির্ম্মলা নিজেও এ বিষয়ে কিছুই ধারণা করিতে পারে নাই। তাহার মনে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকমালা-সজ্জিত, মূল্যবান গৃহসজ্জায় শোভিত, সুখময় রম্য গৃহের চিত্র ভাসিয়া উঠিল। বন্ধু-বান্ধবের প্রীতি-প্রফুল্ল সম্ভাষণ, সেবাতৎপর সুদক্ষ দাস-দাসী-পূর্ণ, নিশ্চিন্ত আরামে পূর্ণ

গৃহ ছাড়িয়া—এই গভীর জনমানবশূন্য জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙ্গা ঘরে মাটির উপর একা পড়িয়া থাকা কেমন করিয়া সুখকর হইতে পারে, সে তাহা বুঝিল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া অসিত নিজেই আবার বলিল, আর খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন? তা আর এমন শক্ত কি! ঐ হাঁড়িটায় কয়েক মুটো চাল, গোটা কতক আলু দিয়ে সিদ্ধ করে, বা চাল আর ডাল এক সঙ্গে সিদ্ধ করে নিতে পারলেই, খাওয়ার প্রয়োজন মিটে যায়। স্টোভে হাঁড়িটা চড়িয়ে দিয়ে সামনে বসে বই পড়তে পড়তে সে কাজ আধঘণ্টার মধ্যে হয়ে যায়। শোবার জন্যে এই মাদুরই আমাদের যথেষ্ট। তবে আর কষ্ট কি?

অসিত হাসিয়া এ কথা বলিলেও, নির্ম্মলা মনের ভিতর শান্তি পাইল না। তাহার ভিতরকার সেবাপরায়ণ নারী-প্রকৃতি অসিতদের এ অবস্থায় থাকা সুখকর বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না। কিন্তু এই অত্যল্প কালের পরিচয়ে আর কিছু বলা যায় না; কাজেই সে চুপ করিয়া গেল।

অসিত তাহার মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিল। এই নীরব সহানুভূতিতে তাহার স্বভাবতঃ সর্ব্ব-বিষয়ে-উদাসীন কঠোর চিত্তও কেন যে একটা মধুর আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল, সে তাহা নিজেই বুঝিল না। সে কতকটা আত্মবিস্মৃত ভাবে বলিল, তবে আপনার আজ অত্যন্ত কষ্ট হল! আপনাদের ত এ রকম ভাবে থাকা অভ্যাস নেই কখনো! এই অসুস্থ শরীরে একটু শান্তি পেলেন না।

নির্ম্মলা এ কথায় হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, না! না! সে জন্যে আপনি ভাববেন না কিছু! আমার এমন বিশেষ কিছু কষ্ট হয়নি।

মিঃ ঘোষ বলিলেন, আপনাদের সঙ্গে একটা দুর্ঘিপাকের মধ্যে পড়ে পরিচয় হয়ে গেল। এই সঙ্কটের সময় যেমন আপনাদের কাছে উপকার পেয়েছি, তেমনি এই পরিচয় হওয়ায় অত্যন্ত সুখী হলুম। আশা করি, আমাদের এ বন্ধুত্বের এখানেই শেষ হবে না। মধ্যে মধ্যে আপনাদের সাক্ষাৎ পেলে আমরা সকলেই বড় সুখী হবো।

অসিত এ কথার কোন উত্তর না দিয়া নীরবে রহিল। মিঃ ঘোষ সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া বলিতে লাগিলেন, এখান থেকে আর খানিক দূরে আমি একটা বাগানবাড়ী কিনেছি। নির্ম্মলার বন্ধু-বান্ধবেরা সেখানে এক দিন সবাই পিকনিক করবে বলে ধরেছে। বাড়ীটা এখনো ভাল করে গোছান হয় নি। তাই আমরা আজ সকালে কতকটা গুছিয়ে নেবার জন্যে যাচ্ছিলুম। তা এখন ত কিছু দিনের মত সে সব বন্ধ হয়ে গেল,—নির্ম্মলা ভাল হোক আগে! তার পর আবার সব ব্যবস্থা করা যাবে। ভাল কথা, আপনারা যখন এখানে না থাকেন, তখন আর কোথায় আপনাদের পাওয়া যাবে?

অসিত কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কিরণ উপরে আসিয়া বলিল, পরেশবাবু গাড়ী নিয়ে এসেছেন নির্ম্মলা! কেমন আছ এখন? আপনি নীচে যেতে পারবে ত?

মিঃ ঘোষ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতের উপর ভর রাখিয়া নির্ম্মলা ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল, তা পারবো বোধ হয়। মিঃ ঘোষ তাহাকে লইয়া সিঁড়ীর দিকে অগ্রসর হইলে, কিরণ অসিতের প্রতি চাহিয়া বলিল, আজ অকস্মাৎ আমরা বাড়ী চড়াও হয়ে এসে বেশ কিছুক্ষণের জন্যে আপনাদের নির্জ্জন শান্তি ভঙ্গ করলুম! কিন্তু আপনারা ছিলেন বলে আজ এ বিপদের সময়ে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গেল। না হলে বড় মুস্কিলেই পড়তে হত। যা-হোক, এখন থেকে তা হলে মাঝে মাঝে আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হবে ত?

অসিত একটু ভাবিয়া বলিল, সেই কথাটাই ঠিক করে বলা শক্ত। পরিচয় যখন আপনাদের সঙ্গে হলো—তখন মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আমরা খুব খুসী হতুম। তবে কাজের গতিকে আমরা কখন যে কোথায় থাকি, তা আমরা নিজেরাই সব সময় ঠিক জানি না, সেই জন্যে কোন কথা দিতে সাহস হয় না।

কিরণ বলিল, তা বলে আমরা আপনাদের ছাড়ছি না মশায়! আপনারা সহরে যদি আমাদের ওখানে যান—সে ত খুব আনন্দের বিষয়। না হলে, আমিই এখানে এসে আজকার মত চড়াও হতে কিছুমাত্র দ্বিধা করবো না—জানবেন।

অসিত হাসিয়া বলিল, কিন্তু তাতে ত কোন ফল হবে না। হয় ত আমরা এখানে আর নাও আসতে পারি!

দুইজনে কথা কহিতে কহিতে নীচে নামিয়া দেখিল—

মিঃ ঘোষ নির্ম্মলাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তাহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন।

পরেশ দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। কিরণ তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে গেলে, নির্ম্মলা অসিতকে নমস্কার করিয়া বলিল, তা হলে সুবিধা মত এক দিন আমাদের ওখানে যাচ্ছেন ত?

অসিত হাসিমুখে যুক্ত-করে তাহাকে নমস্কার করিতেই, মিঃ ঘোষ বলিয়া উঠিলেন, যাবেন বৈ কি! নিশ্চয়ই যাবেন! এমনিতে ত যেতেই হবে, তোমার 'পিকনিকের' দিনও আমাদের এই নতুন বন্ধুদের ছাড়া হবে না—কি বল নির্ম্মলা? বলিয়া নিজের কথায় নিজেই প্রচুর হাস্য করিয়া অসিতকে বলিলেন, সহরে যাকে বলবেন—সেই আমার বাড়ী দেখিয়ে দেবে। নিবাস যদিও আমার অনেক দূরে, রাজসাহী জেলায়, তবু এখানে অনেক দিনের বাস কি না, বহুকাল এখানেই কেটে গেছে, সকলেই জানে। আমার নাম গিরীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। আপনার নামটি কি?

অকস্মাৎ অসিত দুই পা পিছু হটিয়া গেল। ঘোর উত্তেজনায় তার মুখ রক্তবর্ণ ও দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিল। ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় বিকৃত সে মুখ দেখিয়া, মিঃ ঘোষ স্তম্ভিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অসিত সগর্জ্জনে বলিল, আপনিই রাজসাহীর মণ্ডলগড়ের জমীদার গিরীন্দ্র ঘোষ? আমি সেখানকার রাসগোবিন্দ দত্তের পুত্র, আমার নাম—অসিতকুমার দত্ত!

মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত মিঃ ঘোষের উন্নত মস্তক তাঁহার বক্ষের উপর ঝুলিয়া পড়িল। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে তিনি বলিলেন, তুমি অসিত? তুমি অসিত? ওঃ! এত দিন পরে!

(ক্রমশঃ)

মহম্মদপুর

শ্রীসৃজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

(আলোক-চিত্র—শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মণ, এম-আর-এ-এস মহাশয়ের সৌজন্যে)

(১)

বহু দিনের বাসনা ছিল রাজা সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর দেখিব। কিন্তু ঐ অঞ্চলে পরিচিত কেহ না থাকায় অবশেষে মহম্মদপুরের পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলাম। তিনি সেই পত্র নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের মহম্মদপুরের নায়েব মহাশয়কে দেন। নায়েব মহাশয় ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত। তিনি তৎক্ষণাৎ মহম্মদপুর দেখিতে যাইবার জন্য সাদরে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করেন।

পূজনীয় ললিত দাদা, শ্রীমান অরীণ ভায়া ও একটি লোক সহ ২৩ শে ডিসেম্বর রাত্রি ৯—২৪ মিনিটের খুলনা-গামী ট্রেণে শিয়ালদহ ষ্টেসন হইতে যাত্রা করিলাম। মহম্মদপুরে ষ্টীমার ষ্টেসন থাকিলেও, কলিকাতায় উহার টিকিট পাওয়া দুষ্কর দেখিয়া, উহার পরের ষ্টেসন বোয়ালমারীর টিকিট লইয়াছিলাম। বড়দিনের বন্ধ উপলক্ষে ট্রেণে অত্যন্ত ভীড় ছিল। ভোর ৪॥০ টার সময় ট্রেণ খুলনা পৌঁছিল। চালান যাইবার জন্য সেখানে নদীর ধারে ঝুড়ি ও বাক্স-বন্দী হইয়া যে মৎস্য ছিল, তাহার দুর্গন্ধ বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছিল। খুলনা ভৈরব নদের উপরে অবস্থিত। নদের ধারে সাতটি ঘাটে সারি সারি ষ্টীমার দাঁড়াইয়া আছে। আমরা নং ৪ ঘাটে খুলনা—গোপালগঞ্জ—মাদারি-পুর লাইনের ষ্টীমারে অতি কষ্টে একটু স্থান সংগ্রহ করিলাম।

২৪ শে ডিসেম্বর প্রাতে প্রায় ৬॥০ টার সময় ষ্টীমার ছাড়িল। দেখিলাম, ভৈরবের জলে অসংখ্য কচুরী পানার বৃহৎ দাম ভাসিতেছে ও জল অপরিষ্কার করিয়াছে। ভৈরবের উভয় তীরে প্রচুর নারিকেল, সুপারী, তাল ও খেজুরের গাছ আছে। কিয়ৎদূর অতিক্রম করিলে দেখা গেল যে, নদের দুই পার্শ্ব হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও খাল বাহির হইয়াছে; দুই দিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে।

কদাচিৎ কোথাও দুই একটি গ্রাম আছে। ক্রমে আমরা কালীগঙ্গা নদী বাহিয়া চলিলাম। আমাদের ষ্টীমার সর্ব্ব-প্রথম কালিয়ার ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। কালিয়া এই অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য প্রভৃতির বাস আছে। ইহার বহুক্ষণ পরে বেলা প্রায় ১২ টার সময় টোনা ঘাটে যাইতে দেখিলাম যে, দক্ষিণ দিকে নবগঙ্গা নদী বাহির হইয়া গিয়াছে।

ষ্টীমার ২॥০ ঘণ্টা লেট থাকায়, আমরা গোপালগঞ্জের ঘাটে যথাসময়ে বোয়ালমারীগামী ষ্টীমার ধরিতে পারিব কি না, ইহা ষ্টীমারের সারেঙ্গকে জিজ্ঞাসা করায়, সে ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করিল। জনৈক যাত্রী আমাদিগকে পরামর্শ দিলেন যে, টোনা ঘাটে অবতরণ করিয়া যদি হাঁটা পথে, বা হালিফাক্স খাল দিয়া নৌকাযোগে আমরা অদূরবর্ত্তী মঙ্গলপুর ঘাটে গমন করি, তাহা হইলে যথেষ্ট সময় থাকিবে; এমন কি স্নপাকে আহারাদি করিয়াও মঙ্গলপুর ঘাটে বোয়ালমারীগামী ষ্টীমার ধরিতে পারিব। অগত্যা দুই প্রহরের সময় টোনাঘাটে অবতরণ করিয়া স্নান আহার সারিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া হালিফাক্স খালের মধ্য দিয়া মঙ্গলপুর ঘাট উদ্দেশে চলিলাম। এই খাল নবগঙ্গা ও মধুমতী নদীদ্বয়কে সংযুক্ত করিতেছে। বেলা অনুমান ২॥০ টার সময় আমরা মঙ্গলপুর ঘাটের কুঁড়ে-ঘর-সম্বল ষ্টেসনের সম্মুখে অবতরণ করিয়া বোয়ালমারীগামী ষ্টীমারের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অনুমান ৪॥০ টার সময় উক্ত ষ্টীমারে স্থান সংগ্রহ করিয়া মহম্মদপুর অভিমুখে চলিলাম। এইবার আমরা মধুমতী নদী দিয়া যাইতেছি।

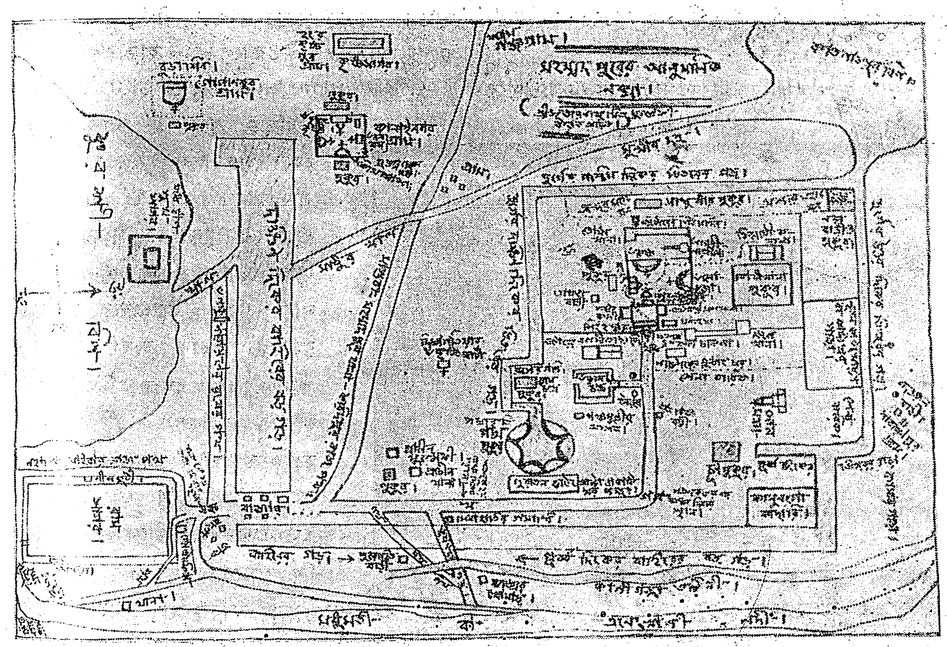

মহম্মদপুরের আনুমানিক নক্সা

ভাবিলাম, এইবার হাত পা ছড়াইয়া বসিতে পারিব। কিন্তু এ যাত্রায় তাহা হইবার নহে। আমাদের শয্যার পার্শ্বে অপর একটি শয্যায় একটি ভদ্র মুসলমান তাঁহার বালক পুত্র সহ বসিয়া ছিলেন। সন্ধ্যার পরে বালকটি ২।৪ বার "বাবা বাবা" বলিয়া ডাকিয়াই, সহসা মুখ-বিবর সাহায্যে সশব্দে এমন একটি বিশ্রী প্রক্রিয়া করিয়া বসিল, যাহার জন্য আমাদিগকে বাকী রাত্রি বিছানা গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইল। তাহার পিতা রাগিয়া বলিতে লাগিলেন, "যখনই

বাবা বলিয়াছিস, তখনই বুঝিয়াছি, এইরূপ একটা কিছু করিয়া বসিবি।”

সার্চ্চলাইট ফেলিয়া পথ দেখিতে দেখিতে আমাদের ষ্টীমার রাত্রি অনুমান ১২॥০ টার সময় মহম্মদপুর ঘাটে লাগিল। এখানে ঘাট বলিয়া কিছু নাই,—অত্যুচ্চ পাড়ের এক স্থানে কোন প্রকারে সিঁড়ি লাগাইয়া দিল। আমরা মহম্মদপুরের ভূমিতে পদার্পণ করিয়া ধন্য হইলাম। নদীর অপর পারে বহু দূরে ভূষণা। অপর পারে অবস্থিত হইলেও এককালে মহম্মদপুর ভূষণার প্রধান সহর ছিল। এক্ষণে মহম্মদপুর যশোর জেলার অন্তর্গত ও ভূষণা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে।

নাটোর-রাজের মহম্মদপুরের নায়েব মহাশয়ের ব্যবস্থানুসারে

মহম্মদপুরের পথে—নদীর ধারের গ্রামের দৃশ্য

আমাদের জন্য ষ্টীমার-ঘাটে লোক ছিল। ষ্টীমার-ঘাট হইতে সীতারামের দুর্গাভ্যন্তরস্থ নাটোর রাজ-কাছারী প্রায় ১॥০ মাইল দূর হইবে। একে কৃষ্ণ পক্ষের গভীর রজনী, তায় বন্য বরাহ ও ব্যাঘ্র-সঙ্কুল অরণ্য মধ্যস্থ পথ। কোন প্রকারে পথ অতিক্রম করিয়া কাছারিতে উপস্থিত হইলাম। রাণী ভবানীর স্থাপিত ৺রামচন্দ্র বিগ্রহের ঠাকুরবাটীর একটি দালানে এই কাছারি অবস্থিত। আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে রাত্রি ১॥০টা বাজিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া সীতারামের কীর্ত্তিসমূহ দেখিতে চলিলাম। আমরা কোথা হইতে কোথায় গেলাম, তাহা, এই সঙ্গে যে নক্সা দেওয়া হইল, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। মধুমতী নদীর তীর হইতে আসিয়া, সীতারামের গড়-বেষ্টিত দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে দুর্গ-পরিখার বাহিরে সীতারামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি রামসাগর নামক দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকে কহিল যে, ইহার মাপ ১৭৬৫×৮৫ হাত। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, ইহার মাপ অনুমান ১০০০×৪০০ হাত। এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার “যশোহর-খুলনার ইতিহাসে” ইহার মাপ লিখিয়াছেন ১৬০০×৬০০ হাত। দীঘিটি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ; ইহার জল স্বচ্ছ ও সুপেয়। ইহাতে শীতকালে ৮।১০ হাত জল থাকে।

একটি প্রবাদ আছে যে, যে স্থানে এক্ষণে রামসাগর অবস্থিত, পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটি দরিদ্র বৃদ্ধার গৃহ ছিল। বৃদ্ধার পুত্রের নাম সীতারাম। একদা রাজা সীতারাম যখন ঐ বৃদ্ধার কুটীরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তখন বৃদ্ধা আপন পুত্রের নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছিল। বৃদ্ধাকে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে শুনিয়া, রাজা বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “আমাকে কেন ডাকিতেছ?” বৃদ্ধা রাজাকে বিনীত স্বরে কহিল যে, সে তাহার পুত্রকে ডাকিতেছিল, রাজাকে ডাকে নাই। বৃদ্ধার কি অভাব আছে—রাজা তাহা বার বার জিজ্ঞাসা করায়, বৃদ্ধা কহিল যে, তাহার জন্য একটি কূপ খনন করিয়া দিলে তাহার জলকষ্ট দূর হয়। বৃদ্ধা কূপের জন্য যে স্থান নির্দ্দেশ করিল, তথায় একটী লাউ গাছ ছিল। উহার তলদেশ খনন কালে এক ঘটী টাকা (গুপ্তধন) বাহির হইল। সীতারাম ঐ অর্থ দ্বারা কূপের পরিবর্ত্তে একটি দীঘি খনন করাইবার মানসে, তাঁহার সেনাপতি মেনা হাতীকে যত দূর সাধ্য একটা তীর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। তখন মেনা হাতী —এই দীঘির যেখানে এখন উত্তর সীমা, তথায় দাঁড়াইয়া, দক্ষিণ দিকে যে তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, উহা এক সহস্র গজ দূরে নৈহাটী গ্রামে পতিত হইয়াছিল। তীর

এতদূর যাইবে তাহা সীতারাম আশা করেন নাই। ঐ পর্য্যন্ত দীঘি কাটাইলে বহু ব্রাহ্মণের বাসগৃহ ধ্বংস হয় দেখিয়া, দীঘিটি ছোট করিয়া কাটাইতে বাধ্য হয়েন।

এক্ষণে দীঘির পাড়গুলিতে যে চাষ-আবাদ হইতেছে, তাহাতে বর্ষাকালে ঐ মাটী ধুইয়া দীঘিতে পড়ে। এই কারণে জলাশয়টী শীঘ্র মজিয়া আসিতেছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার ইহার জল পচিয়া অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, সীতারাম এই দীঘি খনন করাইয়া, ইহার জল নির্দ্দোষ ও সুপেয় করিবার জন্য তাল গাছের গুঁড়িতে পারদ পূর্ণ করিয়া ইহার জলে নিমজ্জিত করাইয়াছিলেন। এরূপ জলাশয় যশোহর জেলায় আর একটীও নাই। ইহা এক্ষণে নাটোরের মহারাজার সম্পত্তি। জেলেরা ইহাতে মৎস্যের চাষের জন্য বাৎসরিক ৪৮০৲ টাকা খাজনা দিয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব পাড়ে সান-বাঁধান ঘাট ছিল, এখন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। ইহার উত্তর পাড়ে মহম্মদপুর পোষ্টাফিস অবস্থিত; পূর্ব্ব পাড়ে বৈষ্ণবদের একটী আখড়া আছে, তথায় সীতারাম কর্ত্তৃক স্থাপিত ৺রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি আছেন। পূর্ব্ব পাড়ে এক স্থানে কয়েকটী চালা ঘর আছে। চালগুলি ধনুকের ন্যায় বক্র ও সেকালের বাঙ্গলা ঘরের চালের নিদর্শন। ঘরগুলির মটকা অনুন্নত; দেয়াল বাঁশের ছেঁচা বেড়া দিয়া প্রস্তুত। ছেঁচা বেড়ার উপর কাদার প্রলেপ দেওয়ার প্রথা বা মাটীর দেয়াল এখানে দেখিলাম না।

আমরা রামসাগরের উত্তর পাড়ে অবস্থিত পোষ্টাফিসের নিকট হইতে বাম দিকে বাঁকিয়া পূর্ব্ব পাড় বেষ্টন করিয়া চলিলাম। রামসাগরের পূর্ব্ব ও মধুমতীর উত্তর দিকে সীতারামের “সুমার খোলা” মাঠ আছে—তথায় সীতারামের রাজত্বকালে মজুর প্রভৃতির হাজিরা লওয়া হইত। পূর্ব্ব পাড় ঘুরিয়া দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, মধুমতী নদী পাড় ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে দীঘির এই স্থানের ২৫০ হাতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে মধুমতী ৬ মাইল প্রশস্ত হইবে এবং উহা অত্যন্ত বক্র হইয়া গিয়াছে। তৎপরে আমরা দক্ষিণ পাড়ে উপস্থিত হইলাম। প্রবাদ আছে যে, এই স্থান হইতে আরও কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সীতারামের অন্যতম সেনাপতি মৃন্ময় ক্ষত্রিয় মধুমতীর তীরে কামান পাতিয়া নবাবী সৈন্যের গতিরোধ করিয়াছিলেন। এই দীঘির দক্ষিণ পাড়ের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের পূজা-বাটী, মঠ ও পুকুর ছিল; পুকুরটি ছাড়া আর সকলই মধুমতীর গর্ভে গিয়াছে। তৎপরে আমরা দীঘির দক্ষিণ পাড় ঘুরিয়া পশ্চিম পাড়ে উপস্থিত হইলাম। এই পাড়ে পূর্ব্বকালে কোন সাহেবের নীলকুঠী ছিল, আজিও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। আমরা এক্ষণে পশ্চিম পাড়ের নেহাটা রোড দিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। যে ম্যালেরিয়া জ্বর এক্ষণে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বাসা বাঁধিয়াছে, উহার যে পূর্ব্বাবস্থা মহামারীরূপে গদখালি, উলা প্রভৃতি বহু সমৃদ্ধিশালী জন-পদ ধ্বংস করিয়াছে, সেই মহামারী এই স্থানে সর্ব্ব প্রথমে দেখা দেয়। হাণ্টার

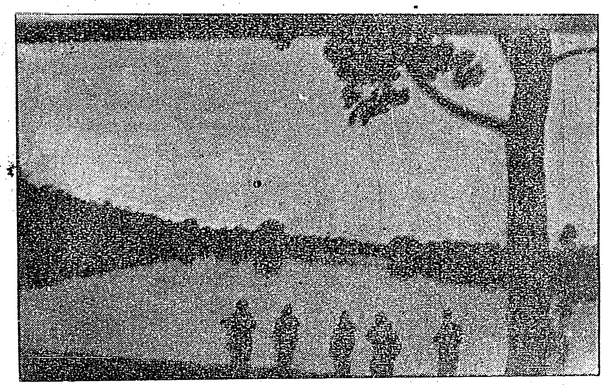

মহম্মদপুর—রামসাগরের উভয় পাড়ের দৃশ্য

সাহেব বলেন যে, ঢাকা—যশোর রোডের যে অংশ এই রামসাগর ও ইহার পশ্চিমে হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের মধ্যে অবস্থিত—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ৫০০।৭০০ জন কয়েদী উহার সংস্কার করিতেছিল। উহাদিগের মধ্যে হঠাৎ জ্বররূপী মহামারী দেখা দিয়া নিমেষমধ্যে ১৫০ জন কয়েদীর প্রাণ সংহার করিলে রক্ষীগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। তৎপরে এই ব্যাধি মহম্মদপুরে ৭ বৎসর থাকিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিল ও ক্রমে যশোর জেলার নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু ডাক্তার এলিয়ট সাহেবের মতে এই ব্যাধি মহম্মদপুরে ১৮২৪।২৫ খৃষ্টাব্দে

প্রথমে দেখা দেয়। এলিয়টের মত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়।

রামসাগরের পশ্চিম পাড় হইতে "সুখ সাগর" দেখিতে পাওয়া গেল। তৎপরে আমরা দীঘির উত্তর পাড়ের মধ্যস্থলে বা পোষ্টাফিসের পশ্চিম দিকে আসিয়া দুর্গে যাইবার পথ ধরিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। পোষ্টাফিসের উত্তরে ও রাস্তার পূর্ব্ব দিকে ডাক বাঙ্গলার ২।৩টি চালাঘর আছে। ডাক বাঙ্গলার ঠিক উত্তর হইতে সীতারামের দুর্গের বাহিরের পরিখা আরম্ভ হইয়াছে।

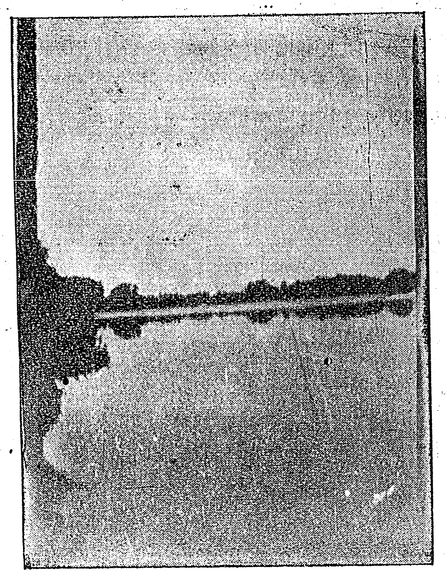

মহম্মদপুর—রামসাগরের দক্ষিণ পাড়ের দৃশ্য

এই স্থানে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রথম বাধা দিবার ব্যবস্থা ছিল। উত্তর দিকে যাইতে আমাদের বামে সীতারামের দুর্গের দক্ষিণ দিকের বাহিরের বড় গড় আছে, ও আমাদের ডাইনে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে দুর্গের পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড় রহিয়াছে দেখিলাম। এই দুই বাহিরের গড়ের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডে বাজার আছে। বাজারটি এক্ষণে অতি ক্ষুদ্র। ছয়-সাতখানি চালা ঘরে দোকান আছে। তন্মধ্যে আফিম ও গাঁজার দোকান একটি, জুতা ও কাপড়ের দোকান একটি, মিষ্টান্নের দোকান একটি, ও বাকীগুলি মুদীর দোকান। প্রত্যহ বাজার হয়, উহাতে ৪।৫ মণ দুগ্ধ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া শনি ও মঙ্গলবারে হাট হয়। সীতারামের সময় এই বাজার রামসাগরের উত্তর পাড় হইতে সীতারামের দুর্গের ভিতরের গড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও আয়তনে অনেক বড় ছিল। বাজারের জন্য এই স্থানটি সীতারাম দুর্গ-প্রাকারের মৃত্তিকা দ্বারা প্রশস্ত ও উচ্চ করিয়া প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

সীতারামের যে দুর্গ মধ্যে আমরা এক্ষণে প্রবেশ করিতেছি, উহা মৃন্ময় দুর্গ, এবং প্রায় সম-চতুষ্কোণ। উহার প্রত্যেক দিক ¼ মাইলের কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘ। দুর্গের চারিদিকে প্রথমে একটি পরিখার বেষ্টনী আছে—ইহাকে ভিতরের গড় বলা হয়। এই প্রথম পরিখার বাহিরে কোন দিকে বিল, কোন দিকে দহ আছে। যেখানে তাহা নাই, সেখানে কোথাও খাল, কোথাও বা আর একটি করিয়া গড় কাটা হইয়াছে। ইহাকে বাহিরের গড় কহে। এই বাহিরের গড় দুর্গের দক্ষিণ দিকে একটি ও পূর্ব্ব দিকে একটি আছে।

বাজারের নীচেই উহার পশ্চিম দিকে যে বাহিরের বড় গড়টি আছে, উহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে অনুমান এক মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ১৩০ হাত প্রশস্ত। উহাতে ৭।৮ হাত জল আছে। ইহার পশ্চিম প্রান্ত কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। এই বড় গড়ের দক্ষিণে ফুরশী বিল। খাল কাটিয়া ফুরশী বিলের সহিত এই বড় গড়ের দক্ষিণ দিকের মাঝামাঝি স্থলের সংযোগ করা আছে। এই গড়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে আর একটি খাল কাটা আছে—উহা মাঝের খাল; উহারই উত্তরে মুন্সীর দহ। এই খাল ও দহ দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থিত কাতলাপুর বিলকে ও দুর্গের দক্ষিণ দিকের বাহিরের পূর্ব্বোক্ত বড় গড়কে সংযুক্ত করিতেছে। আবার দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে এই কাতলাপুর বিল দুর্গের ভিতরের গড়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। দুর্গের পূর্ব্ব দিকের ভিতরের গড়ের উত্তরাংশ হইতে গড়ের একটি শাখা পূর্ব্ব দিকে কিঞ্চিৎদূর গিয়া পুনরায় বাঁকিয়া দক্ষিণ দিকে বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শেষোক্ত অংশটি পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড় বলিয়া পরিচিত। এই বাহিরের গড়ের পূর্ব্ব দিক দিয়া কালীগঙ্গা নাম্নী ক্ষীণা তটিনী উত্তর-দক্ষিণে বহিতেছে। কালীগঙ্গার পূর্ব্ব দিকে অদূরে মধুমতী বা এলেংখালী নদী উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হইতেছে। এই

রূপে এই দুর্গ একাধিক বার জলের বেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। বাজারের পশ্চিমে যে দক্ষিণ দিকের বাহিরের বড় গড় আছে, উহার দক্ষিণ পাড়ে ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের রথ টানিবার একটি রাস্তা আছে,—উহা অর্দ্ধমাইলের উপর দীর্ঘ। এই দক্ষিণ পাড়টি নলদীর জমিদারের অর্থাৎ পাইক-পাড়ার রাজবংশের সম্পত্তি।

বাজার ছাড়াইয়া উত্তর দিকে যাইতেই, বামে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে মাগুরা যাইবার রাস্তা পড়িয়া আছে। এই রাস্তা বামে রাখিয়া সোজা আরও কিয়ৎদূর উত্তর দিকে যাইলে, বাম দিকে একটি ভূমি খণ্ড আছে। তথায় ইংরাজ আমলের মুন্সেফী আদালতের ও পুলিশের থানার ভিটা ও তৎসংলগ্ন পুকুরের খাত বর্ত্তমান আছে; কিন্তু এক্ষণে তথায় চাষ আবাদ হইতেছে।

মুন্সেফীর কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে বনজঙ্গলময় একখণ্ড ভূমি আছে—উহা দিঘাপতিয়ার রাজার জমিদারী। ঐ স্থানে অরণ্য মধ্যে একঘর লোকের বসতি আছে; ও তাহার সন্নিকটে ৺ কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের একটি একতালা কোঠা আছে। দিঘাপতিয়ার জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় নাটোরের রাজা রামজীবনের পরিবর্ত্তে সীতারামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মহম্মদপুরে আসিয়া যে ৺কৃষ্ণবিগ্রহটি দিঘাপতিয়ায় লইয়া গিয়াছিলেন, সেই বিগ্রহটি হয়ত তিনি কিছু দিন এখানে রাখিয়াছিলেন। কোঠাটির সম্মুখের বারান্দায় তিনটি খিলান-করা ফোকর আছে; দুইটি গোল থাম উহাদিগকে বিভক্ত করিয়াছে। কোঠাটির মধ্যস্থলে একটি বড় ঘর আছে, ও উহার দুই পার্শ্বে অর্থাৎ উহার পূর্ব্ব দিকে একটি ও পশ্চিম দিকে একটি কুঠারী আছে। কোঠাটির ছাদে কড়ির উপরে কোণাকুণি বা বাঁকা করিয়া বরগা বসাইয়া তাহার উপর টালি বসাইয়া ছাদ করা হইয়াছে। গৃহটির উপরে ও চতুষ্পার্শে বন জঙ্গল জন্মিয়াছে। এই গৃহটির উত্তর দিকে রাণীভবানীর প্রতিষ্ঠিত ৺ রাম-চন্দ্রের পুকুর আছে।

পূর্ব্বোক্ত বাজারের মধ্যস্থ রাজপথ ধরিয়া আরও কিঞ্চিৎ দূর উত্তর দিকে যাইলে, এই পথ ডাইন দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে দুর্গের পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড়ের ও কালীগঙ্গার সঙ্গম স্থল অতিক্রম করিয়া মাঠের মধ্য দিয়া মধুমতীর তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই স্থান হইতে গড়ের পূর্ব্ব পাড়ের কিঞ্চিৎ দূরে সীতারামের পুরোহিত শ্রীহরি বাচস্পতির কোঠা বাড়ী আছে। তথায় তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। সীতারাম পুরোহিতকে স্ত্রী ও পুরুষ-দিগের জন্য দুইটি পৃথক্ পুকুর, একটি কোঠাবাড়ী ও চারিটি মৌজা ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

উক্ত মাঠ অত্যন্ত নিম্নভূমি; দেখিলে মনে হয় যে, উহা কোন নদীর খাত। কথিত আছে যে, পূর্ব্বে মধুমতী মহম্মদপুরের পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত ছিল; এবং মহম্মদ-পুরের এই দিকে কামান সাজাইয়া স্বয়ং সীতারাম ভূষণার ফৌজদার আবু তোরাপের সেনাপতি পীর খাঁর গতিরোধ করিয়াছিলেন। উক্ত রাজপথ যে স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে

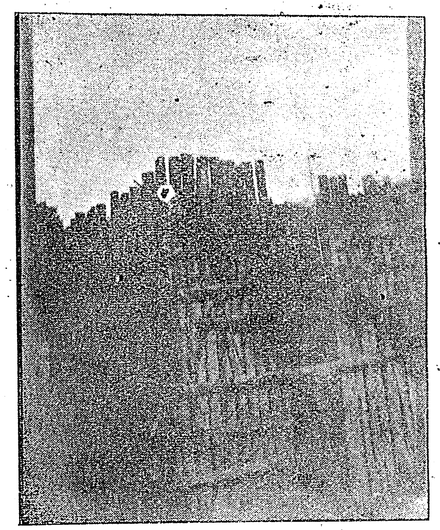

মহম্মদপুর—ব্যাঘ্র ধরিবার খোঁয়াড়

বাঁকিয়া গিয়াছে সেই স্থানে আসিয়া পূর্ব্ব দিকে যাইতেই, উক্ত গড় ও রাস্তার সঙ্গম-স্থানের বাম পার্শ্বের কোণে ও উক্ত গড়ের পশ্চিম পাড়ে একখণ্ড বনজঙ্গলময় ভূমিতে সীতারামের প্রধান সেনাপতি বীর, চিরকুমার ও দেবচরিত্র মেনাহাতীর ওরফে রামরূপ ঘোষের সমাধির ধ্বংস-স্তূপ আছে। উহারই নীচে কালীগঙ্গা গড়ে আসিয়া মিশিয়াছে। কিম্বদন্তী আছে এবং ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, গুপ্তঘাতকগণ এক দিন প্রাতে কুজ্ঝটিকার সময় মেনা-

হাতীকে পশ্চাৎ দিক হইতে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তাহার মুণ্ড কাটিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। কথিত আছে যে, ঐ মুণ্ড মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এদিকে সীতারাম মেনাহাতীর মুণ্ডহীন দেহের সৎকার করাইয়া চিতাভস্ম ও অস্থি এই স্থানে সমাহিত করাইয়া তদুপরি একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। অন্য দিকে মেনাহাতীর ছিন্ন মুণ্ড নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি বীরের বিশাল মুণ্ড দেখিয়া শিহরিলেন, এবং এরূপ বীরকে হত্যা না করিয়া বন্দী করা

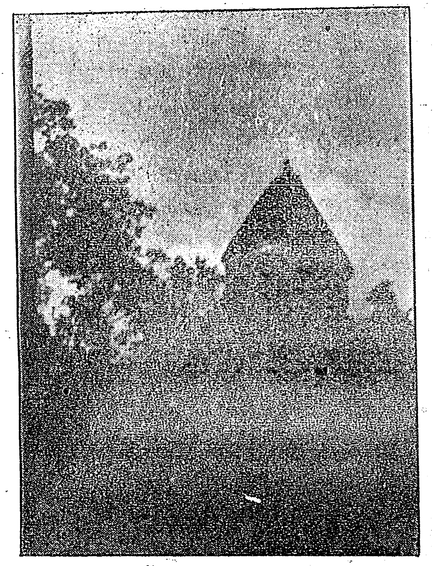

মহম্মদপুর—৺ লক্ষ্মীনারায়ণের দোলমন্দির

উচিত ছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া মুণ্ডটি মহম্মদপুরে ফেরৎ দিয়াছিলেন। তখন ঐ মুণ্ডও এই স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল। মেনা হাতীর আসল নাম রামরূপ ঘোষ। তিনি যশোহর জেলার রায় গ্রামের আকনা সমাজের দক্ষিণ রাঢ়ী কুলীন কায়স্থ ছিলেন। মেনাহাতী শব্দের অর্থ এই যে, তিনি দেখিতে একটি ছোটখাট হস্তীর ন্যায় ছিলেন এবং সাধারণ মানব অপেক্ষা প্রায় এক হস্ত পরিমাণ উচ্চ ছিলেন। সীতারাম ইঁহার উপর মহম্মদপুর রক্ষার ভার দিয়াছিলেন। এক্ষণে মেনাহাতীর সমাধি-স্থলে জঙ্গল মধ্যে একটি ইষ্টকের ঢিবি আছে মাত্র।

এই স্থানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে গ্রাম-প্রান্তে ব্যাঘ্র ধরিবার জন্য বংশ-দণ্ড নির্ম্মিত একটি ঘর বা খাঁচা আছে; উহার মধ্যে ছাগ রাখিয়া ব্যাঘ্র ধরা হয়।

মেনা হাতীর সমাধি ডাইন দিকে রাখিয়া উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, রাস্তার বাম দিকে সীতারামের পদ্মাকৃতি পদ্মপুকুর আছে। ইহার মধ্যে ঘাস, দাম ও বন-জঙ্গল জন্মিয়া কতক অংশ মজিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ২-২৷৷০ হাত জল আছে। তাহাতে বালি হাঁসের ঝাঁক আসিয়া বসে ও আনন্দ-কলরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত করে। এই পদ্ম পুকুরের ধারে সীতারামের সময় হিন্দুস্থানী খোটারা বাস করিত। সেজন্য ইহাকে কাট খোট্ট পাড়া বা উহার অপভ্রংশ কাঠ ঘর পাড়া বলা হইত। ইহারই কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে শত্রুপক্ষকে দ্বিতীয় বার বাধা দিবার ব্যবস্থা ছিল।

এইবার উক্ত রাস্তা যেখানে পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া দুর্গের প্রথম পরিখার বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিল, সেই স্থানে শত্রুকে তৃতীয় বার বাধা দিবার ব্যবস্থা ছিল ও এই স্থান কামান দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এই বাঁকের উত্তর দিকে দুর্গের পূর্ব্ব দিকের ভিতরের ও বাহিরের গড়ের ঘোঁজের মধ্যে সীতারামের কানুনগো-কাছারীর ভিটা আছে। তথায় এক্ষণে একঘর ধোপা বাস করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত রাস্তা ধরিয়া সামান্য দূর পশ্চিম দিকে যাইলে ডাইন দিকে সীতারামের চূণপুকুরের খাত আছে। এই চূণ পুকুরে সীতারামের মন্দির ও হর্ম্ম্য নির্ম্মাণের জন্য চূণ প্রস্তুত হইত। এই স্থান হইতে সামান্য দূর পশ্চিমে গেলে, রাস্তার বাম দিকে কিঞ্চিৎ দূরে ও উক্ত পদ্মপুকুরের পশ্চিম দিকে সীতা-রামের পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। আসনের উপরে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত বেদী আছে। বেদীর নিকটে একটি অতি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। প্রবাদ আছে যে, বিখ্যাত সাধক নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ এই আসনের উপরে বসিয়া সাধন করিতে সমর্থ হন নাই। এই স্থানে দ্বীপান্বিতা কালী-পূজা হয় ও পৌষ সংক্রান্তির সময় বাস্তু-পূজা হয়। সীতারাম প্রথমে শক্তি-উপাসক ছিলেন। পরে তিনি তাঁহার নূতন গুরু কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা লয়েন। কৃষ্ণবল্লভ মুর্শিদাবাদের টেঁয়া গ্রাম নিবাসী ছিলেন। মহ-ম্মদপুরের নিকটে ঘুল্লিয়া গ্রামে এখনও তাঁহার বংশধরগণ বাস করেন।

প্রবাদ আছে যে, এই পঞ্চমুণ্ডীর অদূরে মহম্মদ শাহ নামক এক মুসলমান ফকির বাস করিতেন। এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করিবার জন্য সীতারাম সেই ফকিরকে স্থান ত্যাগ করিতে বলিলে, তিনি প্রথমে অসম্মত হয়েন। কিন্তু পরে কহিলেন যে, তাঁহার নামে রাজধানীর নামকরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, তিনি স্থান ত্যাগ করিবেন। তদনুসারে সীতারাম উক্ত মুসলমান ফকিরের নামানুসারে তাঁহার রাজধানীর মহম্মদপুর নামকরণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, বঙ্গেশ্বর মামুদশাহের নামানুসারে এই স্থানের নাম মামুদপুর হইয়াছিল ও উহা হইতে মহম্মদপুর হইয়াছে।

উক্ত পঞ্চমুণ্ডীর উত্তর দিকের রাস্তার পার্শ্বে সীতারামের পঞ্চবটী আছে। এক্ষণে পঞ্চবটীর মধ্যে ত্রিবটী, যথা, বেল, হরিতকী ও আমলকীর গাছ একত্র দণ্ডায়মান আছে।

এই স্থান হইতে পশ্চিম দিকে অল্প দূর গেলে, ডাইন দিকে এক খণ্ড উন্মুক্ত মাঠের উত্তর দিকে সীতারামের ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার দোল-মন্দির বা মঞ্চ আছে। দোলমঞ্চটি ইষ্টক-নির্ম্মিত ও অতি সুশ্রী। ইহার চারিটি থাক আছে। প্রথমে মাটীর উপরে ৫৷৷০ হাত উচ্চ একটি সমচতুষ্কোণ রোয়াক আছে, উপরে ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট কিন্তু ৫৷৷০ হাত উচ্চ আর একটি সমচতুষ্কোণ রোয়াক আছে, তাহার উপরে তদপেক্ষা আরও কিঞ্চিৎ ছোট আর একটি ৩ হাত উচ্চ সমচতুষ্কোণ রোয়াক আছে। এই শেষোক্ত তৃতীয় রোয়াকের উপরে যেন কোন সুখ-স্বপ্নের ছবির ন্যায় দেখিতে ক্ষুদ্র দোল-মন্দিরটি আছে। বহু দিনের অযত্নে মঞ্চে উঠিবার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও রোয়াকগুলির উপরে ও মন্দিরে বন জঙ্গল হইয়াছে এবং মন্দির মধ্যে চামচিকায় বাসা করিয়াছে। শুনিলাম, এখনও এখানে ৺লক্ষ্মীনারায়ণের দোল হয়। এই দোলমঞ্চের উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে সীতারামের সেনা-বারিক ছিল, এবং ইহার সম্মুখের মাঠে সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজ হইত। কথিত আছে যে, নবাবের সহিত যুদ্ধকালে, এক দিন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন প্রভাতে দুর্গাধ্যক্ষ সেনাপতি মেনাহাতী যখন এই দোলমঞ্চের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, তখন গুপ্ত-ঘাতকগণ তাঁহাকে পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণ করিয়া তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া লইয়া গিয়াছিল। উক্ত দোলমঞ্চের পশ্চাতে আধুনিক কাট খোট্ট বা কাষ্ঠ ঘর পাড়া আছে। তথায় মাত্র একঘর কনৌজীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন।

দোলমঞ্চের দক্ষিণ দিকের মাঠের দক্ষিণে নাটোরের রাণী ভবানীর স্থাপিত ৺রামচন্দ্রের পূজা-বাটী আছে। ইহা অনুমান ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত। ইহার প্রবেশ-দ্বারটি দ্বিতল। দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইহার দুইপার্শ্বে ইষ্টক-নির্ম্মিত দুইটী ক্ষীণদেহ ক্ষুদ্র হস্তীর উপরে মাহুত বসিয়া আছে। দ্বারের প্রত্যেক

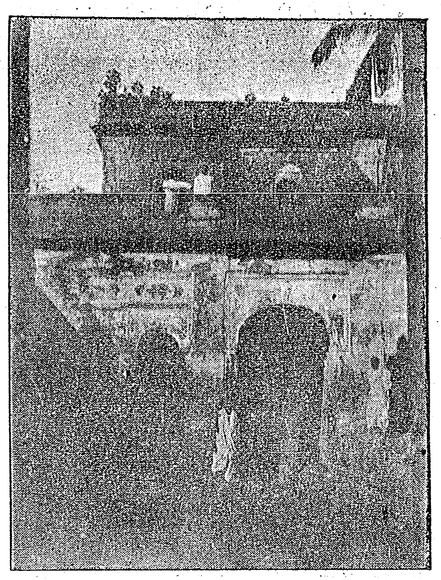

মহম্মদপুর—৺ রামচন্দ্রের বাটীর সিংহদ্বার ভিতর হইতে

পার্শ্বে বাহির দিকে একটি করিয়া দুইটি ও ভিতর দিকে ঐরূপ দুইটি কুঠারী আছে। প্রবেশ-দ্বারের দ্বিতলে প্রত্যেক পার্শ্বে একটি করিয়া দুইটি ঘর আছে। এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থলে নহবতের জন্য খিলান-করা ছাদ-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ঘরটির সম্মুখে ও পশ্চাতে বাঙ্গালা ঘরের আকৃতি-বিশিষ্ট দুইটি ক্ষুদ্র চূড়ার ন্যায় আছে বলিয়া প্রবেশ-দ্বারের শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির ধাপগুলি অত্যন্ত উচ্চ। পূজাবাটীর কর্ম্মচারীগণের নিকট শুনিলাম যে, বর্ষাকালে জ্যোৎস্না রাত্রে এই সিংহদ্বারের উপরে বন্দুক লইয়া বসিয়া থাকিলে সহজে

ব্যাঘ্র শিকার করা যায়। সীতারামের দুর্গের মধ্যস্থিত জঙ্গলে যে সকল ব্যাঘ্র ও বন্য শূকর আছে, উহারা এই স্থান দিয়া যাতায়াত করে। এই ব্যাঘ্রগুলি গুল্ বা গো-বাঘা। রামচন্দ্রের বাটীর মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠান আছে। উঠানের এক দিকে প্রবেশ-দ্বার ও অপর তিন দিকে খিলান-করা ছাদ-বিশিষ্ট একতলা গৃহ আছে। পূর্ব্ব দিকের দালানে এক্ষণে নাটোরের মহারাজার কাছারি হয়। আমরা এই দালানে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। এই দালানটির সম্মুখদেশে পাঁচটি খাঁজ-কাটা দ্বারের খিলান আছে। দক্ষিণ দিকের দালানে লোকজন আহারাদি

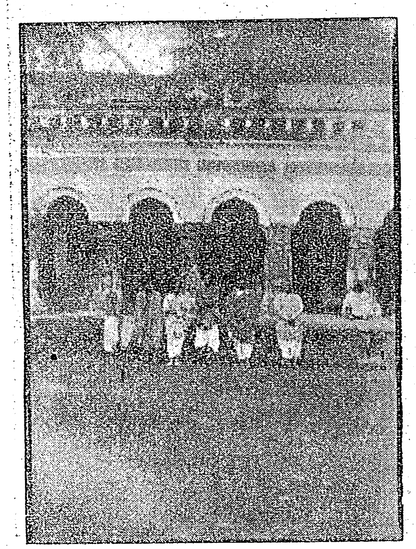

মহম্মদপুর—৺ রামচন্দ্রের বাটীর ঠাকুরদিগের ঘর

করে; এবং পশ্চিম দিকের পাঁচ-ফোকরের বারান্দা-শোভিত খিলান করা ছাদবিশিষ্ট ঘরে সীতারামের ৺লক্ষ্মী নারায়ণশিলা, নিম্ব-দারু-নির্ম্মিত ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, অষ্ট-ধাতুর ৺রাধিকা ঠাকুরাণী এবং রাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর-নির্ম্মিত ৺ রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান এবং নিম্ব-দারুময় ৺বলরাম বিগ্রহ আছেন। এই শেষোক্ত গৃহটির সম্মুখের দেয়ালে কিঞ্চিৎ কারুকার্য্য করা আছে। পূর্ব্বে সীতারামের হরেকৃষ্ণ ঠাকুর ও রাণী ভবানীর বলরাম অদূরবর্ত্তী কানাইনগর গ্রামে তাঁহাদের আপনাপন মন্দিরে ছিলেন এবং সীতারামের লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা দুর্গমধ্যস্থ লক্ষ্মীনারায়ণের দ্বিতল মন্দিরে ছিলেন। তখন ঐ সকল মন্দিরে লোকজন ছিল, ও তথায় বিগ্রহগুলির নিত্য সেবা ও অতিথি-সেবাদি হইত। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই অধিকাংশ মন্দিরগুলির উপরে বৃক্ষাদি জন্মিয়াছিল। শুনিলাম যে, ১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মহম্মদপুরের বিগ্রহগুলি হঠাৎ এক দিন নাটোরে লইয়া যাওয়া হয়। অনুমান ৫ বৎসর পরে ১৩৩০ সালের শ্রাবণ মাসে নাটোরের সহৃদয় মহারাজা বাহাদুর প্রজাদিগের কাতর প্রার্থনায় বিগ্রহগুলিকে পুনরায় মহম্মদপুরে ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু তখন দীর্ঘ ৫ বৎসরের অব্যবহারে হরেকৃষ্ণ, বলরাম ও লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির ধ্বংসোন্মুখ হইয়া অব্যবহার্য্য হওয়ায়, বিগ্রহগুলিকে রামচন্দ্রের গৃহে রাখা হইয়াছে। রামচন্দ্র বিগ্রহের সহিত একই ঘরে ইঁহাদের পূজাদি হইতেছে। রামচন্দ্রের বাটীর গাঁথনি পাকা—সীতারামের কোঠা-গুলির ন্যায় মাটীর গাঁথনি নহে। ইহার দেওয়ালে বালির পরিবর্ত্তে মিহি সুরকী দিয়া মাজিয়া তাহার উপর চুণকাম করা হইয়াছে। গৃহগুলির খিলান-করা ছাদের উপরে ঘাস ও গাছ জন্মিয়াছে এবং ছাদ ভেদ করিয়া গৃহগুলির মধ্যে বৃষ্টির ধারা পড়ে। সমগ্র মহম্মদপুর দুর্গের মধ্যে এই পূজাবাটী অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে। এখনও রামচন্দ্রের রামনবমী যাত্রা ও দীপ যাত্রা উৎসব হইয়া থাকে।

রামচন্দ্রের বাটীর দক্ষিণ দিকে রামচন্দ্রের পুকুর আছে। এই পুকুরের পশ্চিম দিকের পাড়ের মাঝামাঝি স্থানে একটি স্থান আছে—উহাকে রসের গলি বলা হয়। ঐ স্থানে সীতারামের সময় বেশ্যা-পল্লী ছিল।

তৎপরে রামচন্দ্রের বাটীর উত্তর দিকের পথে আসিয়া দুর্গের মধ্যে সীতারামের ঠাকুরবাটী প্রভৃতির ধ্বংস দেখিতে চলিলাম। ঐ পথ দিয়া রামচন্দ্রের বাটী ছাড়াইয়া পশ্চিম দিকে যাইতে রামচন্দ্রের বাটীর পশ্চিম দিকে কয়েকটি কুঠারীর ধ্বংসাবশেষ দেওয়াল ও ইষ্টকের স্তূপ আছে। একটি কুঠারীর ভিতরে মাপিয়া দেখিলাম যে, উহা ৯×৫।০ হাত। এই স্থানে পূর্ব্বে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত বাটী ছিল। ইহা সীতারামের মৃত্যুর পরে প্রস্তুত ও নলদী জমিদারীর কাছারি ছিল। ইহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুর্গাভ্যন্তরে যাইবার পথের উত্তর পার্শ্বে

নাটোরের রাজাদিগের পুণ্যাহ ঘরের ধ্বংস-স্তূপ আছে। আরও কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিকে যাইলে পথের ডাইন পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ একটি গৃহ ছিল। ইহার যে অংশ পথের পার্শ্বে অবস্থিত ছিল, তথায় পূর্ব্বে সীতারামের চাকলা কাছারি ছিল। এই স্থানে রাজস্ব আদায় হইত এবং জমিদারীর আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা হইত। এই গৃহের যে অংশ উত্তর দিকে বিস্তৃত ছিল, তথায় সীতারামের জেলখানা ও সাজাখানা ছিল। যে সকল প্রজা রাজস্ব দিতে বিলম্ব করিত, তাহাদিগকে এই স্থানে শাস্তি দেওয়া হইত ও কারারুদ্ধ করা হইত। ইহারই পশ্চিমে সীতারামের তোষাখানার পুকুর আছে। এই সমুদায় স্থানে এক্ষণে ধ্বংস স্তূপ, ভগ্ন দেওয়াল ও বন-জঙ্গল আছে।

এই চাকলা কাছারি ছাড়াইয়া রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে যাইতে সম্মুখে সীতারামের প্রথম সিংহদ্বারের ধ্বংস স্তূপ আছে। সিংহদ্বারের উপরে খিলান ও দেওয়াল প্রভৃতি এখন আর কিছুই নাই। শুধু রাস্তার দুই পার্শ্বে ইষ্টক স্তূপ ও সিংহদ্বারের সম্মুখের দুই পার্শ্বের গোল স্তম্ভগুলির সামান্য অংশ মাত্র ভূমির উপরে ২।৩ হাত উচ্চ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। কথিত আছে যে, একটি গম্বুজের গোলকের ভিতরের ফাঁপা দিকের অর্দ্ধাংশ বাহিরের দিকে করিয়া বসাইলে যেরূপ হয়, এই সিংহ-দ্বারের উপরের খিলানের সম্মুখভাগ দেখিতে সেইরূপ ছিল। সিংহদ্বারটি এরূপ উচ্চ ছিল যে, পৃষ্ঠে হাওদা ও লোকসহ হস্তী অনায়াসে ইহার মধ্য দিয়া যাইতে পারিত। সিংহদ্বারের মধ্যস্থ পথ ৭।৮ হাত প্রশস্ত। এই সিংহদ্বার হইতে সীতারামের প্রাচীর-বেষ্টিত পূজাবাটী ও অন্দর-মহলাদি আরম্ভ হইল। এই সিংহদ্বারের সম্মুখে শত্রুপক্ষকে চতুর্থ-বার বাধা দিবার ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে এখানে ধ্বংস-স্তূপ ও বন-জঙ্গল আছে।

সিংহদ্বারের উত্তর গায়ে সীতারামের পুণ্যাহ ঘর ছিল। সিংহদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে একটি ছোট উঠানের তিন দিকে তিনটি কোঠা ঘর ছিল। সিংহদ্বারের সম্মুখের ঘরটি সীতারামের মালখানা ছিল। বাম দিকের অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের ঘরে সীতারামের শরীর-রক্ষীগণ থাকিত। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব বলেন যে, সীতারামের পতনের পরে নাটোরের রাজগণ এই গৃহ দুইটিকে ঐ দুই কার্য্যের জন্যই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অনুমান ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নলদী জমিদারী নাটোর-রাজবংশের হস্তচ্যুত হইলে, উহার ক্রেতা এই দুই গৃহ হইতে নাটোরের লোক-জনকে বল পূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তখন অগত্যা নাটোরের রাজা এই উঠানের উত্তর দিকের ছোট ঘরটি প্রস্তুত করাইয়া উহাতে মালখানা স্থাপন করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে এ সকল স্থানে বন-জঙ্গল ও স্তূপ আছে।

সীতারামের পূর্ব্বোক্ত মালখানার দক্ষিণ দিকে

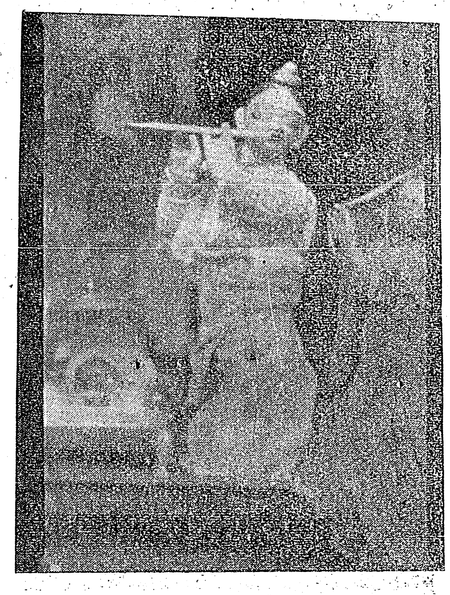

মহম্মদপুর—৺ লক্ষ্মীনারায়ণ শীলা ও ৺ হরেকৃষ্ণ ঠাকুর

সীতারামের সময় একটি ছোট সিংহদ্বার ছিল; উহা দিয়া মালখানার পশ্চাৎ দিকের একটি ছোট উঠানে যাওয়া যাইত। এই উঠানের পশ্চিম দিকে নাটোরের রাজাদিগের একটি সাধারণ শিবমন্দির ছিল, এবং দক্ষিণ দিকে সীতারামের গোলাবাড়ী ছিল। এই সকল স্থান এক্ষণে ইষ্টকস্তূপ ও বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া আছে।

এই অংশের পশ্চিমে অন্য একটি অংশে সীতারামের ঠাকুরবাটী আছে। এই ঠাকুরবাটীর উঠানে প্রবেশ করিবার একটি দ্বার ও নহবৎখানা ছিল; এখনও লোকে দক্ষিণ দিকে তাহার স্থান দেখাইয়া দেয়। ঠাকুরবাটীর

মধ্যস্থলে উঠান আছে। এই উঠানের উত্তর দিকে সীতারামের ৺দশভূজার মন্দির আছে; পশ্চিমে কারুকার্য্য-খচিত ৺কৃষ্ণের মন্দির আছে। নহবৎ-কোঠা ভূমিসাৎ হইয়াছে। কৃষ্ণের মন্দিরটি একটি বৃহৎ জোড় বাঙ্গলা মন্দির। ইহার সম্মুখ দিকে মন্দির গাত্রে ইষ্টকের উপর খোদাই-করা নানা দেবদেবী, ফুল, লতা, পাতা ও জীবজন্তু প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। মন্দিরটির বাঙ্গলা ঘরের চালের আকৃতি-বিশিষ্ট খিলান-করা ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে ও চতুষ্পার্শে বনজঙ্গল জন্মিয়াছে।

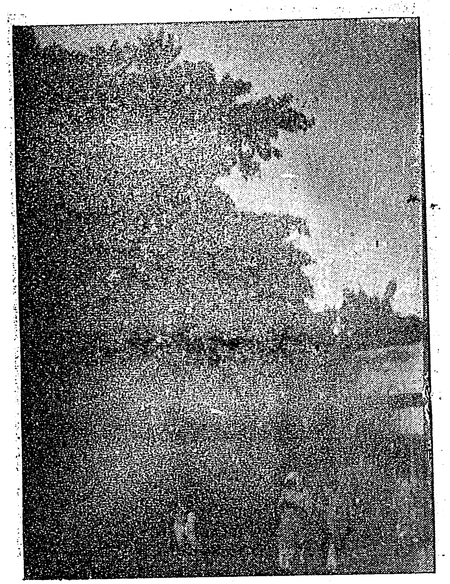

মহম্মদপুর—৺ দশভূজার ঘর

সীতারামের পতনের সময় তাঁহার দুর্গ শত্রু-করতলগত হইলে, এই মন্দিরের প্রস্তরময় ৺কৃষ্ণ বিগ্রহটি দয়ারাম রায় দিঘাপতিয়ায় লইয়া যান; তথায় উহা আজিও পূজিত হইতেছে। ৺দশভূজা দেবীর প্রাচীন মন্দিরটি ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তৎপরে এই ভগ্ন মন্দিরের দেওয়ালের উপরে কড়ি-বরগা দিয়া ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া যে গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল, উহা ১৩১৬ সালে পড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে সেই পুরাতন দেওয়ালের উপরে টিনের চাল হইয়াছে। এই দশভূজা মূর্ত্তিটি অষ্টধাতু নির্ম্মিত ও অনুমান ১।০ হাত উচ্চ হইবে। মূর্ত্তিটির সর্ব্ব অবয়ব অতি সুশ্রী। সীতারাম পূর্ব্বে যখন শাক্ত ছিলেন, তখন সর্ব্ব প্রথমে এই মূর্ত্তিটির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের লুপ্ত স্মৃতি-ফলকে এইরূপ লিখিত ছিল:—

মহাভুজ রসক্ষৌণী শাকে দশভূজানয়ম্।
অকারি শ্রীসীতারাম রায়েন * * মন্দিরম্॥

অর্থাৎ ১৬২১ শকে বা ১৬৯৯।১৭০০ খৃষ্টাব্দে সীতারাম এই মন্দির প্রস্তুত করেন। এই দেবী অত্যন্ত জাগ্রত বলিয়া লোকের বিশ্বাস। প্রবাদ আছে যে, একবার দেবীর ভোগে একটি কেশ পড়িয়াছিল, তাহাতে দেবী স্বপ্ন দিয়াছিলেন যে তিনি অভুক্ত আছেন। দেবীর নিত্য সেবা হয়। এক্ষণে এই দেবী নাটোরের মহারাজার সম্পত্তি। এখানে দেবীর বাসন্তী পূজা হয় এবং দুর্গোৎসবের সময় মৃন্ময় দুর্গাপ্রতিমার পূজা হয়। এই গৃহ মধ্যে এক পার্শ্বে প্রায় ৫।৬ হাত দীর্ঘ একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত পদার্থ আছে। উহার দুই মুখ সরু, লোকে ইহাকে সীতারামের চড়কের পাটবান কহে। দশভূজার মন্দিরের সম্মুখে উঠানের পশ্চিমে দশভূজার পুকুর আছে। ইহাও সীতারামের অন্যান্য কীর্ত্তির ন্যায় অযত্নে ধ্বংস-পথে চলিয়াছে।

দশভূজার মন্দিরের পশ্চিমের রাস্তা দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে গেলে, সম্মুখে সীতারামের ৺লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম-শিলার দ্বিতল অষ্টকোণ মন্দির আছে। মন্দির-গাত্রে কোন কারুকার্য্য নাই। একতলার ও দ্বিতলের ছাদ খিলান-করা কিন্তু সমতলপ্রায়। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব ও ছাদে গাছপালা জন্মিয়া মন্দিরটিকে ধ্বংস-পথে লইয়া যাইতেছে। মন্দির-পার্শ্বের ঘোরান সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলাম যে, ছাদের খিলান ভেদ করিয়া অশ্বত্থ-বটের শিকড় গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গৃহমধ্যে এক পার্শ্বে মেঝের উপর কয়েকটি দুগ্ধফেণ-সন্নিভ লক্ষ্মী পেঁচার বাচ্চা হইয়াছে। এই দ্বিতলের ঘরে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর পূজান্তে বিশ্রাম করিতেন। পূর্ব্বে এই মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণের নিত্য সেবা হইত, কিন্তু শিলাটি অন্যান্য বিগ্রহ সহ নাটোরে লইয়া যাওয়ার পর হইতে মন্দিরটি দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অব্যবহারে ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। এক্ষণে শিলাটি পূর্ব্বোক্ত রামচন্দ্রের গৃহে অন্যান্য বিগ্রহের সহিত অবস্থান করিতেছেন। প্রবাদ আছে যে একদা সীতারাম যখন অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার অশ্বের ক্ষুর কর্দ্দমের মধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল।

অশ্ব আর পা উঠাইতে পারিতেছে না দেখিয়া, সেই স্থান খনন করিয়া দেখা গেল যে, অশ্বের ক্ষুর একটি মন্দির-শিখরের ত্রিশূলে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই মন্দির মধ্যে এই শিলা ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সীতারামের পিতা এই শিলাটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং সীতারাম পরে এই মন্দিরটি করাইয়া দেন। যাহা হউক, এই শালগ্রাম শিলা পাইবার পর হইতেই সীতারামের সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। এই মন্দির-ললাটের লুপ্ত স্মৃতি-ফলকে এইরূপ লেখা ছিল:—

লক্ষ্মী-নারায়ণ স্থিতৈ তর্কাক্ষিরসভূশক।
নির্ম্মিতং পিতৃ পুণ্যার্থং সীতারামেন মন্দিরম্॥

অর্থাৎ সীতারাম পিতৃ-পুণ্যার্থে এই মন্দিরটি ১৬২৬ শকে বা ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করান।

লক্ষ্মী-নারায়ণ এক্ষণে নাটোরের সম্পত্তি এবং এখনও ইঁহার দোল ও রথ প্রভৃতি উৎসব হয়। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব একটি জনশ্রুবাদের উল্লেখ করিয়াছেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে যখন মহম্মদপুরের দেবত্র সম্পত্তি কিছুকাল নড়াইলের জমিদারী-ভুক্ত হইয়াছিল, সেই সময় আসল লক্ষ্মী-নারায়ণ শিলাটি বদল করিয়া নড়াইলে লইয়া যাওয়া হয়, ও তৎপরিবর্ত্তে অন্য একটি ছোট শিলা মহম্মদপুরে রাখা হয়। আসল শিলাটি নড়াইলে থাকিয়া গিয়াছে, ফলে নড়াইলের উন্নতি হইয়াছে ও মহম্মদপুর মহামারীতে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই কিম্বদন্তীর কথা মহম্মদপুরের জনৈক পুরোহিতের মুখেও শুনিয়াছি। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের দক্ষিণে কয়েকটি ভগ্ন গৃহের দেওয়াল মাত্র অবশিষ্ট আছে। শুনা যায় যে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে সীতারামের অতিথিশালা ছিল।

লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরের পশ্চিম দিকে উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ সীতারামের তোষাখানা আছে। উহার ছাদ খিলান-করা ও ঘরের ভিতর হইতে দেখিতে বাঙ্গলা ঘরের চালের ন্যায় বা হস্তী পৃষ্ঠের ন্যায়। দুইটি ঘর এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে এবং আর দুইটি ভগ্ন ঘরের দেওয়াল মাত্র অবশিষ্ট আছে; ঘরগুলির মধ্যে দুইটি বড় ও দুইটি ছোট। বড় ঘর দুইটির প্রত্যেকের মাপ অনুমান ২২×৬ হাত ও ছোট দুইটির প্রত্যেকের মাপ অনুমান ১০×৫ হাত। এই খানে একটি ভগ্ন গৃহের দেওয়ালে মাটী চাপা একটি ছোট দ্বারের খিলান দেখাইয়া আমাদের পথ-প্রদর্শক বলিলেন যে, ঐ স্থানে একটি সুড়ঙ্গ আছে। উহা দিয়া সীতারামের আমলে দুর্গের বাহিরে যাইবার গোপন পথ ছিল। তোষাখানার বাটী দ্বিতল, উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। কিন্তু গৃহ মধ্যে অসংখ্য চামচিকা থাকায়, উহাদের বিষ্ঠার দুর্গন্ধে তথায় ক্ষণকাল থাকাও দুষ্কর। এই তোষাখানায় সীতারামের রাজকীয় স্বর্ণ-রৌপ্যের আসাসোটা ও তৈজসপত্রাদি থাকিত। এক্ষণে এই বাটীর উপরে ও চতুর্দ্দিকে বন জঙ্গল জন্মিয়াছে। তোষাখানার উত্তর গাত্রে সংলগ্ন কয়েকটি বড় ঘরের ভগ্ন দেওয়াল দণ্ডায়মান আছে। শুনা যায় যে, এই সকল গৃহে সীতারামের সময় রক্ষীগণ থাকিত।

তোষাখানার পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে যাইবার জন্য তোষাখানার দক্ষিণ দিকে একটি দ্বার ছিল। উহা দিয়া তোষাখানার পশ্চাতে যাইলে, পশ্চিম দিকে নাটোর রাজবংশের স্থাপিত একটি ক্ষুদ্র শিবমন্দির ছিল। তাহার পশ্চাতে বা পশ্চিমে আর একটি মহল ছিল, উহা সীতারামের অন্দর মহল। এক্ষণে তথায় ভগ্ন স্তূপ ও বন জঙ্গলের মধ্যে ব্যাঘ্র ও বন্য শূকর নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। স্থানীয় লোকে বলে যে, এই অন্দর মহল একটি ছোট গড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল ও উহার সহিত দুর্গের গড়ের সংযোগ ছিল। অন্দর মহলের পশ্চিমে গড়ের ধারে সাধুখাঁর পুকুর আছে। সাধুখাঁ ওরফে গোপেশ্বর ঘোষ খাঁর সহিত সীতারামের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইরঙ্গিনীর বিবাহ বৎসরে এই পুকুর কাটা হইয়াছিল।

তৎপরে পুনরায় দশভূজার মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়া উহার পশ্চিম দিক দিয়া উত্তর দিকে চলিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া সীতারামের দ্বিতল আবাস-গৃহে বা বৈঠক-খানা-বাটীতে উপস্থিত হইলাম। বৈঠকখানাটি দ্বিতল, পশ্চিমদিক ইহার সম্মুখ। ইহার একতলায় মধ্যস্থলে একটি বড় ঘর আছে। উহার মাপ অনুমান ১৭×৬ হাত। এই বড় ঘরের উত্তরে একটি ও দক্ষিণে একটি কুঠারী আছে, উহাদিগের প্রত্যেকের মাপ অনুমান ১৪½×৬ হাত। বড় ঘরের পূর্ব্ব দিকে একটি দালান আছে, উহার মাপ অনুমান ১৭×৬ হাত। নীচের তলার দেয়াল ২॥০ হাত স্থূল, এবং সীতারামের যাবতীয় গৃহ ও মন্দিরের ন্যায় ইহার গাঁথনি কাদার। নীচের তলায় পূর্ব্বদিকে পাঁচটি

খিলান-করা দ্বার আছে, উত্তর দিকে দুইটি, দক্ষিণ দিকে তিনটি ও পশ্চিম দিকে একটি দ্বার আছে। দ্বিতলের মধ্যের ঘরটি এখনও আছে। সীতারামের যাবতীয় গৃহ ও মন্দিরের ছাদের ন্যায় এই বাটীর ছাদ খিলান-করা, কিন্তু অনেক স্থলে ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

এই বাটীর নীচে পূর্ব্ব দিকে একটি পুকুর আছে। উহাকে ৺লক্ষ্মী-নারায়ণের পুকুর বা তোষাখানার পুকুর বা ধনাগার-পুকুর বলা হয়। এই পুকুরের দক্ষিণ দিকে পূর্ব্বোক্ত দশভুজার মন্দির আছে। পুকুরের পূর্ব্ব দিকে আধুনিক কাট খোট্টা বা কাষ্ঠঘর পাড়া আছে। এই পুকুরটি সমচতুষ্কোণ ও বেশী বড় নহে। ইহার চারিধার ও জলের মধ্যে ইহার তলদেশ ইষ্টক দ্বারা আগাগোড়া বাঁধান আছে। শুনা যায় ইহার তলদেশে সাতটি চাড়ি বা নাদাবসান কূপ ছিল; ঐ কূপগুলির প্রস্রবণে পুকুরটি পূর্ণ হইত। সীতারাম এই পুকুরে তাঁহার ধনরত্ন নিক্ষেপ করিতেন ও বিশেষ প্রয়োজন হইলে আবশ্যক মত উঠাইয়া লইতেন। শুনা যায়, কিয়ৎকাল পূর্ব্বেও কেহ কেহ এই পুকুরে ধন পাইয়াছে। পুকুরের চতুর্দ্দিকে জলের ধারে জলের মধ্য হইতে যে প্রাচীর গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল, ঐ প্রাচীরে জলের উপরে এক হাত ব্যবধানে একটি করিয়া সুশ্রী খাঁজ-কাটা খিলান-করা কুলুঙ্গীর সারি ছিল; প্রত্যেক কুলুঙ্গীর মাপ ১॥ হাত উচ্চ × ১ফুট প্রশস্ত। এই এই সকল কুলুঙ্গীতে সীতারামের সমস্ত রাত্রে প্রদীপের সারি জ্বালিয়া দেওয়া হইত। তদ্দ্বারা পুকুরটির অপূর্ব্ব শোভা হইত ও তস্করের ভয় নিবারিত হইত। উক্ত কুলুঙ্গী-শোভিত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ এখন উত্তর-পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাড়ের স্থানে স্থানে আছে। এই প্রাচীরের তিন হাত দূরে উত্তর-পূর্ব্ব দিকের পাড়ের উপরে পূর্ব্বকালে আর একটি করিয়া প্রাচীর ছিল, আজিও স্থানে স্থানে উহা ২।৩ হাত উচ্চ হইয়া দণ্ডায়মান আছে। বহুকালের অযত্নে এক্ষণে সীতারামের সাধের পুকুরটি ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। পুকুরের মধ্যে অনেক স্থলে দাম, শ্যাওলা ও হোগলা জাতীয় তারাজি নামক জলীয় গাছের বন হইয়াছে। স্থানে স্থানে পুকুরে এখনও ৩।৪ হাত জল আছে। স্থানীয় লোকের নিকট শুনিলাম যে, এই ৩।৪ হাত জলের নীচে ৬,৭ হাত পাঁক মাটি আছে, তাহার নীচে পুকুরের তলদেশ ইষ্টক দ্বারা আগাগোড়া বাঁধান আছে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে একবার নড়াইলের বাবুদের লোকে পুকুরটি ছেঁচিয়া ফেলিয়া ধনের সন্ধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই; কারণ, রাত্রের মধ্যে পুকুরটি জলপূর্ণ হইয়া যাইত।

সীতারামের পূর্ব্বোক্ত দ্বিতল বৈঠকখানা বা আবাস বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে দুর্গের ভিতরে উত্তর-পশ্চিম কোণে গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ ও একটি পুকুর আছে। উহাকে লোকে নয়া বা নূতন বাড়ী ও তৎসংলগ্ন পুকুর কহে। সম্ভবতঃ এই স্থানে সীতারামের কোন স্ত্রীর আবাস ছিল। এক কালে এই নয়াবাড়ীতে নড়াইলের জমিদারী কাছারি স্থাপিত হইয়াছিল।

দুর্গ মধ্যে আরও নানাস্থানে জঙ্গলের মধ্যে ধ্বংস-স্তূপ আছে। কিন্তু দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও শ্বাপদ-সঙ্কুল বলিয়া সে সকল স্থানে যাওয়া যায় না, এবং সে সকল স্থানে কোথায় কি ছিল তাহা লোকে জানে না।

পাগল

(কবীর)

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

সবাই দেখ্‌ছি পাগল, ধিক্! ছি! গোটা জগৎ পাগল যে!
সাঁচ্চা কইলে মার্‌তে ধাইছে, চাইছে ঝুঠা নকল কে।
হিন্দু কইছে "আমার যে রাম", "রহীম" গাইছে মুসলমান;
জান্‌লনা কেউ মরম, দিচ্ছে লড়াই করে'ই দু'দল জান্।
ঘর ছেড়ে হায় পালায় দুঃখে মুসলমানের মেহের, আর
হিন্দুর দয়া; একজন 'বলি', তিনজন কর্‌লেন 'জবাই' সার!
আগুন লাগ্‌ল দু'য়ের ঘরেই, নিজ্‌রাই আগুন লাগাচ্ছে;
ঠাট্টার হাসি হেসে' বৃথাই আমার পানে তাকাচ্ছে।
ওরা ভাব্‌ছে—ন্যায়না ওরা; কবীর ভাব্‌ছে—পাগল যে।...
ওরা, কবীর, এদের মধ্যে, বল্‌বে, সত্যি পাগল কে?

বিবিধ-প্রসঙ্গ

পল্লী-সংস্কার ও সংগঠন

শ্রীগুরুসদয় দত্ত এম-এ, আই-সি এস্

মানব যেমন স্বীয় শৈশবকাল দোলায় অতিবাহিত করিয়া পুষ্টিলাভ করে, তেমনই জাতীয় জীবনের শৈশব পল্লীগ্রামের ক্রীড়াভূমিতে অতিবাহিত হয়। পল্লীবাসিগণের সমৃদ্ধি ও মঙ্গলের উপরেই জাতির শক্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। এই কথা জগতের সকল দেশের পক্ষেই খাটে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে ইহা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। বঙ্গদেশের সমগ্র অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৯৩ জনের অধিক পল্লীগ্রামে বাস করে। বর্ত্তমানে এই সকল পল্লীগ্রাম অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। পল্লীবাসিগণের অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, রোগ ও পরস্পর বিবাদে তাহাদের দুর্গতির চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়াছে। পল্লীগ্রামসমূহের এই দুর্গতি ও অবনতিই আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি ও মঙ্গলের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবনতি ও দুর্গতির কারণ কি, এবং কি প্রকারেই বা ইহার প্রতীকার করা যাইতে পারে? এই কারণ ও প্রতীকারের উপায় নির্ণয় করিতে হইলে, যে সকল বিধানে সামাজিক ক্রমবিকাশ ও উন্নতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, সেই সকল বিধান ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ এই বিষয়কে কেবল রাজনীতির দিক হইতে দেখিয়া থাকেন। কেহ বা সমাজনীতির সাহায্যে ইহার মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হন। আবার অনেকে স্বাস্থ্য বা শিক্ষার দিক হইতে এই সমস্যার সমাধান করিতে চান। কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে ইহা প্রতীতি হয় যে, এই কয়টী উপায়ের একটীর দ্বারাও এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ ও প্রকৃত সমাধান হইতে পারে না; ইহা প্রকৃত-প্রস্তাবে জীবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। এই বিষয়ে যে গভর্ণমেণ্টের কোন কর্ত্তব নাই, তাহা বলিতেছি না। তাহা হইলেও, আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতিকর উপায় আমাদিগকেই অবলম্বন করিতে হইবে।

ইহা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক যে, কেবলমাত্র উপর হইতে সরকারের হুকুম জারি হইলে, অথবা বহু গবেষণা সহকারে উদ্ভাবিত স্বাস্থ্যরক্ষা বা শিক্ষা বিস্তারের কোন প্রণালী সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইলেই, এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না। আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য যে, মনুষ্যসমূহের যে সমষ্টিকে সমাজ নামে অভিহিত করা যায়, তাহার একটা প্রাণ আছে—তাহা জীবন্ত, তাহা জড়পদার্থ নহে। একটী সমগ্র জাতি এই প্রকার একটী সজীব সমষ্টি; ইহার অন্তর্ভুক্ত এই প্রকারের ক্ষুদ্রতর বহু সমষ্টির একত্র অবস্থানের জন্যই জাতির গঠন ও কার্য্যপ্রণালী জটিল হইয়াছে। এই সকল অন্তর্ভুক্ত সমষ্টির নিম্নতম স্তরে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আমাদের পল্লীসমাজ। সামাজিক সমষ্টির মধ্যে ইহাই ক্ষুদ্রতম; সুতরাং প্রত্যেক পল্লীকে একটী জীবন্ত সমষ্টি বলিয়া ধারণা করিতে হইবে। ধারণা করিতে হইবে যে, পল্লীর মধ্যে প্রাণ আছে; অথবা আমরা চেষ্টা করিলে মৃত পল্লী-সমষ্টিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারি, মৃতদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারি।

এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, উপকার যদি প্রকৃত-প্রস্তাবে স্থায়ী করিতে হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র বাহির হইতে বা উপর হইতে রোগের উপসর্গসমূহের উপশমকারী ঔষধ প্রয়োগ করিলে চলিবে না;—সেই প্রাণকে শক্তি ও ক্ষমতা দিতে হইবে, যে প্রাণ ভিতর হইতে প্রাণীর স্বাস্থ্য, শ্রী ও সমৃদ্ধি গড়িয়া তুলিতে পারে।

বাহির হইতে অপর লোকের চেষ্টায় পল্লীগ্রাম 'উদ্ধার' করিবার কথা শুনিলে মনে এই ধারণার উদয় হয়, যেন পল্লীসমাজ জড়পদার্থ মাত্র, যেন বাহির হইতেই কোন ব্যবস্থা প্রয়োগ করিলে পল্লীগ্রামকে রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, বাহির হইতে আমরা কেবল পল্লীসমাজগুলিকে বাঁচিয়া থাকিতে ও সমৃদ্ধ হইতে সাহায্য করিতে পারি; কিন্তু এই বাঁচিয়া থাকার জন্যই সমাজের অন্তঃস্থিত প্রাণটীকে জাগ্রত রাখিবার প্রয়োজন, যাহাতে সেই প্রাণ বাহির হইতে সাহায্য আহরণ করিয়া নিজের কাজে লাগাইতে পারে, এবং বাহির হইতে কোন ব্যবস্থা প্রয়োগ করিলে পল্লীসমাজের ভিতরে তাহার সাড়া পাওয়া যায়। পল্লীসমাজের মধ্যে যদি সেই প্রাণের অস্তিত্ব কোথাও না থাকে, তাহা হইলে বাহিরের কোন চেষ্টায় পল্লীসমাজের মধ্যে কোন সাড়া পাওয়া যাইবে না; এবং পল্লীর উন্নতিকল্পে বাহির হইতে প্রযুক্ত যাবতীয় চেষ্টা পরিণামে ব্যর্থ হইবে। সুতরাং এই কথা পুনরায় বলিতেছি যে, গ্রামবাসিগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া, গ্রামে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, যাহাতে তাহারা গভর্ণমেণ্ট বা অন্য কোন তরফ হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, সেই অবস্থার সৃষ্টি করিতে না পারিলে, পল্লীবাসিগণকে রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব।

এখন দেখিতে হইবে, পূর্ব্বে যে সকল সজীব সমষ্টির কথার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার লক্ষণ কি? এই সমষ্টির প্রত্যেক অংশ সংঘবদ্ধ, ও সমষ্টির অন্তঃস্থিত প্রাণ সকল অংশেই পরিব্যাপ্ত। ইহার অস্তিত্ব যে ইহার বিভিন্ন অংশের সম্মিলনের উপর নির্ভর করে, তাহা অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। ইহার এমন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকা চাই, যাহা দ্বারা ইহা সমগ্র সমষ্টির এবং প্রত্যেক অংশের মঙ্গলের ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারে। এই সাধারণ মঙ্গল লাভের ব্যবস্থা নির্ণয় করিতে ও তদনুরূপ কার্য্য করিতে যে বিচারবুদ্ধি ও কার্য্যকরী শক্তির প্রয়োজন, তাহাও চাই।

এক সময়ে ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামে এই প্রকার প্রাণ বর্ত্তমান ছিল। পুরাতন ভাবতে পল্লীসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ ও কার্য্যকরী ছিল। তাহাতে সামাজিক জীবনের আবশ্যক যাবতীয় কার্য্য সকলে একত্র হইয়া সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহ করিত। সেই সকল পল্লীসমাজের হয় ত কোন না কোন দোষও ছিল; কারণ, তাহা যে জাতিভেদ ও ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা আধুনিক অবস্থার উপযোগী নহে। কিন্তু যত দিন আমাদের সেই পুরাতন পল্লীসমাজগুলি বর্ত্তমান ছিল, তত দিন তাহাদের দ্বারা গ্রামের অভাব দূর করা এবং উন্নতির ব্যবস্থা করা—এই দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল।

সেই সকল পল্লীসমাজ সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পাইয়াছে। এই লোপ পাইবার কারণ এত বহু সংখ্যক ও এত জটিল যে, আপাততঃ তাহা বুঝাইয়া বলা অসম্ভব; কিন্তু সেই পুরাতন পল্লীসমাজগুলি যে লোপ পাইয়াছে, ইহা ধ্রুব সত্য। আমাদের দেশের মধ্যে গ্রাম আছে এবং প্রতি গ্রামেই কতকগুলি মনুষ্য বাস করে; কিন্তু যাহাকে পল্লীসমাজ বা পল্লীবাসীর সঙ্ঘবদ্ধ সমষ্টি বলা যাইতে পারে, এখন আর তাহা কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

পুরাতন পল্লীসমাজগুলি কালক্রমে ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত পল্লীবাসিগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় এক গ্রামেই পরস্পরের নিকট বাস করে সত্য; কিন্তু সমগ্র গ্রামের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়া একত্র এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। মিলন ও একতার পরিবর্ত্তে প্রকৃত প্রস্তাবে যাহা আমরা দেখিতে পাই, তাহাকে এক গ্রামের অধিবাসিগণের মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধের অবস্থা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোথাও বা প্রকাশ্য যুদ্ধঘোষণা না করিয়া গ্রামবাসিগণ পরস্পরের সহিত অ-সহযোগিতা করিয়া বসিয়াছে; ইহাতেও পরস্পরের যুদ্ধের ন্যায় পল্লীবাসীদের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, আমাদের পল্লীগ্রামগুলি মনুষ্যজাতির চিরশত্রু—দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও রোগের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যুগের পর যুগ ধরিয়া মনুষ্যজাতি এই সকল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে; এবং ইহাদেরই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমাজ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু মনুষ্যজাতির এই সকল চিরন্তন শত্রু ত বর্ত্তমান রহিয়াছেই—উপরন্তু পূর্ব্বকালে ভারতের পল্লীগ্রামগুলি জগতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন ও আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ থাকাতে যে সুবিধা ভোগ করিত, তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ফলে, পৃথিবীর শিল্পবাণিজ্য দেশসমূহের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত কৃষক ও শিল্পীদের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের পরস্পরের সহিত বিযুক্ত হীনবল কৃষকগণ দাঁড়াইতে পারিতেছে না। এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকেও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। সুতরাং ইহা বুঝা যায় যে, আমাদের পল্লীগ্রামসমূহকে এবং সমগ্র জাতিকে দুই প্রকারের সংগ্রামে নিযুক্ত হইতে হইবে। একটী দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও রোগের সহিত—অপরটী নানাদেশের নানাপ্রকার শিল্প ও বণিক-সঙ্ঘের সহিত। এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে, আমাদের পল্লীগ্রামগুলিকে সজীব করিয়া পুনর্গঠন করিতে হইবে—অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রাম বা কয়েকটী গ্রামের মণ্ডলীর জন্য এমন এক একটী সমিতি গঠন করার প্রয়োজন, যাহা একত্র হইয়া সাধারণের হিতকর বিষয়ের আলোচনা করিবে; এবং সরকার ও অন্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নির্দ্ধারিত উপায় অনুসারে কার্য্যের ব্যবস্থা করিবে; এই সকল সমিতির সাহায্যে গভর্ণমেণ্ট অথবা জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ পল্লীর অধিবাসিগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধনসম্পত্তি ইত্যাদির উন্নতিকর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। পল্লীবাসিগণের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য এবং সাধারণ অভাবগুলি দূর করিবার জন্য আমাদিগকে "প্রতিবেশী-মণ্ডলী" গঠন করিতে হইবে।

এই সকল সমিতি তিন প্রকারের হইতে পারে। যথা:—

(ক) গভর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট আইনের দ্বারা অনুমোদিত ও উপযুক্ত কার্য্যকরী ক্ষমতাবিশিষ্ট শাসন-সমিতি।

(খ) পল্লীবাসিগণের ইচ্ছায় গঠিত সম্পূর্ণ বে সরকারী সমিতি।

(গ) আইনের বিশেষ বিধান অনুসারে গঠিত এমন সকল সমিতি, যাহার সভ্যগণ স্বেচ্ছায় সমিতির নিয়মানুসারে কাজ করিতে অঙ্গীকার করেন। সভ্যগণ ব্যতীত অপর কাহারও উপর এই সমিতির ক্ষমতা চলে না।

ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন কমিটী ইত্যাদি কয়েকটী শাসনসমিতি (ক) শ্রেণীর অন্তর্গত। পল্লীসংস্কার, কৃষি ও সামাজিক উন্নতির জন্য স্থাপিত "পল্লীসমিতি" (খ) শ্রেণীর উদাহরণ; এবং ঋণদান ও অন্য প্রকারের সমবায় সমিতিগুলি (গ) শ্রেণীর অন্তর্গত। বাহুল্য ভয়ে এই তিন প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতার তুলনা করিয়া আলোচনা করিলাম না। কিন্তু এই বিষয়ে আমার মত এই যে, উক্ত তিন প্রকারের সমিতি একত্র বর্ত্তমান থাকিয়া একই ক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করিলেই পল্লীবাসিগণের সম্পূর্ণ উপকার সাধিত হইবে।

বস্তুতঃ পল্লী-সংস্কারের কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ; এই কার্য্যক্ষেত্রকে নিম্নলিখিত মতে বিভাগ করা চলে:—

(ক) ধনবৃদ্ধি, (খ) স্বাস্থ্যের উন্নতি; (গ) শিক্ষার বিস্তার (ঘ) উৎসব ও আমোদের ব্যবস্থা; (ঙ) গ্রাম্য বিবাদের শালিসি নিষ্পত্তি।

ধনবৃদ্ধির জন্য চাই রাস্তা-ঘাটের উন্নতি, নূতন শিল্পের প্রচলন, কৃষি ও অন্য বর্ত্তমান শিল্পসমূহের উন্নতি এবং ঋণদান. কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য পল্লীবাসিগণকে সমিতিবদ্ধ করা। এই সকল কাজ সম্পন্ন করিতে হইলে বিজ্ঞান, শিক্ষা, সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রণালী এবং অর্থনীতির সাহায্য লইতে হইবে। এমন কি গ্রাম্য বিবাদসমূহের মীমাংসা করাও ধনবৃদ্ধির উপায়সমূহের মধ্যে গণনা

করা উচিত; কারণ, তুচ্ছ বিষয় উপলক্ষে মোকর্দ্দমা করিয়া অর্থের অপব্যয় পল্লীবাসিগণের দারিদ্র্যের একটী প্রধানতম কারণ।

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চাই—স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা এবং সেই সকল ব্যবস্থা কেহ লঙ্ঘন করিতে না পারে তাহার জন্য সমিতি গঠন।

শিক্ষার জন্য চাই—বালক, বালিকা এবং প্রাপ্তবয়স্কগণের জন্য সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা, সকলের জন্য কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা, গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় স্থাপন ও নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা।

শ্রীগুরুসদয় দত্ত এম-এ, আই-সি-এস্

সকল দেশেই দেখা যায় যে, পল্লীগ্রামে আমোদ প্রমোদের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকাই অবস্থাপন্ন লোকদিগের পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে আসিবার অন্যতম কারণ। সুতরাং পল্লীবাসীদের জীবনকে আনন্দময় করিবার জন্য উপযুক্ত আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন।

এই সকল কাজ করিবার জন্য প্রতি গ্রামে বা কয়েকটী গ্রাম মিলিত হইয়া একটী সমিতি গঠন করা আবশ্যক। সম্ভব হইলে তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য জেলায় একটী প্রধান সমিতি এবং কলিকাতায় একটী কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপন করা আবশ্যক। এই সকল সমিতি ডিঃ বোর্ড এবং সরকার হইতে সাহায্য লাভ করিবে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন ইংলণ্ডের পল্লীজীবন পুনর্গঠন ও উন্নত করিবার জন্য সেই দেশের প্রধান প্রধান জননায়কগণ নানাপ্রকার সমিতি গঠন করিয়া যে আন্দোলন করিতেছিলেন তাহা দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলাম। পল্লীজীবনের প্রতি জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করিবার জন্য তাঁহারা কৃষিকার্য্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছিলেন; শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা যাহাতে পল্লীগ্রামে থাকিয়া কৃষিকার্য্য করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেছিলেন; বর্ত্তমান গৃহশিল্পের উন্নতি ও নূতন গৃহশিল্পের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন; Oxford ও Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যে নানা পল্লীগ্রামে বিবিধ বিষয়ের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, পল্লীজীবন চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য আমোদ প্রমোদ ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের গ্রাম্যসমিতির এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার জন্য আরও অনেক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে; যথা—Workers' Educational Union, ও Women's Institute। জাপানেও দেখিলাম যে গ্রামে গ্রামে কৃষিসমিতি গঠিত হইয়াছে ও যুবকেরা গ্রাম্য সমিতি গঠন করিয়া নিজ নিজ গ্রামে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ড ও জাপানের ন্যায় শিল্পপ্রধান দেশেও যদি এই প্রকার গঠনমূলক কার্য্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে ভারতবর্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বেশী। কারণ, এই দেশে অধিক লোক গ্রামে বাস করে এবং জাতীয় ধনের অধিকাংশ গ্রামেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং পল্লীজীবনের উন্নতি বিষয়ে আমরা উদাসীন হইয়া থাকিলে জাতীয় জীবনের অবনতি অনিবার্য্য।

বর্ত্তমান অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? প্রথমতঃ যুবক ও বৃদ্ধ সর্ব্বশ্রেণীর লোকের চিন্তা ও মনোযোগ এই বিষয়ে প্রযুক্ত হওয়া উচিত। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এ যাবৎ দেশের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি প্রণালীবদ্ধ ভাবে এ বিষয়ে তাঁহাদের চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করেন নাই। পল্লীজীবন পুনর্গঠনের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, তাহার নিম্নতম স্তরে এক একটী গ্রামের শাসনপ্রণালীর আলোচনা করা আবশ্যক। গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক প্রচলিত আইন অনুসারে

প্রাথমিক শিক্ষা, ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এবং যাতায়াতের পথ নির্ম্মাণ ও সংরক্ষণের জন্য গ্রাম্য সমিতি (Union Board) গঠন করা যাইতে পারে। আমি শুনিয়াছি যে, এই প্রদেশের নানা অংশে—বিশেষতঃ ঢাকা, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায়, এই প্রকার গ্রাম্য সমিতির কাজ বেশ ভাল হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই সকল সমিতির প্রকৃতি ও কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধে ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, দেশের অনেক লোক ইহা অনুমোদন করেন না। এই শ্রেণীর লোকদিগের নিকট আমার ইহাই বক্তব্য যে, যে সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য গ্রাম্য সমিতি (Union Board)স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী যে একটা বন্দোবস্ত থাকা উচিত, ইহা ত কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। পল্লীগ্রাম-সমূহকে আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সমগ্র দেশে, প্রদেশে—এমন কি সমগ্র জেলায় কেবল সুশাসনের ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। পল্লী-গ্রামের ছোট ছোট দৈনন্দিন কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিবার জন্য, গ্রাম্য পাঠশালার সুব্যবস্থার জন্য, দরিদ্র ও পীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ মোচনের জন্য, গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার জন্য, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য, গ্রামবাসিগণের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ করিবার জন্য এবং সর্ব্বশেষে তাহাদের ছোট ছোট বিবাদের আপোষ নিষ্পত্তির জন্য গ্রামের মধ্যে যথোচিত ব্যবস্থার প্রয়োজন।

এই সকল কাজ সরকারের দ্বারা সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব। অর্থের দ্বারা, উপদেশের দ্বারা এবং বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর দ্বারা এই সকল বিষয়ে সাহায্য করা সরকারের কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, গ্রামের মধ্যে এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহের কোন রীতিমত ব্যবস্থা না থাকায়, সরকারের সেই সকল সাহায্য ব্যর্থ হইতেছে। দুঃখের বিষয় যে, গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনের যে একটা রীতিমত ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন, তাহা আমাদের দেশের লোক সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছেন না। জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এবং জল সরবরাহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ইত্যাদি সমস্যার মীমাংসার জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা না হইলেই চলে না। ইয়োরোপের সভ্য দেশসমূহে গত ৭০।৭৫ বৎসরের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসনের উন্নতির দ্বারা সেই সকল দেশের অধিবাসিগণের পরমায়ু পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। যে সকল রোগ অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে, তাহাতে আক্রান্ত হইয়া আমাদের দেশের অনেক লোক মারা যায়। এই অকালমৃত্যু আমাদের জাতীয় উন্নতির একটী প্রধান অন্তরায় এবং ইহা দূর করিতে হইলে গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনের সুবন্দোবস্ত করা একান্ত আবশ্যক।

বঙ্গদেশের জনসাধারণ বা তাহাদের কোন সম্প্রদায় যদি গ্রাম্য সমিতি (Union Board) বিষয়ক বর্ত্তমান ব্যবস্থার অনুমোদন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান ব্যবস্থার দোষ সংশোধন করিয়া, আমাদের অবস্থার উপযোগী উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার আবিষ্কার করুন। কিন্তু আমাদের পল্লীবাসি-গণকে ও সমগ্র জাতিকে আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য কোন না কোন ব্যবস্থা করা অতীব আবশ্যক। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের এবং যাঁহারা রাজনীতি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের তত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে গবেষণা, আলোচনা ও পরীক্ষা করিবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে। জাতির উন্নতির জন্য বালক ও বালিকা-দিগের সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং উপযুক্ত শিল্পশিক্ষা আবশ্যক বটে; কিন্তু কেবলমাত্র সরকারের দ্বারা এই দুই বিষয়ের ব্যবস্থা হইতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইলে, গ্রামে গ্রামে তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য গ্রাম্য সমিতির সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

এখন পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সমিতির কথা বলিব। সমবায় সমিতি ও গ্রাম্য আলোচনা সমিতি গঠন করিয়া যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই আপন আপন গ্রামের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারেন। দেশের সকলেই এই গঠনমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমিতি, মণ্ডলী, মঠ ইত্যাদি গঠনে প্রবৃত্ত হউন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি এবং ধনবৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্য্যের অসীম ক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। গ্রামে গ্রামে সমাজের নানাবিধ হিতসাধনের জন্য সমিতি গঠন করুন, কৃষিকার্য্য ও অন্য উপায়ে ধনের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য সমিতি স্থাপন করুন, যাঁহারা পরস্পরের নিকট বাস করেন, তাঁহারা একত্র হইয়া প্রতিবেশী মণ্ডলী গঠন করুন এবং সমবায় সমিতি গঠন করিয়া ঋণগ্রহণের, কৃষি ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ও বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করুন। পূর্ণবয়স্ক লোকদের শিক্ষার ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য এই প্রকার সমিতির সাহায্যে পল্লীবাসী কৃষক ও শিল্পীর নিকট বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল উপস্থিত করিতে পারা যাইবে। সমবায় সমিতির সাহায্যে কৃষিকার্য্য ও অন্যান্য শিল্পের জন্য যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা করা যাইবে এবং সরকার, জেলাবোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যাইবে।

রায় গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের নেতৃত্বে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রতিষেধক যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে, গ্রামের লোকেরা সমবায় প্রণালীতে একতাবদ্ধ হইলে উত্তম কাজ হইতে পারে। আমি আপনাদিগকে রায় বাহাদুরের প্রণালী অনুসারে গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য সংরক্ষণী ও ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছি। বাঁকুড়া ও বীরভূম জিলার যে জল সরবরাহ সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই প্রদেশের নানা স্থানে ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত যে সকল সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিলে কৃষি-কার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি সম্ভবপর। পল্লীবাসিগণ একতাবদ্ধ হইয়া জলসেচন ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনায়াসে সহস্র সহস্র টাকার সংস্থান করিতে পারে। এই সকল জলসেচন সমবায় সমিতির চেষ্টায় স্থানীয়

স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং নানাবিধ রোগের প্রকোপ হ্রাস হইয়াছে।

এই সকল জেলার অবনতি এই উপায়ে নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত পল্লীবাসিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এই প্রকার সমিতি গঠন করিতে হইলে অনেক অ-বৈতনিক কর্ম্মীর প্রয়োজন। বীরভূমে রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, ও বাঁকুড়ায় শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রচেষ্টার উন্নতিকল্পে যাহা করিতেছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশা করি, দেশের অন্যান্য স্থানের কর্ম্মীগণ তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

বঙ্গীয় স্বাস্থ্যসংরক্ষণ-সমিতির নেতা ডাঃ ভট্টাচার্য্যের চেষ্টার ফলে ইহা প্রমাণিত হয় যে, সম্পূর্ণ বে-সরকারী সমিতিও প্রণালীবদ্ধ ভাবে পরিচালিত হইলে, দেশের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতে পারে। গত গ্রীষ্মকালে যখন বীরভূম জেলার নানাস্থানে ভীষণ কলেরা রোগের আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন এই সমিতি কি প্রকার কাজ করিয়াছিলেন, তাহা সকলে অবগত আছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া শত শত শিক্ষিত যুবকও কোদালি লইয়া স্বহস্তে জলাশয় খনন ও কূপ পরিষ্কার করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে এই প্রকারের উদ্যম ও এই প্রকারের সমিতির বিশেষ প্রয়োজন। কর্ম্মবীর ডাঃ ডি, এন, মৈত্র মহাশয়ের নেতৃত্বে বঙ্গীয় 'হিত-সাধন-মণ্ডলী' যে কাজ করিতেছেন, তাহার দ্বারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পল্লীসেবাতে প্রচার কার্য্যের উপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে এই মণ্ডলীর শাখা গঠন করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। ডাঃ মৈত্রের প্রতিষ্ঠিত 'হিত-সাধন-সঙ্ঘে' সমাজসেবাবিষয়ক বক্তৃতা এবং কর্ম্মিগণের উপদেশের জন্য নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গের পল্লীসমূহকে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহারা এই সকল ক্লাসে যোগদান করিয়া সমাজ-সেবা-রূপ মহৎ কাজের জন্য আপনাদিগকে প্রস্তুত করুন।

অপরের কাজের সমালোচনা না করিয়া এবং সরকারের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করিয়া নিজেরা গঠনকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। এই সকল বিষয়ে সাহায্য করা সরকারের কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই; বঙ্গীয় ম্যালেরিয়া-নিবারণী-সমিতি ও অন্যান্য সমিতির কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় ও উল্লিখিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ সরকারের সাহায্যের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন নাই। সমিতি গঠন করুন—সর্ব্বান্তঃকরণে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন—প্রয়োজনীয় অর্থের কখনও অভাব হইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সমবায় প্রণালীতে কাজ করিবার যথেষ্ট সুযোগ আছে। এ বিষয়ে Finland দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। যখন তাহারা দেখিল যে, তাহাদের দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিতেছে—এবং জগতের অন্যান্য জাতির তুলনায় তাহাদের দেশ পিছাইয়া পড়িতেছে, তখন তাহারা দেশকে সমবায়-প্রণালীতে সংগঠন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল; এবং যত দিন পর্য্যন্ত না সমস্ত দেশকে উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য সমবায়-প্রণালীতে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশের অবনতি নিবারণ করিল ও দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিতে পারিল, তত দিন তাহারা বিশ্রাম করে নাই।

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী'র অন্তর্গত 'শ্রীনিকেতনে'র পল্লীসংস্কার বিভাগে পল্লীগ্রামের অবনতির কারণ আলোচিত হইতেছে এবং পাঠশালার শিক্ষকগণকে ও ব্রতী বালকগণকে (Village Scouts) পল্লীসংস্কার কার্য্যে দীক্ষিত করা হইতেছে, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। এই সকল শিক্ষক ও বালকেরা Scouting, বস্ত্রবয়ন, কৃষি ও অন্যান্য গৃহশিল্পে শিক্ষালাভ করিতেছেন। আশা করি যে, জেলা-বোর্ড ও গ্রাম্য সমিতিসমূহ শিক্ষক ও বালকদিগকে পল্লীসংস্কার কার্য্য শিক্ষা দিবার এই সুযোগ অবহেলা করিবেন না। পল্লীগ্রামের নিম্নপ্রাথমিক ও মধ্য ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মনে কৃষিকার্য্য ও নানাবিধ গ্রাম্যশিল্পে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

পল্লী-সংগঠন প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে অর্থনীতির দিক হইতে দু'একটী কথা বলা উচিত। পল্লীর শিল্পসমূহের অবনতিই পল্লী-গ্রামের অবনতির প্রধান কারণ। সেই সকল শিল্পের মধ্যে কৃষি কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান। পল্লীসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে ও জাতির উন্নতি করিতে হইলে এই কথা আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে গ্রাম্যশিল্পের মধ্যে কৃষি কার্য্যই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম। পল্লীগ্রামগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে কেন? লোকে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে যাইতেছে কেন? কারণ, কৃষিকার্য্যে ও অন্যান্য গ্রাম্যশিল্প যথেষ্ট অর্থাগম হয় না। সুতরাং এই সকল শিল্প যাহাতে অর্থকরী হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই সকল শিল্পের উন্নতি করিবার একটী মাত্র উপায় আছে,—বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর প্রবর্ত্তন ও উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্য দুইটী উপায়ে সাধিত হইতে পারে। পল্লীবাসিগণকে এরূপ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে; এবং তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া উপযুক্ত অর্থ পাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয় উপায় এই যে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষি ও অন্যান্য শিল্পকার্য্য অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কাজ চালাইবেন। আমি দেশের শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে বারংবার এই কার্য্যে আহ্বান করিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা মনে করেন ইহাতে তাঁহাদের সম্মানের হানি হইবে। আত্মসম্মানের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে হইবে। এবং কায়িক পরিশ্রমের প্রতি মর্য্যাদাই যে জাতীয় উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ, এই কথা শিক্ষিত যুবক-বৃন্দের মনে বদ্ধমূল করিতে হইবে। সুতরাং আপনাদের প্রতি আমার এই উপদেশ যে, যদি আপনারা পল্লীসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে এবং দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিতে চাহেন, তবে সরকারী চাকরীর জন্য লালায়িত না হইয়া যাহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি হয় সেইজন্য কৃষি ও শিল্প ইত্যাদি ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। ইহাতে আপনারা

ব্যক্তিগত ভাবে ধনলাভ করিবেন—দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে—জাতীয় জীবন উন্নত হইবে এবং পল্লীগ্রামের সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিবে।

যত দিন দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত না হইবেন, ততদিন কৃষিকার্য্যের প্রধান অন্তরায়গুলি দূর হইবে না। কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজন—বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর প্রয়োগ, কায়িক পরিশ্রম লাঘব করিবার যন্ত্রাদির ব্যবহার, কৃষিজাত দ্রব্য বহুল পরিমাণে উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা, ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রকে একত্রীকরণের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই সকল অন্তরায় দূর না হইলে কৃষিকার্য্য হইতে যতদূর ফললাভ করা সম্ভব তাহা পাওয়া যাইবে না। মনে রাখিবেন যে, কৃষিকার্য্যের উন্নতি ব্যতীত দেশের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না—ইহার অন্য উপায় নাই। তৈত্তীরিয় উপনিষদের কবি যাহা বলিয়াছেন তাহা মনে রাখিবেন—"অন্নং বহু কুর্ব্বীত, তদ্ ব্রতং।" যত দিন পর্য্যন্ত দেশের সকলেই কোন না কোন উপায়ে ধনবৃদ্ধি করিতে নিযুক্ত না হইবেন, তত দিন পর্য্যন্ত দেশের উন্নতি ও পল্লীগ্রামের শ্রীবৃদ্ধির আশা দুরাশা মাত্র। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কি কোন না কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অথবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া যদি আমাদের জাতীয় আত্মশ্লাঘায় আঘাত দিই—তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন; কিন্তু সত্যের খাতিরে উত্তর দিতে হয়—না। চারিদিকে কেবল আলস্য এবং উকালতি করিবার বা সামান্য সরকারী চাকরী পাইবার ব্যগ্রতাই দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ব্যতীত দেশে অনেক সুস্থ ও সবলকায় ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কৃষি বা শিল্প কোনটাই অবলম্বন না করিয়া পরের গলগ্রহ রূপে অপরের উপার্জ্জিত অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন। সম্ভবতঃ আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থাই এই শ্রেণীর আলস্যের প্রশ্রয় দেয়;—অবিলম্বেই ইহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। কারণ ইহা ধ্রুব সত্য যে যদি কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত বহুসংখ্যক লোক আলস্যে দিন যাপন করে, তাহা হইলে সেই জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। ইহা আমার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি। কয়েক দিন মাত্র হইল একটী প্রধান Municipalityর Chairman আমার নিকট আসিয়া তাঁহার একটী আত্মীয়কে ৩০৲ টাকা বেতনে Demonstrator নিযুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করিতেছিলেন—এই আত্মীয়টী সরকারী কৃষিবিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছিল। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, তাঁহার আত্মীয় যে প্রকার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—তাহাতে কৃষিকার্য্য অবলম্বন করাই তাঁহার পক্ষে বিধেয় এবং ইহার জন্য সামান্য কিছু জমী ও কিছু মূলধন ব্যতীত আর কিছুই আবশ্যক নাই। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন যে, জমী বা মূলধনের অভাব হইবে না; কিন্তু উক্ত আত্মীয় বা তাঁহার পিতামাতা এই প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইবেন না, এমন কি তাঁহাদের নিকট এই প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সাহসও তাঁহার নাই। ৩০৲ টাকা বেতনের চাকরী পাইবার জন্য তাঁহারা কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই বাক্যালাপের সময় Director of Agriculture মহাশয় উপস্থিত ছিলেন—তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ যুবকটীকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত কোনও কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষানবীশ করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ঐ যুবক ও তাহার পিতামাতার কৃষিকার্য্যে আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না। এই প্রকারের অনেক অভিজ্ঞতা আমার ঘটিয়াছে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, জমীদারগণ তাঁহাদের শিক্ষিত পুত্রের জন্য ৫০৲ টাকা বেতনের চাকরী যোগাড় করিতে উদ্‌গ্রীব—অথচ তাঁহাদের নিজের জমীদারীতে কৃষির অভাবে জমী পতিত রহিয়াছে এবং তাঁহাদের শিক্ষিত পুত্রেরা চেষ্টা করিলে অনায়াসে কৃষিকার্য্যের উন্নতি এবং জমীদারীর আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের যুবকগণ এমন কাজ চাহেন যাহাতে, যতই কম হউক না কেন, একটা মাসিক আয় অবধারিত আছে। কোন প্রকার ধন উৎপাদন করিবার নিমিত্ত যে উদ্যম, উৎসাহ, প্রবৃত্তি ও উদ্যোগের প্রয়োজন, তাহার তাহাদের একান্তই অভাব। প্রাচীন শাস্ত্রকারের বচনে তাঁহাদের এতই আস্থা যে, ধ্রুব আয় ছাড়িয়া কিছুতেই তাঁহারা অধ্রুবের সন্ধানে যাইতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে পঞ্চাশ হইতে একশত টাকা বেতনের জন্য চিরজীবন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করা বরং ভাল; তথাপি নিজের মানসিক ও শারীরিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের সুব্যবহার করিয়া উক্ত বেতনের দশগুণ বা শতগুণ উপার্জ্জন করার যে সম্ভাবনা আছে, সামান্য অনিশ্চয়তার জন্য সেই পথ অবলম্বন করা কিছুতেই শ্রেয়ঃকর নহে। সুতরাং ধনলাভের এই সকল উপায় হয় অশিক্ষিত গ্রামবাসিগণের না হয় উদ্যমশীল বিদেশীয়গণের করায়ত্ত হয়। কৃষি ও অন্যান্য ছোট ছোট শিল্প সম্বন্ধে এই কথা খাটে।

কোনও শিক্ষিত যুবককে দর্জ্জির কাজ, জুতা প্রস্তুত করা বা ছুতারের কাজ শিক্ষা করিতে বলিলে, তিনি শিক্ষিত বলিয়াই তাহাতে অসম্মত হ'ন। কিন্তু অন্যান্য দেশে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে এই সকল ব্যবসায় পরিচালিত হইতেছে বলিয়াই, তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দেশের কয়জন লোক কর্ম্মহীনতার সমস্যা, দারিদ্র্য সমস্যা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্যা এই দিক হইতে মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন? প্রকৃত প্রস্তাবে দেশে অধিক পরিমাণে ধন উৎপাদিত না হইলে দারিদ্র্য ও রোগ কিছুতেই নিবারিত হইবে না। অতএব আপনাদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে সকলে সমবেত ভাবে চেষ্টা করিয়া আমাদের সহর ও পল্লীগ্রাম সমূহের অলস ব্যক্তিগণকে ধনবৃদ্ধির নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া এই অলস সম্প্রদায়ের সমূলে উচ্ছেদ-সাধনে প্রবৃত্ত হউন। সকলে এই প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত না হইলে দেশের ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, এবং ধনবৃদ্ধি ব্যতীত দারিদ্র্য ও রোগ নিবারণ করা যাইবে না। কৃষিকার্য্যের উন্নতি ব্যতীত ম্যালেরিয়া রোগকে সম্যক্‌রূপে নষ্ট করা যাইবে না। কারণ বিশেষজ্ঞদের মত এই যে কৃষিকার্য্যের অবনতিই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ।

জাপানের ন্যায় উন্নতিশীল দেশে পল্লীগ্রামের সমৃদ্ধির নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা করা হয়, তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি। মিনামী নাকাগুণ জেলার লোকেরা একপ্রকার বৃক্ষ উৎপাদন করিতেন এবং সেই কাষ্ঠের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। কিন্তু ঐ জেলার অধিবাসিগণ এই ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট না থাকিয়া রেশমের ব্যবসায়েও মনোনিবেশ করিয়াছেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ঐ জেলার একটিমাত্র পরিবারে 'পলু'র চাষ হইত। ঐ পরিবারের কর্ত্তা Yuchiর অধ্যবসায়ের ফলে এক ফর্দ্দ কাগজের উপরিস্থ ডিম হইতে প্রায় দশ সাড়ে সের গুটি প্রস্তুত হইয়াছিল। Yuchiর বয়স এখন প্রায় ৭০ বৎসর; তথাপি তিনি গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া এই আবশ্যকীয় বিষয়ে সকলকে উপদেশ দিয়া বেড়ান। তাঁহার চেষ্টার ফলে ঐ জেলায় এমন গৃহস্থ নাই, যাহার রেশম কীট পালনের জন্য একটি ঘর নির্দ্দিষ্ট নাই; এবং প্রতি গৃহস্থ গড়ে ৮।৯ সের গুটি উৎপাদন করেন।

রাসিয়ার সহিত যুদ্ধের অবসানকালে Jnahasi গ্রামের প্রধান ব্যক্তি Aichi স্বগ্রামবাসিগণকে এই উপদেশ দেন যে সকলে রেশমের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে ঐ গ্রামের আয় ৩০০০০ 'ইয়েন' বেশী হইতে পারে এবং সমগ্র দেশ এই পথ অবলম্বন করিলে জাপানের আয় ১০ কোটী 'ইয়েন' অধিক হইতে পারে। এই উপায়ে যুদ্ধের ঋণ সহজেই পরিশোধ হইতে পারে। ঐ গ্রামের লোকেরা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করাতে এখন গৃহে গৃহে রেশমের ব্যবসায় প্রচলিত হইয়াছে।

কি উপায় অবলম্বন করিয়া গ্রামের এবং সমগ্র জাতির ধনবৃদ্ধি করিতে পারা যায়, এবং কৃষকদের অবসরকালে অন্য ব্যবসায় দ্বারা অর্থাগমের ব্যবস্থা হয়, এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

যাঁহারা সহরে বাস করেন তাঁহারা অনেক সময় পল্লীসংগঠন বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়েন। তাঁহারা মনে করেন যে পল্লীর উন্নতি বা অবনতিতে তাঁহাদের কোন স্বার্থ নাই। এই ধারণা ঠিক নহে। সকল দেশেই দেখা যায় যে, পল্লীর সমৃদ্ধি এবং কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতির উপর সহরের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। অতএব কলকারখানার মালিক বা জমীদার, ব্যবহারাজীবী বা সংবাদপত্রের লেখক, ছাত্র বা শিক্ষক, আপনারা সকলেই সাবধান হউন। যত দিন পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্য বা অন্যান্য গৃহশিল্পের সম্পুর্ণ সুব্যবস্থা না হয়, এবং যত দিন জাতির প্রয়োজনের উপযোগী অর্থাগমের ব্যবস্থা না হয়, তত দিন আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিবেন না। এ কথা মনে রাখিবেন যে, পল্লীসমাজের পুনর্গঠন ও গৃহশিল্পের উন্নতি আমাদের জাতির উন্নতির একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ; ইহার সহিত সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছে। পল্লীসমাজকে পুনর্গঠিত করিতে হইলে ও গৃহশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে নহে, সামাজিক ও আর্থিক অবনতি এত বেশী এবং সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করা ও দেশের ধনবৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এত কঠিন বলিয়াই বর্ত্তমানকালে যাঁহারা এই সকল কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহারা স্বদেশসেবার সমধিক সুযোগ পাইবেন।

এখন প্রয়োজন এই যে দেশের সামাজিক, আর্থিক ও জাতীয় সমস্যগুলি যত্নসহকারে আলোচনা করিয়া আর্থিক উন্নতি ও ধনবৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে—যাহাতে আমাদের মধ্য হইতে অলস-সম্প্রদায় একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় এবং গৃহে গৃহে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা হয়।

আয়ুর্ব্বেদের সংস্কার না সংহার?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, ভিষক্‌শাস্ত্রী

(১)

কিছু দিন যাবৎ আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা, উন্নতি প্রভৃতি বিষয় লইয়া আলোচনা চলিতেছে। দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি একটী আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় গভর্ণমেণ্ট অদ্যাপি কোন সংকল্প প্রকাশ না করিলেও কলিকাতা কর্পোরেশন মহানগরীতে একটী আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

কিন্তু অমিশ্র আনন্দ বিধাতা আমাদের কপালে লিখেন নাই। আয়ুর্ব্বেদাকাশ এই নব দিবসের প্রথম কিরণচ্ছটায় আলোকিত হইতে না হইতেই, আশঙ্কার করাল জলদমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার প্রণালী লইয়া বিষম মতবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। মান্দ্রাজস্থ গভর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস মূর্ত্তি মহাশয় ইতোমধ্যেই (আয়ুর্ব্বেদ কন্‌ফারেন্সে) মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সমূহের সংস্কার করিয়া (বা করাইয়া) পঠনপাঠনাদি প্রচলন করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস মূর্ত্তি মহোদয়ের আয়ুর্ব্বেদে কতদূর অধিকার, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে তাঁহার কাপ্তেন উপাধি পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষার নিদর্শন—স্বীকার করিতেছি। বর্ত্তমানে আমরা কাপ্তেন মহাশয়ের মত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না; কারণ, তাঁহার সম্পূর্ণ বক্তৃতা পড়ি নাই, বা উচ্চ মন্তব্যের সমর্থনসূচক সমর্থিনী যুক্তি জানিতে পারি নাই। বিশেষতঃ, কাপ্তেন মহোদয় উক্ত মতের প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন। সুতরাং এই মতের আলোচনা করিতে হইলে মূল প্রবর্ত্তকগণের অনুসরণ আবশ্যক।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে আয়ুর্ব্বেদালোচনার সূত্রপাত শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিতগণের কীর্ত্তি। তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার ওয়াইজকে অগ্রণী বলা যাইতে পারে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসমূহ বহু পরিমাণে ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ এবং পুনঃ সংস্কার-সাপেক্ষ এই অভিনব মতের প্রবর্ত্তন ডাঃ ওয়াইজ না করিলেও, ইহার সূচনা বা ইঙ্গিত তিনিই তৎকৃত গ্রন্থে (Commentary on Hindu Medicine) করিয়া

যান। এই মতের প্রকৃত বীজ-বপন কর্ত্তা ডাক্তার রাডলফ্ হোর্ণলে, এম্ এ, পিএইচ-ডি, সি-আই ই। ইনি বর্ত্তমানে সুপ্রসিদ্ধ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক এবং বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত। তাঁহার ডাক্তার উপাধি পাণ্ডিত্যসূচক; চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব নাই। এই সাহেব পণ্ডিত মহোদয় কোন্ উদ্দেশ্যে আয়ুর্ব্বেদালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি তৎকৃত গ্রন্থে (Studies in the Ancient System of Hindu Medicine Vol. I, Osterology)—চরকাদি অন্য কোন আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতাকারই শারীরতত্ত্ব জানিতেন না বা বুঝিতেন না, সুশ্রুত কিঞ্চিন্মাত্র বুঝিতেন বটে কিন্তু তাহাও অসম্পূর্ণ এবং ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ, বিশেষতঃ, শরীরের বহির্ভাগ ব্যতীত অভ্যন্তরের বৃত্তান্ত সুশ্রুতও অবগত ছিলেন না—ইত্যাদি মহামূল্য তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। স্বীয় প্রতিভা বলে চরক সুশ্রুতের অভিনব অর্থোদ্ধার বা ব্যাখ্যা করিয়া সেই ব্যাখ্যার সহিত খ্যাতনামা পাশ্চাত্য-শারীরবিদ্যাবিদ্ ডাক্তার টমসন সাহেবের সাহায্যে পাশ্চাত্য-শারীরবিদ্যার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া, ডাক্তার হোর্ণলে এতাদৃশ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; এবং তিনি যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার দেশীয় শিষ্যগণ তাহা সযত্নে অঙ্কুরিত এবং পুষ্পিত করিয়া তুলিয়াছেন। [১] মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্-এ, এল্-এস্-এস (ইত্যাদি) কৃত 'প্রত্যক্ষ শারীরম্' 'সিদ্ধান্ত নিদানম্' প্রভৃতি গ্রন্থ সেই বীজোৎপন্ন মহাবৃক্ষের ফল।

বর্ত্তমানে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার্থিগণকে প্রাচীন চরক সুশ্রুতাদির পরিবর্ত্তে এই সকল এবং এতজ্জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থ সাহায্যে কৃতবিদ্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রাচীন সম্প্রদায় অবশ্য নব্য সম্প্রদায়ের এই অভিনব মতের বিরোধী এবং তজ্জন্যই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। এই মত-বিরোধের মীমাংসা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত প্রত্যক্ষ শারীরাদি গ্রন্থের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। সুত্রধার ডাঃ হোর্ণলের গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ শারীরাদি গ্রন্থ আলোচনা করিবার কারণ (১) হোর্ণলে সাহেব ডাক্তার বা কবিরাজ দুইয়ের কোনটীই নহেন; সুতরাং তাঁহার মত সাধারণ বৈষয়িকের (Layman) মত বলিয়া অনেকে উপেক্ষা করিতে পারেন; (২) তাঁহার গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় লিখিত এবং আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থিগণের পাঠ্য বিষয়ীভূত নহে; (৩) প্রত্যক্ষ শারীর গ্রন্থে হোর্ণলে সাহেবের বহু মতই গৃহীত হইয়াছে, এবং এই গ্রন্থ হোর্ণলে সাহেবের অনুমোদিত এবং উচ্চ প্রশংসাপ্রাপ্ত। (৪) বর্ত্তমানে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ-সংস্কার-প্রয়াসী বা তদুদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখিতেছেন, তাঁহাদের ইহা আদর্শ বা অবলম্বন স্বরূপ। অতএব প্রথমে আমরা "প্রত্যক্ষ শারীরম" নামক গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আলোচনার পূর্ব্বে দুইটী কথা বলা আবশ্যক। প্রথম কথা এই, আমরা ব্যক্তিগত ভাবে মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথের বিদ্বেষী নহি বরং কবিরাজ মহাশয়ের মত আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিই কামনা করি এবং এই প্রত্যক্ষ শারীর গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আমরা তাঁহার সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন। কবিরাজ মহাশয়ের মত আমরাও আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থিগণকে শারীরতত্ত্ব শিক্ষাদানের একান্ত পক্ষপাতী। কেবল তাহাই নহে, আমাদের দৃঢ় ধারণা, যে সকল কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের শল্য (Surgery and Midwifery) শালাক্য (Diseases of Ear, Nose, Throat etc.) প্রভৃতি অঙ্গের চর্চ্চা লুপ্ত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদের শারীরাংশের দুর্ব্বোধ্যতা বা অবোধ্যতা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। যেমন সর্ব্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা তত্তৎ ভাষার ব্যাকরণ-শিক্ষাসাপেক্ষ, সেইরূপ সর্ব্বদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র শারীর প্রকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র নহে, যাবতীয় শাস্ত্রেরই কতকগুলি নিজস্ব পরিভাষা আছে, সেই সকল সংজ্ঞা বা পরিভাষার সম্যক্ তাৎপর্য্য বোধ না হইলে, তত্তৎ শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ অসম্ভব। যে সকল সংজ্ঞা বা পরিভাষা-বাহুল্যে আয়ুর্ব্বেদ-গহন কণ্টকিত, তাহাদের মূল আয়ুর্ব্বেদের শারীর-প্রকরণেই প্রচ্ছন্ন এবং সেই সংজ্ঞা-প্রতিপাদ্য পদার্থের যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য অঙ্গের কথা দূরে থাকুক, কায় চিকিৎসা অঙ্গেও (Medicine) সম্যগ্ ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারে না; কেন না নিদান, সম্প্রাপ্তি (Etiology and Pathology) লক্ষণ প্রভৃতি বিবরণ উক্ত সংজ্ঞাসমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। দ্বিতীয় কথা এই, আমরা গ্রন্থের ভাষা, ব্যাকরণাশুদ্ধি এবং ঐতিহাসিক বা দার্শনিক অংশের কোন আলোচনাই করিব না, কেবলমাত্র শারীরাংশেই আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ থাকিবে।

(২)

'প্রত্যক্ষ শারীরম্' গ্রন্থের প্রারম্ভে দুইটী বিস্তৃত উপক্রমণিকা আছে। একটী ইংরাজী ভাষায়, অপরটী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সংস্কৃত উপক্রমণিকা (উপোদ্ঘাত) সমধিক বিস্তৃত। গ্রন্থকার এই দুইটী উপক্রমণিকার পর মূল গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের পর গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনাদি কতিপয় শ্লোকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী এই ঃ—

"ধান্বন্তরীয় মত মাকুলতামুপেতং, স্বচ্ছংপুনর্বিদধতা মৃতকান্ পরীক্ষ্য।
অগ্রন্থি সম্প্রতি ময়া নবকো নিবন্ধো,বান্ধা শ্রমস্য যদি তং শিরসানমামি।

অর্থাৎ ধন্বন্তরির মত বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে; মৃত (দেহ) পরীক্ষা (ব্যবচ্ছেদাদিসহকারে) করিয়া সেই মত পুনরায় নির্ম্মল করিতে আমি এই নূতন নিবন্ধ রচনা করিয়াছি, ইত্যাদি। গ্রন্থকার এ স্থলে মাত্র

[১] শ্রীযুক্ত চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত Interpretation of Ancient Hindu Medicine নামক একখানা গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভ এই ভাবে করা হইয়াছে ঃ—প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকারগণের কাহারও শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বা যথার্থ জ্ঞান ছিল না; যাহা ছিল, তাহাও স্থূল এবং শরীরের বহির্ভাগ বিষয়ক—ইত্যাদি। মূল ইংরাজী উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের ভার বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক মনে করিলাম।

ধন্বন্তরির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি আত্রেয়, পুনর্ব্বসু, অগ্নিবেশ, চরক এমন কি সুশ্রুতের নামও উল্লেখ করেন নাই। আমরা পূর্ব্বে ডাঃ হোর্ণলের প্রকটিত যে অদ্ভুত তত্ত্বের কথা বলিয়াছি, ইহা তাহারই অনুবাদ। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সুশ্রুত সংহিতাতে ধন্বন্তরির মতই নিবদ্ধ হইয়াছে; সুতরাং স্বতন্ত্র ভাবে সুশ্রুতের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন এবং চরক-সংহিতাপেক্ষা সুশ্রুতেই শারীর সমধিক বিস্তৃত, সেই জন্য চরকের কথা বলেন নাই। তাহার উত্তরে গ্রন্থকার-লিখিত ইংরাজী উপক্রমণিকা (Introduction) হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি ঃ— "Thus the sccalled Anatomy of all extant Ayurvedic texts including the summaries called Charaka and Sushruta Sanhita bristles, as a matter of fact, with omissions, interpolations and inaccuracies of ages and is neither Systematic nor descriptive" (P. 12) এই ইংরাজী রচনার পার্শ্বে গ্রন্থকার দুইটী টিপ্পনী (Marginal notes) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। The original works on Anatomy lost, Fanciful Anatomy took its place। উদ্ধৃত অংশের অর্থ এই ঃ চরক এবং সুশ্রুত সংহিতা নামক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থদ্বয় লইয়া প্রচলিত যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাবলীতে যে তথাকথিত শারীর (শরীর বিবরণ বা শরীর বিজ্ঞান) পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে স্খলন (চ্যুতি) প্রক্ষিপ্ততা এবং কালোচিত ভ্রান্তি সমূহে কণ্টকিত এবং সুশৃঙ্খলাবদ্ধও নহে, (বিশদ) বিবরণাত্মকও নহে। পার্শ্ব-টিপ্পনী দুইটীর অর্থঃ—শারীর সম্বন্ধীয় মূলগ্রন্থ সমূহ লুপ্ত হইয়াছে; তৎপরিবর্ত্তে কল্পনাবিজৃম্ভিত শারীরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্য অনায়াসেই গ্রহণ করা যায় যে, ধন্বন্তরির প্রকৃত মত প্রচলিত সুশ্রুত্য [২] গ্রন্থে বিকৃতরূপে প্রচারিত হইতেছে; তাহার নির্ম্মলতা সম্পাদনই প্রত্যক্ষ শারীরকারের উদ্দেশ্য। এক্ষণে গ্রন্থকার কি ভাবে এই মহাব্রতে ব্রতী হইয়াছেন দেখা যাউক।

উপোদ্ঘাতের (সংস্কৃত উপক্রমণিকার) ৭৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "ইদানীং শারীর প্রতিসংস্কারঃ ষোঢ়া সংবিধাতব্যঃ" ; অর্থাৎ বর্ত্তমানে শারীরের প্রতিসংস্কার ছয় প্রকারে করিতে হইবে—এই বলিয়া ছয়টী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পঞ্চম উপায় "প্রত্যক্ষানুগত্যা প্রামাদিক পাঠ সংশোধনেন" প্রত্যক্ষের অনুগামী হইয়া প্রামাদিক পাঠ সংশোধন করিতে হইবে। আমরা সর্ব্বপ্রথমে এই পঞ্চম উপায়ের আলোচনা করিব। কারণ পরে পরিস্ফুট হইবে। গ্রন্থকার স্বয়ং উপোদ্ঘাতে এবং মূলে এইরূপ কতিপয় পাঠ সংশোধন করিয়াছেন। উপোদ্ঘাতের ৬৭—৬৮ পৃষ্ঠায় প্রথম পাঠ সংশোধন প্রণালী এই ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন ঃ—

"ফুস্ফুস পরিচয়শ্চ সুশ্রুতে নৈব লভ্যতে, নবা ক্বচিত্তস্য শ্বাসযন্ত্র মিত্যভিধানম্। শার্ঙ্গধরেতু দৃশ্যতে—"উদানবায়োরাধারঃ ফুস্ফুসঃ প্রোচ্যতে বুধৈ"রিতি। নচ "শোণিতফেণ প্রভবঃ ফুস্ফুস" ইত্যনেন ফুস্ফুসস্য স্বরূপজ্ঞানং সম্ভবতি। তৎস্বরূপাববোধস্যদ্যাপি কথঞ্চিৎ গতানুগতিক শ্রুতেরেব।

এবঞ্চ ক্লোমপদার্থ ব্যাকুলীভাবোঽপি স্ফুটএব। তথাহি কেচি দাশাশয় পশ্চাদ্বর্ত্তিনি অগ্ন্যাশয়াখ্যেযন্ত্রে১ [১ গ্রন্থপাদটীপ্পনী Pancreas] ক্লোমপদং প্রযুঞ্জতে সাম্প্রতিকাঃ; তৎপ্রামাদিকম্। যতঃ "শুষ্কাক্লোম গলাননঃ"—ইত্যাদি প্রয়োগদর্শনাৎ (সুঃউত্তন্ত্রে ৪১ অঃ), ক্লোমঃ পিপাসাস্থানত্বেন নির্দ্দেশাচ্চ গলসমীপবর্ত্তী কোঽপ্যবয়বঃ ক্লোমেতি শক্যমুন্নেতুম্। "ক্লোমস্থাদ্ গলনাড়িকা "ইতি দেববাজ্জিক ভাষ্যদর্শনাৎ সুশ্রুতেন মণ্ডলাখ্যস্থান্থিসন্ধেঃ ক্লোম্নি (সুঃশাঃ৫অঃ) দৃষ্টান্ত প্রদর্শনাচ্চ তরুণাস্থি চক্র পরিবেষ্টিতঃ শ্বাসপথ২ [২ গ্রন্থপাদটীপ্পনী ২ Trachea] এব কণ্ঠপুরঃস্থঃ ক্লোমেতি নিশ্চয়োঽস্মাকম্। শ্বাসপথশ্চায়ং ফুস্ফুসদ্বয়ে বিভক্ত ইতি উরোমধ্যতোঽপাস্য স্থানম্। যত্তু "হৃদয়স্যাধোবামতঃ প্লীহা ফুস্ফুসশ্চ [৩] দক্ষিণতো যকৃৎ ক্লোমচেতি সৌশ্রুতঃপাঠঃ তত্র লিপিকর প্রমাদ এব দরীদৃশ্যতে। "হৃদয়স্যাধো বামতঃ প্লীহা দক্ষিণতো যকৃৎ উভয়তঃ ক্লোম ফুস্ফুসৌচে"তি তু সাধীয়ান্ পাঠঃ।

উদ্ধৃত অংশের অর্থ এই ঃ—ফুস্ফুসের পরিচয়ও সুশ্রুতে পাওয়াই যায় না, কিংবা কোথাও ইহা শ্বাসযন্ত্র এইরূপ কথিত হয় নাই। শার্ঙ্গধরে কিন্তু দেখা যায় "পণ্ডিতগণ ফুস্ফুসকে উদান বায়ুর আধার বলিয়াছেন" "ফুস্ফুস শোণিতফেণ প্রভব" [৪] ইহা দ্বারাও স্বরূপজ্ঞান সম্ভব নহে। ইহার (ফুস্ফুসের) স্বরূপজ্ঞান অদ্যাবধি পূর্ব্বাপর যেরূপ শুনা যাইতেছে, তদনুসারেই কোন প্রকারে চলিতেছে, (বা করিতে হইবে?) এইরূপ ক্লোমপদের অর্থ লইয়াও বেশ গোলযোগ (আছে)। তাহার উদাহরণ আধুনিক কেহ কেহ আমাশয়ের পশ্চাতে অবস্থিত অগ্ন্যাশয় নামক যন্ত্র (গ্রন্থকারকৃত পাদটীপ্পনী Pancreas) ক্লোমপদের অর্থ বলিয়াছেন। তাহা প্রামাদিক, কেননা "ক্লোম গলা ও মুখ শুষ্ক হয়" এইরূপ বচন দেখা যায় (সুশ্রুতে) এবং ক্লোম পিপাসার স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা গলার নিকটস্থিত কোন অবয়ব ক্লোম এইরূপ উদ্ধার (অর্থোদ্ধার) করা যায়। দেববাজ্জিক ভাষ্যে দেখা যায় "ক্লোমের অর্থ গলনাড়ী"। সুশ্রুতও মণ্ডলনামক অস্থি সন্ধির উদাহরণ ক্লোমে প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব চক্রাকার তরুণাস্থি দ্বারা বেষ্টিত কণ্ঠসন্মুখস্থ (?) শ্বাসপথই (গ্রন্থকার কৃত পাদটিপ্পনী Trachea) ক্লোম আমরা (এই) নির্ণয় করিয়াছি। এই শ্বাসপথ দুইটী ফুস্ফুসে বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া বক্ষোঽভ্যন্তরেও অবস্থিত। "হৃদয়ের নিম্নে বামদিকে প্লীহা ও ফুস্ফুস, দক্ষিণদিকে যকৃৎ ও ক্লোম (অবস্থিত)"

[২] গ্রন্থকার বিলাপ করিয়াছেন "শারীরে সুশ্রুতো নষ্টঃ"—উপোদ্ঘাত ৬০ পৃঃ

[৩] প্রচলিত মুদ্রিত গ্রন্থে ফুপ্ফুসঃ এই পাঠ দৃষ্ট হয়। ক্বচিৎ ফুস্ফুসঃ এই পাঠ পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ শারীরে সর্ব্বত্রই ফুস্ফুস পঠিত হইয়াছে।

[৪] ব্যাখ্যা দিলাম না কারণ পাঠক স্বয়ংই পরে বুঝিবেন। এই পঙ্‌ক্তি সুশ্রুতের।

[৫] সুশ্রুতে এই যে পাঠ (দেখা যায়) তাহাতে লিপিকর প্রমাদই পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইতেছে "হৃদয়ের নিম্নে বামদিকে প্লীহা দক্ষিণদিকে যকৃৎ দুইদিকে ক্লোম এবং দুইটী ফুস্ফুস (অবস্থিত)" ইহাই সুসঙ্গত পাঠ।

প্রত্যক্ষশারীরকার মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয় সুশ্রুতের একটী পঙ্‌ক্তিতে পাঁচটী ভুলের সংশোধনোদ্দেশ্যে পূর্ব্বোদ্ধৃত সন্দর্ভ রচনা করিয়াছেন। ভুলগুলির মধ্যে ফুস্ফুস সম্বন্ধীয় ভুল তিনটী—(১) ফুস্ফুসের একবচন (২) বামতঃ (৩) এবং অধঃ—ক্লোম ঘটিত ভুল দুইটী (৪) দক্ষিণতঃ (৫) এবং অধঃ। আমরা যথাক্রমে এইগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমতঃ ফুস্ফুসের রহস্য দেখা যাউক।

সুশ্রুত সংহিতার প্রচলিত (পূর্ব্বোউদ্ধৃত) পাঠে ফুপ্ফুস বা ফুস্ফুস পদটী একবচনান্তরূপে পঠিত হইয়াছে; কিন্তু কেবল এস্থলে নহে সর্ব্বত্রই এইরূপ একবচনান্ত পাঠ দৃষ্ট হয়, এবং অন্য কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থেই একবচনান্ত ব্যতীত দ্বিবচনান্ত পাঠ দৃষ্ট হয় না। ইংরাজী শারীর গ্রন্থের যাঁহারা বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইংরাজী Lungs অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নির্ব্বাহক যন্ত্রদ্বয়ের প্রতিশব্দরূপে ফুস্ফুস এই সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ শারীরের মূলে (১০ পৃঃ) ও "উরোগুহায়াং ফুস্ফুস দ্বয়ম্"...অর্থাৎ বক্ষোগহ্বরে দুইটী ফুস্ফুস... এবং পাদটিপ্পনীতে ফুস্ফুসের ইংরাজী নাম Lungs এইরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু Lungs একটী নহে দুইটী, তাহাদের অবস্থানও সুশ্রুতের বিবরণানুযায়ী হৃদয়ের নিম্নে বা এক (বাম) পার্শ্বে নহে, দুই দিকে; সুতরাং Lungsএর সহিত সুশ্রুতোক্ত বর্ণনার কোন সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে না; তথাপি পাঠ-প্রমাদের সংশোধনের নিমিত্ত মহামহোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করিয়াছেন:—

(১) সুশ্রুতে কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না, অথবা ইহা শ্বাসযন্ত্র, এরূপ উক্তিও কোথাও নাই। আমরা ইহার সহিত আর একটী যুক্তিরও উল্লেখ করিতে পারি যে ফুস্ফুস আক্রান্ত হইলে শ্বাস কাসাদি পীড়া হয় এমন কথাও কুত্রাপি নাই।

(২) ফুস্ফুস শোণিতফেণ প্রভব এই উক্তি (সুশ্রুতের) দ্বারা ফুস্ফুসের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। এই সুশ্রুতোক্তি দ্বারা মহামহোপাধ্যায় মহাশয় কি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই।

(৩) শার্ঙ্গধরের বচন—গ্রন্থকার ইহার তাৎপর্য্য পরিস্ফুট করেন নাই। উদান নামক বায়ু সামান্যতঃ কণ্ঠদেশে অবস্থিত। শার্ঙ্গধর টীকাকার আঢ়মল্ল কণ্ঠদেশস্থ উদান বায়ুর আধার ফুস্ফুস [৬] এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং এতদ্দারা কি পরিচয় পাওয়া যায় বুঝা যায় না, এইমাত্র বলা চলে।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও আমরা গ্রন্থকারকে স্মরণ করাইয়া দিব যে, তিনি স্বয়ং উপোদ্ঘাতের ৬১ পৃষ্ঠায় শার্ঙ্গধরের যে শ্লোকটী ("নাভিস্থঃ প্রাণপবনঃ"—ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়া শ্বাসক্রিয়ায় অক্সিজেন বায়ুর গ্রহণরূপ অন্যত্র দুর্লভ বিষয় বর্ণনার জন্য শার্ঙ্গধরকে অভিনন্দিত করিয়াছেন, সেই শ্লোকেও ফুস্ফুসের কোনই উল্লেখ নাই; তৎপরিবর্ত্তে 'নাভি' শব্দই দেখা যায়; এবং গ্রন্থকারও এই জন্য উক্ত সন্দর্ভের পাদটিপ্পনীতে শবচ্ছেদাভাবজনিত শার্ঙ্গধরের ভ্রান্তির কথা বলিয়াছেন।

(৪) পূর্ব্বাপর যেরূপ শুনিয়া আসিতেছেন তদনুযায়ী চলিয়াছেন।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে গ্রন্থকার সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ বা চিরপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিয়া এমন কি দোষ করিয়াছেন? ইংরাজী শারীরানুবাদকগণও কি এই ব্যাখ্যা কল্পনা করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক এবং অপ্রাসঙ্গিক হইলেও নিরপেক্ষ পাঠক মহোদয়গণের সন্তোষবিধানের জন্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

(০) ইংরাজী শারীরের অনুবাদকগণের কল্পনা শক্তির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাদের Nerve অর্থে স্নায়ু শব্দ প্রয়োগের প্রতিবাদ স্বয়ং প্রত্যক্ষ শারীরকারই এই গ্রন্থে করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, অন্যত্র যাহাই হউক ফুস্ফুসের এই অর্থ তাঁহাদের আবিষ্কৃত নহে। গতানুগতিক অর্থাৎ পূর্ব্বাপর শ্রুতির মূল মহামহোপাধ্যায় মহাশয় নির্দ্দেশ না করিলেও আমরা করিতেছি:—

(০০) এই ব্যাখ্যার প্রথম উদ্ভাবক বা প্রবর্ত্তক সম্ভবতঃ সুশ্রুতের প্রাচীন টীকাকার ডল্লন। তিনি লিখিয়াছেন "ফুপ্ফুসঃ হৃদয়নাড়িকামগ্নঃ স্বনামখ্যাতঃ।" ডল্লন অবশ্য সুশ্রুতের পঙ্‌ক্তিতে কোন পাঠ পরিবর্ত্তন করেন নাই।

(০০০) কিন্তু ডল্লন ঐরূপ লিখিয়াছেন বলিয়াই যে এই ব্যাখ্যা চিরপ্রচলিত বা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ তাহা বলা চলে না। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে কিঞ্চিৎ শরীর বিবরণ আছে। সে স্থলে "প্লীহাবহননম্..." এই সংজ্ঞা দুইটীর ব্যাখ্যায় 'সুপ্রসিদ্ধ মিতাক্ষরা নামক টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন "প্লীহা আয়ুর্ব্বেদ প্রসিদ্ধঃ অবহননং ফুপ্ফুসঃ তৌচ মাংসখণ্ডকারৌ [৭] সব্যকুক্ষিস্থিতৌ" [৮]। অর্থাৎ প্লীহা এবং ফুস্ফুস (উভয়েই) বাম উদরে অবস্থিত। অবশ্য মিতাক্ষরাকার আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বা আয়ুর্ব্বেদ ব্যাখ্যায় তাঁহার উক্তিই প্রামাণিক এমন কথা বলা আমাদের অভিপ্রেত নহে। বিষ্ণুসংহিতোক্ত শরীর বিবরণের ব্যাখ্যায় টীকাকার নন্দ পণ্ডিতও মিতাক্ষরাকারের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। প্রমাণান্তরের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়,

(১) সুশ্রুতে ফুস্ফুসের পরিচয় বা স্বরূপ বিবরণ নাই

(২) অস্পষ্টশার্ঙ্গধরোক্তি—এবং

[৫] প্রচলিত বঙ্গানুবাদ।

[৬] শার্ঙ্গধর স্বয়ং "উদানঃকণ্ঠদেশস্থঃ" (পূংখং৫অং) এইরূপ বলিয়াছেন।

[৭] ইহার স্থলে "মাংসপিণ্ডাকারৌ" এই পাঠও দৃষ্ট হয়

[৮] "স্থিতৌ" স্থলে "গতৌ" এই পাঠও দৃষ্ট হয়।

(৩) পূর্ব্বাপর শ্রুতি ("গতানুগতিক")

এই ত্রিবিধ উপকরণ বা প্রমাণের সাহায্যে সুশ্রুতের গ্রীবাভঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাই "প্রত্যক্ষের অনুগামী হইয়া প্রামাদিক পাঠ সংশোধনের" অথবা "শারীর প্রতি সংস্কারের" আদর্শ কি না, পাঠক মহোদয়গণকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিব না, তাঁহাদিগকে কেবল জিজ্ঞাসা করিব, ধন্বন্তরির বিকৃত মত স্বচ্ছ হইতেছে ত?

অতঃপর ক্লোমের কথার আলোচনা করিব। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে প্রথমতঃ, ক্লোম সম্বন্ধে যে গোলযোগ আছে তাহা স্বীকার করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ, যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আধুনিক একটী মত খণ্ডন করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ, প্রমাণান্তর সহযোগে স্বয়ং নূতন অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন; চতুর্থতঃ, তাঁহার এই নূতন আবিষ্কার প্রতিষ্ঠার জন্য সুশ্রুতের পাঠ সংশোধন করিয়াছেন।

ক্লোম বলিতে যাঁহারা Pancreas বা মহামহোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত-নামাঙ্কিত (অগ্ন্যাশয়) যন্ত্র বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হয় নাই। আমরা অন্ততঃ একজনের নামোল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। খ্যাতনামা কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎকৃত "সুশ্রুতার্থ সন্দীপন ভাষ্য" নামক সুশ্রুত-সংহিতার নবীন টীকাগ্রন্থে এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রত্যক্ষ শারীর গ্রন্থকারের খণ্ডনাদি পর্য্যালোচনা করা যাউক। ১ম যুক্তি—সুশ্রুতের বচনাংশ "শুষ্ক ক্লোম"। এই বচনাংশটী সুশ্রুতের শোষ (যক্ষ্মা) প্রতিষেধাধ্যায়ের। উক্ত অধ্যায়ে রাজযক্ষ্মার কারণ লক্ষণাদি বর্ণনার পর শোক, পথ ভ্রমণ (অতিরিক্ত) প্রভৃতি কতিপয় কারণে যে (ক্ষুদ্র বা মৃদু প্রকারের) ক্ষয় হয়, তাহারই লক্ষণ উক্ত বচনে কথিত হইয়াছে। অতিরিক্ত-পথ-ভ্রমণ-জনিত ক্ষয়ে ক্লোম গলা মুখ শুষ্ক হয়, ইহাই উক্ত বচনাংশের তাৎপর্য্য। কবিরাজ মহাশয়ের মতে কি অতিরিক্ত পথ ভ্রমণে Trachea অর্থাৎ ক্লোম শুষ্ক হয়? ইহা কি তাঁহার প্রত্যক্ষ পরীক্ষালব্ধ, না ইহার অন্য প্রমাণ আছে? যদি বলা যায় যে, সর্ব্বশরীরেরই (সুতরাং Tracheaরও) আর্দ্রত্ব অর্থাৎ স্বাভাবিক শ্লেষ্মাদিস্রাব কমিয়া যায়, তাহা হইলে কেবল Pancreas কি অপরাধ করিল, অথবা সুশ্রুত Tracheaর ঊর্দ্ধদেশস্থ কণ্ঠ (নাড়ী) কে বঞ্চিত করিয়া Tracheaর প্রতি পক্ষপাত করিলেন কেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

(২য় যুক্তি) "ক্লোম পিপাসাস্থান" ইহার প্রমাণভূত কোন গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ সুশ্রুত বা চরক সংহিতায় (মূলে) কুত্রাপি এমন কথা নাই। ইহা চক্রপাণি, শার্ঙ্গধর প্রভৃতি টীকাকার ও সংগ্রহকারগণের উক্তি।

কিন্তু মহামহোপাধ্যায় গ্রন্থকার ত এই সকল প্রাচীন নিবন্ধকারগণের মস্তকে "জীর্ণবলভ্যামেব হ্যত্র দৃশ্যন্তে ভূতবেতালানিবসন্তঃ"! [৯] অর্থাৎ ভাঙ্গা বাড়ীতেই ভূত-বেতালের বাস দেখা যায়, ইত্যাদি পুষ্পচন্দন বৃষ্টি করিয়াছেন, এখন কি তাঁহাদের উক্তিই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিলেন? "প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া প্রভূনাম্"—? (প্রভুগণ প্রয়োজন বশতই—?) ভাল কথা। Pancreasটী পিপাসার স্থান হইতে পারে কি না, সে কথা শ্রীযুক্ত কবিরাজ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির বিচার্য্য, আমাদের নহে। কিন্তু Trachea যে পিপাসার স্থান, এ তত্ত্বসুধা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্ বলিয়া সাধারণো পরিচিত গ্রন্থকার প্রাচ্য অথবা প্রতীচ্য কোন শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনের ফলে লাভ করিয়াছেন, জানিতে পারি না কি? পাঠক ডাক্তার মহাশয়গণের নিকটও আমরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভের ভরসা রাখি। (৩য় যুক্তি) "ক্লোমের অর্থ গলনাড়ী" এই দেবযাজ্ঞিক ভাষ্য। গ্রন্থকার ইংরাজী উপক্রমণিকায় (Introduction p. 15) ক্লোমের অর্থ নির্ণয় তাঁহার বৈদিক গ্রন্থালোচনালব্ধ আবিষ্কার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আমরা এস্থলে সরলভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি; কেন না এই ভাষ্যকার কে এবং ইহা কোন্ গ্রন্থের ভাষ্য—গ্রন্থকার সে বিষয়ে আমাদিগকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখিয়াছেন। এক দেবরাজযজ্বা যাস্ককৃত নিরুক্ত নামক বৈদিক নিঘণ্টু (অভিধান)র ভাষ্যকার। উক্ত ভাষ্য আমরা ভালরূপ অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। প্রয়োজনও অনুভব করি নাই। তাহার এক কারণ, উক্ত দেবরাজ যজ্বার পৌত্র দুর্গাচার্য্য তৎকৃত উল্লিখিত যাস্কনিরুক্তের উত্তর ষট্‌কের টীকায় বাগ্‌ভট হইতে বচন উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং এই দেবরাজযজ্বা অন্ততঃ বাগ্‌ভটের সমসাময়িক। তৎকৃত ভাষ্য বৈদিক গ্রন্থপদবাচ্য কি না, বা "ক্লোম গলনাড়ী" প্রমাণান্তরশূন্য এই উক্তি তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সুশ্রুতের (বা তৎপ্রতিসংস্কর্ত্তার) বচন ব্যাখ্যায় কতদূর প্রামাণিক অথবা তদনুরোধেই ক্লোম সম্বন্ধীয় আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিবরণ উন্মূলিত করা কর্ত্তব্য কি না, সে বিষয়ে আমরা সন্দিহান। সুতরাং এ বিষয়ে আর কিছু বলিব না। কেবল একটা কথা বলিব। প্রত্যক্ষ শারীরকারের এই অর্থাবিষ্কারের বহুকাল পূর্ব্বে বিশ্রুতকীর্ত্তি স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় তৎকৃত চরকের "জল্পকল্পতরু" টীকায় লিখিয়াছিলেন, "ক্লোম কণ্ঠোরসোঃ সন্ধৌ" (চঃ বিমা) অর্থাৎ ক্লোম কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধিতে (অবস্থিত)।

(৪র্থ যুক্তি) "সুশ্রুত মণ্ডল নামক অস্থি সন্ধির উদাহরণ ক্লোমে দেখাইয়াছেন" গ্রন্থকার এস্থলে সুশ্রুতের পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করেন নাই; আমরা করিতে বাধ্য হইলাম। "কণ্ঠহৃদয়নেত্র ক্লোমনাড়ীষু মণ্ডলাঃ" এই বচন দ্বারা কেবল প্রত্যক্ষ শারীরকারের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইতেছে না, যাঁহারা ক্লোম বলিতে Pancreas গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতও চূর্ণ হইয়াছে। আমরা অনুবাদ দিলাম না; কিন্তু পাঠক মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারিবেন—উদ্ধৃত পাঠে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় "ক্লোমনাড়ী"—যথাশ্রুতার্থেই গ্রহণ করিয়াছেন; কেন না তিনি দেবযাজ্ঞিক ভাষ্যে দেখিয়াছেন, "ক্লোম অর্থে গলনাড়ী"। আর শ্বাসপথ বা Trachea ত বাংলায় এতাবৎকাল শ্বাসনাড়ী নামেই প্রসিদ্ধ।

[৯] উপোদ্ঘাত ৬০ পৃষ্ঠা—বিস্ময়চিহ্ন (!) টী আমাদের দত্ত নহে।

"সুশ্রুতার্থ সন্দীপন ভাষ্য"কার কবিরাজ শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎকৃত উক্ত টীকায় ক্লোম-Pancreas এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভের অন্য সদুপায় না পাইয়া উল্লিখিত সুশ্রুতোক্ত সমগ্র পঙ্‌ক্তিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিয়া নিষ্কণ্টক হইয়াছেন। তৎপ্রদত্ত যুক্তি এই ঃ—উক্ত পাঠে "ক্লোম" শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বেই "নেত্র" শব্দ আছে; সুতরাং কেবল "ক্লোম-নাড়ী" নহে "নেত্রনাড়ী"ও এই পাঠের উদ্দিষ্ট; কিন্তু নেত্রনাড়ীতেও মণ্ডল নামক অস্থিসন্ধি আছে ইহা নিতান্তই প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ। মহামহোপাধ্যায় মহাশয় অবশ্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই যুক্তি খণ্ডনের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার তুল্য পথযাত্রী (উভয়েই যেন তেন প্রকারেণ আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন পাঠ উন্মূলনে প্রবৃত্ত) বলিয়া অথবা অন্য কারণে [১০] তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। আমরা কেবল পাঠক মহাশয়গণকে সেই বাংলা প্রবাদ বাক্যটী স্মরণ করাইয়া দিয়াই এ ক্ষেত্রে নিবৃত্ত হইব ঃ—

"ছিল ঢেঁকি হল তুল, কাট্‌তে কাট্‌তে নির্ম্মূল।"

গ্রন্থকার তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে প্রমাণ চতুষ্টয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা সেইগুলি আলোচনা করিলাম; কিন্তু সম্পূর্ণ সংশয় নিবৃত্তি হইল না। কারণ ঃ—

(০) চতুর্থ প্রমাণভূত যে সুশ্রুত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আর একটী পঙ্‌ক্তি দৃষ্ট হয় ঃ—"নাড়ীষু হৃদয় ক্লোম নিবদ্ধাসু অষ্টাদশ" (সু· শা· ৫অ·) অর্থাৎ হৃদয় ও ক্লোম নিবদ্ধ নাড়ী সমূহে আঠারটী (অস্থি) সন্ধি আছে [১১]। সুশ্রুতে এই সন্ধি গ্রীবা ও তদূর্দ্ধ্বাতসন্ধি কথন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। ক্লোম অর্থে ত Trachea বুঝিলাম। এখন Trachea নিবদ্ধ কোন্ নাড়ী (বা নাড়ী সমূহে)তে ১৮টী সন্ধি পাইব, তাহা ত গ্রন্থকার মহাশয় বলিয়া দিলেন না। ইংরাজী শারীর গ্রন্থে Tracheaটী ১৮—২০টী চক্রাকার তরুণাস্থিসমূহে নির্ম্মিত, এইরূপ লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলে এই পাঠও কি প্রামাদিক এবং সংশোধন-সাপেক্ষ ?

(০০) চরক সংহিতা [১২] এবং সুশ্রুত সংহিতা এই উভয় গ্রন্থেই কথিত হইয়াছে ঃ তালু এবং ক্লোম উদকবহ স্রোতের মূল (চঃ বিমাঃ ৫অঃ—সু· শা· ৯ অ·)। এই উদকবহ স্রোত কি এবং ক্লোম বা Tracheaতে এই লক্ষণ কিরূপে সংলগ্ন হয়, সে সম্বন্ধেও গ্রন্থকার আমাদিগকে কোন উপদেশ দেন নাই। উক্ত বচনগুলিও কি প্রামাদিক বিবেচনা করিতে হইবে ?

(০০০) বৈদিক গ্রন্থ আলোচনা পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদের অর্থাবিষ্কার চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের সম্পূর্ণ আলোচনা কি তৎপক্ষে একান্তই নিষ্প্রয়োজন ?

(০০০০) প্রাচীন এবং আধুনিক অষ্টাদশ (বা তদধিক) জন গ্রন্থকার ক্লোম সম্বন্ধে তাঁহাদের মত লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে অন্যতম বর্ত্তমান কালের খ্যাতনামা দর্শনাচার্য্য শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় লিখিয়াছেন, ক্লোম (অর্থে) Gall Bladder (ইহা বাংলায় পিত্তকোষ বা পিত্তস্থলী নামে প্রচলিত [১৩]। প্রত্যক্ষ শারীরকার এই সকল মত সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, আমরা সমধিক নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিতাম।

আর একটী কথা বলিয়াই আমরা ক্লোম প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

কবিরাজ এবং ডাক্তার গ্রন্থকার মহাশয়ের এই সংস্কারের আলোকে কেবল প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ নহে, নবীন পাশ্চাত্য শারীরও বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেন না, তৎকৃত এই "নূতন" সুশ্রুতে ক্লোম অর্থাৎ Trachea হৃদয়ের দুই দিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভরসা করি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান অথবা পাশ্চাত্য শারীর বিদ্যা আর নূতন গোল বাধাইবে না। ডাক্তার মহোদয়গণ অভয় দান করিলেই আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থিগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে এই নূতন বিদ্যার্জ্জনে ব্রতী হইতে পারে। [১৪]

দুইটী বিষয় জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ সংস্কারের মন্ত্রগুরু ডাঃ হোর্ণলে তৎকৃত গ্রন্থে এই Tracheaই আয়ুর্ব্বেদোক্ত "জত্রু" সংজ্ঞাবাচ্য—বিপুল গবেষণার (?) ফল এইরূপ নির্ণয় করিয়াছিলেন; মহামহোপাধ্যায় মহাশয় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃশব্দ রহিয়া গেলেন কেন ? আর "প্রত্যক্ষ শারীরের" প্রশংসাপত্র দান কালে আচার্য্যের চিত্তেই বা তাঁহার ধনঞ্জয়তুল্য শিষ্য কৃত (তৎকৃত গবেষণার) এই শ্রদ্ধা-মৌন প্রতিবাদ দর্শনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল ?

পাঠক মহোদয়গণ কি বলেন ? ধন্বন্তরির বিকৃত মত অত্যন্ত নির্ম্মল হইতেছে কি না ? ভরসা করি, এরূপ জিজ্ঞাসার ফলে কেহ মনে করিবেন না যে আমি তাঁহাদিগকে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটী স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি ঃ—

"দুর্ব্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল।
শূন্য আকাশের মত অত্যন্ত নির্ম্মল।"

গ্রন্থকার এই (পূর্ব্বোদ্ধৃত) সন্দর্ভের উপাদেয় উপসংহার

---

[১০] প্রত্যক্ষ শারীরের মূলে ১১ পৃষ্ঠার পাদটিপ্পনীতে গ্রন্থকার এইরূপ লিখিয়াছেন "* * * অগ্ন্যাশয়ঃ—Pancreas সোয়ং ক্লোমেত্যপরে। তচ্চিন্ত্যম্, দৃশ্যতামুপোদ্ঘাতঃ।" অর্থাৎ অন্যে ইহাই (Pancreas) ক্লোম বলেন। তাহা চিন্তনীয় ইত্যাদি। ইহা হইতে এই মতটী অদ্যাপি তাঁহার বিবেচনাধীন কি না বুঝিলাম না।

[১১] প্রচলিত বঙ্গানুবাদ।

[১২] চরকের উল্লেখ ভয়ে ভয়ে করিলাম; কেন না, গ্রন্থকার ধন্বন্তরির বিকৃত মত স্বচ্ছ করিবেন, চরকের সহিত সম্বন্ধ কি ?

[১৩] History of Hindu Chemistry—By Sir P. C. Ray—Vol. II, Mechanical, Physical, Chemical theories of the Hindus, By Dr. B. N. Seal.

[১৪] বলা আবশ্যক, দ্বিতীয় (আধুনিকতম) সংস্করণ হইতেই এই সমস্ত উদ্ধৃত হইয়াছে।

করিয়াছেন। আমরা যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারি নাই, তজ্জন্য পাঠক মহাশয়গণের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। "অন্যথা ন কেনাপি কথমপি শক্যং সমাধাতুম্" (উপোদ্ঘাত ৬৮ পৃঃ) অর্থাৎ এতদ্ভিন্ন (অর্থাৎ সুশ্রুতের পাঠ এই ভাবে সংশোধন না করিলে) কেহই কোনরূপেই মীমাংসা করিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা ইহার উপর আর কি বলিব ? মহামহোপাধ্যায় মহাশয় কি মহাকবি ভবভূতির সেই "কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী" (=কাল অনন্ত এবং পৃথিবীও বিশাল) উক্তি বিস্মৃত হইয়াছেন ? না উহাও প্রামাদিক বিবেচনা করেন ?

আমরা "প্রত্যক্ষ শারীরের" "উপোদ্ঘাতো"ক্ত প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের প্রথম পাঠ সংস্কারের পরিচয় পাইলাম। অতঃপর মূলগ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। 'উপোদ্ঘাতে আরও দুই চারিটী পাঠ সংশোধিত হইয়াছে (বিস্তারিতের জন্য গ্রন্থকার 'পরিশিষ্টে'র অপেক্ষায় থাকিতে বলিয়াছেন)। কিন্তু কেবল উপোদ্ঘাত লইয়া ব্যস্ত থাকিলে আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না; বিশেষতঃ মূল আলোচনা উপলক্ষেই উপোদ্ঘাতোক্ত অবশিষ্টাংশের পরিচয় গ্রহণেরও সুযোগ হইবে।

গ্রামের পথে

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির]

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

৫

চার পাঁচ দিন পরের কথা।

সে রাত্রির কথাটা অমল স্বপ্ন বলিয়াই উড়াইয়া দিয়া আবার নিশ্চিন্ত হইয়াছে। মিথ্যা তার কথা ভাবিয়া কি হইবে! নাম তো বলিয়া গেল, পাপিয়া, পিয়ারী বিবি! তার পর ঐ বাগান হইতে আসিয়াছিল! ও বাগানে কারা আসে, এতকাল এখানে থাকিয়া সে তা ভালো করিয়াই জানে! পিয়ারা বিবি নামটাও ভদ্রঘরের মহিলার হইতে পারে না! তাই বটে অমন কুণ্ঠাহীন ভঙ্গী! কথাবার্ত্তাতেও এতটুকু সরমের খোঁচ নাই!...কিন্তু এই যে, যাকে সে ইষ্ট দেবীর মত নিজের অন্তরে বসাইয়াছে, সেই বা কে! ঐ পিয়ারী তাহাকে দিদি বলিল! তবে কি সে ঐ কাব্য-লোকেরই জীব নয়! স্বপ্নে রচা কোন্ সুদূর কল্পলোকেই তার বাস নয়!...তারো পিছনে এমনি মূর্ত্তি...এই পরিচয়! অমল শিহরিয়া উঠিল, না, না, সে কল্পলোক-বিহারিণী কাব্যের নায়িকা মাত্র— তার অন্য পরিচয় নাই! অন্য পরিচয় তার থাকিতে পারে না।

সন্ধ্যা হইলে অমল প্রদীপ জ্বালিয়া খাতা খুলিয়া বসিল। বাহিরে বাতাস একটু বেগে বহিতেছিল...কিসের উচ্ছ্বাসে যেন সে ফুলিয়া ফুলিয়া বহিতেছিল! গাছের পাতার অন্তরাল ভেদ করিয়া প্রকাণ্ড চাঁদ দুই হাতে অজস্র কিরণ বর্ষণ করিতেছে। এমন সময়ে দ্বারে কে ডাকিল— অমলবাবু আছেন?

এ সেই স্বর! পিয়ারীর···! অমল উঠিয়া বহির্দ্বারে আসিল। পিয়ারীই বটে! চাঁদের ঝরা কিরণ-রাশির মাঝে, জ্যোৎস্নায় আরো রঙ ফলাইয়া জ্যোতি ফুটাইয়া এ যে পিয়ারীই তার দ্বারে দাঁড়াইয়া...! দুই ঠোঁট হাসিতে ভরা!

পিয়ারী বলিল,—বাগানে এলুম...কিন্তু সেইটেই প্রধান লক্ষ্য নয়। আপনার সঙ্গে পুরোনো আলাপটুকু ঝালাতে এসেছি।···চলুন, একটু বসি—

পাপিয়ার অঙ্গ বাহিয়া কৌতুকের নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতেছিল! সে অমলের আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়াই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘরে ঢুকিয়া পাপিয়া কবিতার খাতাখানা হাতে তুলিয়া লইল, এবং তার পৃষ্ঠাগুলা আগাগোড়া নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল,—কৈ, সে রাত্রের কথা কিছু লেখেন নি তো?

অমল মৃদু কণ্ঠে কহিল—না।

বক্র কটাক্ষে পাপিয়া অমলের পানে চাহিল, অমল মাটীর দিকে চাহিয়া ছিল। পাপিয়ার পানে সে সময় চাহিলে দেখিত, পাপিয়ার দৃষ্টিতে কিসের একটা তীব্র স্ফুলিঙ্গ!

পাপিয়া কহিল,—তার পরে শুধু একটা কবিতা লিখেছেন, দেখ্‌চি...

অমল কহিল,—হ্যাঁ···

পাপিয়া কহিল,—এই যে!...বলিয়া সে পড়িল,—

কোন্ অপরাধে অপরাধী দেবী?
ভুলিলে এ দীন ভক্তে!
তোমারি লাগিয়া আকুল হৃদয়
চূর্ণ, লোহিত রক্তে!
দুটী দিন—তার দীর্ঘ এ ক্ষণ,
শূন্য হৃদয়ে পড়েনি চরণ!
তোমারি ধেয়ানে রয়েছি মগন,
এত সুকঠিন—ভক্তে!

এইটুকু পড়িয়াই বলিল,—বাঃ, বেশ হয়েছে!...তা এই একটি কবিতাই লেখা হয়েছে তার পরে? এ ক'দিন মাথা কোটাকুটি করেও তাঁর দর্শন মেলেনি, হঠাৎ বুঝি তাই এ উচ্ছ্বাস?

অমল কোন কথা কহিল না। লজ্জায় তার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

পাপিয়া আবার হাসিল। হাসিয়া তার পরে কহিল,—

চপলা দিদিকে বললুম আপনার কথা—নির্জ্জন বনে আপনার এই ধ্যানের কাহিনী...

অমল উৎকর্ণ হইল, তীব্র কৌতূহলে পাপিয়ার পানে চাহিল।

পাপিয়া সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল। সে দৃষ্টি ছুরির ফলার মতই তার বুকে বিঁধিল। পাপিয়া বলিল,—তা কাকেই বা বলা! সে তখন বাবু নিয়ে এমন মশগুল্!...বলে, বাবুর জন্যে থিয়েটারই ছেড়ে দিলে! আজো তার জন্যে থিয়েটারের লোকেরা কত দুঃখ করে!...আখের খোয়ালে বাবুর কথায় ভুলে!

শেষের কথাগুলা শুনিয়া অমলের মুখ মলিন হইয়া গেল। তার বুকে কে যেন সজোরে চাবুক মারিল! তার মানসী প্রতিমা...সেই বিরহিণী শ্রীরাধা... শ্যামের প্রেমে তার সে তন্ময়তা—সে সব তার ছদ্মবেশে কৃত্রিম অভিনয় মাত্র! ছলনার চাতুরী! তাতে সে এমন বোকা যে সে ভাবগুলা হুবহু সত্যকার রঙে অমন রঙীন করিয়া তোলে! অমলের বুকের মধ্যে কে যেন মুগুরের ঘা মারিয়া তার সে মানসী ছবিখানি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিল!

পাপিয়া অমলের সে ভাবান্তর লক্ষ্য করিল; লক্ষ্য করিয়া একটু খুশীও হইল। সে আবার বলিতে লাগিল,—এত বললুম যে, দিদি, একবার দেখবে চল।—কি রকম ভক্ত, কি রকম প্রাণের গান গায় তোমার ধ্যানে!...তা হেসে বললে, তোর সাধ হয় দেখ্‌গে যা, আমি তো পাগল হইনি যে কোন্ হতভাগার রঙ্গ দেখতে যাবো!...চপলা দিদির ঐ তো মস্ত দোষ— সব-তাতে এ!

অমল হতাশভাবে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল। ঘরের প্রদীপের আলোটুকু তার চক্ষে নিবিয়া গেল। সে স্তম্ভিতের মত বসিয়া রহিল। তার একমাত্র সম্বল,—তার এ বজ্রাহত জীর্ণ জীবনে একটু এই যে বসন্ত-সমীরের ঝলক...তাও আজ মিলাইয়া যায়!...কিন্তু, এই নারী...এর কি সুখ, এ-ভাবে তাকে আঘাত করায়!···সে-রাত্রে অমল তাকে আশ্রয় দিয়াছিল, তার বিনিময়ে তার এই একটুমাত্র সুখ, সেটাকে দুই পায়ে এ মাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া দিতে চায়!... পাপীয়সী, পিশাচিনী!

মুহূর্ত্তে অমলের মন রাগে কাঁপিয়া উঠিল। সে তীব্র দৃষ্টিতে পাপিয়ার পানে চাহিয়া বলিল,—চলে যাও; তুমি— কেন এখানে এসেছ!...এ-সব কথা আমার কাছে কেন মিছে বলচো! তুমি জানো এ-সব কথা বলে কি করলে তুমি, আমার কত-বড় ক্ষতি...?

পাপিয়া অমলের স্বরের এই রূঢ় ভঙ্গীতে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া অমলের পানে চাহিল। তার মুখের উপর এমন করিয়া কথা বলে! তাকে বলে, চলিয়া যাও...এমন লোকও আছে!...পাপিয়ার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অমল তীব্র স্বরে কহিল,—এখনো দাঁড়িয়ে রইলে যে! ...যাও, যাও তুমি...কেন তুমি এখানে এসেছ...আজ তো আর আশ্রয়ের দরকার নেই! চলে যাও।...এ আমার ঘর, আমি এ-ঘরের মালিক...

পাপিয়ার বিদ্বেষ তখন দলিত সর্পের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। রাগের বিষ তার ফণায় মিশাইয়া সে বলিল,— বুঝেছি, এ রাগ হঠাৎ কেন হলো!...তুমি কাঙাল, ভিখিরী, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে পড়ে সিংহাসনের স্বপ্ন দ্যাখো তুমি। ...এর চেয়ে বেকুবি আর কি হতে পারে!

অমল জবাব দিল,—আমি বেকুব হই, যাই হই, তোমায় তো সাধিনি আমায় বুদ্ধি দিতে!...কেন তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছ?...যাবে না?

পাপিয়া রাগিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইল, কঠিন স্বরে কহিল—না, যাবো না!

বিস্ময়ে অমলের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না! এ নারী এ বলে কি!

পাপিয়া তার দিকে ফিরিয়া রুদ্ধ অভিমানে কহিল,— আমি যাবো না।...কেন যাবো? জোর করে তাড়িয়ে দিতে পারো যদি তো দাও...দাও তাড়িয়ে···তুমি পুরুষ-মানুষ, গায়ে জোর আছে তোমার...সে জোর ফলাও... দাও, দাও আমায় তাড়িয়ে...

শেষের দিকটায় পাপিয়ার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া অশ্রুর বাষ্পে জড়িত হইয়া উঠিল। অমল বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পাপিয়ার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এবং তার বিস্ময়ের সে চমক ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই পাপিয়া কম্পিত স্বরে আবার বলিয়া উঠিল—তোমায় দেখতে

এসেছি,—বিলাস, খেলা, সব ছেড়ে তোমায় শুধু দেখতে এসেছি...আর তুমি আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ! তোমার এতটুকু মায়া হচ্ছে না···? কি পাষাণ গো তুমি! আমার যে কিছু ভালো লাগচে না—ধন, জন, গহনা, স্তব-স্তুতি... এ-সবের মায়া কেটে তোমার এই ভাঙ্গা ঘরে চলে এসেছি... এর জন্যে তোমার একটু দরদ হয় না? একবার সাধ হয় না, জিজ্ঞাসা করতে যে কেন এসেছ! বলিতে বলিতে বিরাট অশ্রুতে ফাটিয়া সে একেবারে অমলের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

অমল নির্ব্বাক, নিস্পন্দ!···

পাপিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠেই কহিল,—তোমার ঐ নিষ্ঠা, ও অনুরাগ একটা কত-বড় পিশাচীর উদ্দেশে তুমি উৎসর্গ করে বসে আছ, তা যদি জান্‌তে!...একটা নরকের কীট, প্রাণ নেই, মন নেই, পুরুষকে যে খেয়াল মেটাবার যন্ত্র বলে শুধু জেনে রেখেচে...ওঃ! অমল পায়ের নীচে পাপিয়াকে অনুভব করিয়া তার হাত ধরিয়া তাকে উঠাইল, উঠাইয়া কহিল—তুমি না বললে, বাগানে এসেচ···!

—না, না, না...ছাই বাগান। পাপিয়া আর্ত্ত স্বরে বলিয়া উঠিল,—বাগানে আমার কোন লোভ নেই,···কোন সাধ নেই।...আমি এসেচি,···আমি...তোমার আশায়... একটিবার অমনি করে আমার উদ্দেশে দুটী ছত্র কবিতা লিখে আমায় শোনাও তুমি...আমার এ হীন জীবন সার্থক হয়ে উঠুক!···সে রাত্রে...জানো, আমি কি করেছি...?

অমল আবার বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়া কহিল,—সারা রাত এতটুকু ঘুমোই নি...! সারা রাত তোমার ঐ মুখের পানে চেয়ে বসেছিলুম... তোমায় মশা কামড়াচ্ছিল—আমি সাবধানে আঁচল দিয়ে সেই মশা তাড়িয়েছি,—পাছে তোমায় কামড়ায়, কষ্ট হয়, পাছে তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায়!...চেয়ে থেকে থেকে মনে কি সাধ যে জাগছিল—আর নিজেকে কি চেষ্টায় অটল রেখেছিলুম...! কেবলি মনে হচ্ছিল, জগতে আর আমার কোনো ঠাঁই যদি না থাকতো...তাহলে এই আশ্রয়কেই জড়িয়ে চির-জীবন পড়ে থাকতুম! আমি লুকোব না—সত্য বলচি, সেই লক্ষ্মীছাড়া রাক্ষসীর ভাগ্যের হিংসা করেছি শুধু...কি দিয়ে যে সে তোমায় মুগ্ধ করেছে...তার মধ্যে কী তুমি পেয়েছিলে...

অমল পাপিয়াকে বাঁধা দিয়া কহিল—এ-সব কি বলছো তুমি! ছি! জ্ঞান হারিয়ো না···তুমি কি নেশা করেছ?...

পাপিয়া তীব্র স্বরে গর্জ্জিয়া উঠিল,—না, মিছে কথা! আমি নেশা করিনি। এ চার-পাঁচদিন কেবলি সেই রাত্রির কথা ভেবেচি···যাবার সময় বলে গেছলুম না—আমার মধু-যামিনী? তুমি অন্ধ, তাই আমার পানে চেয়েও তখন আমার মনের ভিতরকার কোন সন্ধান পাওনি!... সেদিন যাবার সময় পা আমার চৌকাঠে বেধে গেছলো, পা সরছিল না,···তুমি অন্ধ, তা দেখেও দেখোনি!

অমল কহিল,—এখনো বলচি, তোমার মনের ঠিক নেই। অসুস্থ হয়ে থাকো, বল, তোমার লোকজনদের ডেকে আনি। তোমার...

পাপিয়া কহিল,—কাকে ডাকবে! আমি একলা এসেছি ভাড়া গাড়ী করে। সে গাড়ী চলে গেছে...তাকে কাল সকালে আবার আসতে বলেছি।

অমল কহিল—আজ রাত্রে থাকবে কোথায়?

পাপিয়া কহিল—এখানে, এই ঘরে, এই বিছানায়, আমার এই স্বপ্নের স্বর্গে...বলিয়া পাগলের মত পাপিয়া বিছানায় একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

অমল প্রমাদ গণিল। এ কি কুহকিনীর হাতে পড়িল সে! এ যে একেবারে অসম সাহসে তাকে আয়ত্ত করিতে আসিয়াছে...রমণী কি উন্মাদিনী...!

পাপিয়া বিছানায় অবসন্ন মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া রহিল। অমল ভাবিল, অমনি ও পড়িয়া থাকুক—উহাকে ঘাঁটাইয়া কাজ নাই! যে কিছু বুঝিবে না, তার সঙ্গে বাদানুবাদে ফল কি!—চরিত্র-হীনা নারী...তার উপর হয়তো মদ খাইয়া যা-তা বকিতেছে!...

অমল চুপ করিয়া জানলার ধারে গিয়া বসিল। জোয়ারের জল চাঁদের জ্যোৎস্না গায়ে মাখিয়া ছল-ছল বহিয়া চলিয়াছে...

কতক্ষণ এমনি ভাবে সে বসিয়াছিল—বাহিরের পানে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া, হত-চেতনের মত।...হঠাৎ কার করস্পর্শে চেতনা হইল। সে চাহিয়া দেখে, পাপিয়া।

পাপিয়া কহিল—রাগ করো না। তোমার রাগ আমি সহ্য করতে পারবো না।...বল, রাগ করবে না?—এখানে সেই একটি রাত্রি বাস...তার ফলে যেন আমার

পুনর্জন্ম হয়েছে...! কি করে হলো, জানি না। খেয়াল ভেবে নিজের মনকে অনেক বুঝিয়েচি—মন বোঝে নি!... আজ আর থাকতে পারছিলুম না, তাই চলে এসেছি... একটু প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার পানে চাও...চাও না গো!... আমার এই রূপ, এই দেহ...চেয়ে দেখ,—এ কি সত্যিই উপেক্ষা করবার মত?

অমলের রক্ত হিম হইয়া গেল,—তার বুক যেন নিমেষে পাষাণে পরিণত হইয়া পড়িল। সে কেমন যন্ত্র-চালিতের মত পাপিয়ার পানে চাহিল; পাপিয়া তখন অমলের দুই কাঁধে ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে! তার উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস-বায়ু ঝড়ের মত অমলের মুখে লাগিল—সে বাতাসে কি তাপ!... পাপিয়ার দুই চোখে জল,—আবেগে সে কাঁপিতেছে! অমল কহিল,—তুমি স্থির হয়ে বসো দিকি...এ-সব কি যে বলচো তুমি, আর কাকেই বা বলচো, তা তুমি কিছুই বুঝচো না...

পাপিয়া খানিকটা নিশ্বাস লইয়া স্থির দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল—আমি কিছু ভুল বুঝচি না···যা বলচি,...তা তুমি যে কেন বুঝচো না?—এ যে আমার প্রাণের কথা···

অমল নিরুপায়ভাবে চুপ করিয়া রহিল। পাপিয়াও স্তব্ধভাবে তেমনি আকুল দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিয়া রহিল। কাহারো মুখে কোন কথা নাই...

এমন সময় দিগন্ত কাঁপাইয়া প্রলয়ের কোলাহল তুলিয়া ঝড় উঠিল। মড়-মড় শব্দে গাছপালা দোলাইয়া ভাঙ্গিয়া ভীষণ ঝড়! অমলের জীর্ণ গৃহের দ্বার-জানালাগুলা দুম্‌দাম্ শব্দে কাঁপিয়া মাথা আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল—দম্‌কা বাতাসে ঘরের ক্ষীণ প্রদীপের আলোটুকুও নিবিয়া গেল। জমাট কালো অন্ধকার ঘরখানিকে সুনিবিড় আলিঙ্গনে ঘিরিয়া ধরিল...বাহিরে চাঁদের আলো নিবিয়া গিয়াছে... চাঁদ তার কিরণরাশি কুড়াইয়া লইয়া কোথায় একটা বিরাট মেঘের আড়ালে লুকাইয়া পড়িয়াছে! অন্ধকারের আবরণে বিশ্ব আপনাকে সত্রাসে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

ভয়ে পাপিয়া অমলকে ধরিল এবং তার শরীরের উপর আপনার সমস্ত ভার দিয়া লতার মত আশ্রয় মাগিল। অমল নিরুপায়ভাবে পাপিয়াকে টানিয়া শয্যায় বসাইয়া দিল, এবং দ্বার-জানলাগুলা বন্ধ করিয়া ঘরে আবার প্রদীপ জ্বালিল। প্রদীপ জ্বালিয়া তারি আলোয় সে চাহিয়া দেখে, পাপিয়া শয্যায় লুটাইয়া পড়িয়া দুই চোখে জলের ধারা বহাইয়া দিয়াছে। সে এক-বার মুহূর্ত্তের জন্য পাপিয়ার পানে চাহিল, তার পর মেঝের একধারে একটা বাক্সে ঠেশ দিয়া বসিয়া পড়িল, বসিয়া চক্ষু মুদিল।

৬

তার পর রাত্রে কখন ঝড় থামিল, আর কখনই বা সে ঘুমাইয়া পড়িল, সে-সব অমল কিছুই জানে না। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে চাহিয়া দেখে, ঘরে সে একা, পাপিয়া নাই! অমল উঠিয়া নিজের ছোট গৃহের বাহিরে খুঁজিল, পাপিয়া নাই। তখন সে ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, তার কাপড়-চোপড়গুলি পরিপাটী করিয়া সাজানো রহিয়াছে; খাতা ও বইগুলা কাঠের বাক্সর উপর ছড়ানো পড়িয়া ছিল, সেগুলিও কে গুছাইয়া রাখিয়াছে! নিশ্চয় এ পাপিয়ার কাজ! অমল বইগুলা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। একখানা বহির মধ্যে একটা চিঠি...! সে চিঠিখানা তুলিয়া পড়িল। চিঠিতে লেখা আছে...

"তুমি নিষ্ঠুর পাষাণ-বুকে যার চিন্তাটুকু লইয়া, আমার পানে ফিরিয়া চাহিলে না, জানো না, সে কত বড় পাষাণী, কত বড় রাক্ষসী! সে তোমার এ ধ্যানের দাম জানে না, বোঝেও না তা! তবু তুমি তারই জন্য আমার পানে ফিরিয়া চাহিলে না! আমায় যেমন নিরাশ করিয়া ফিরাইয়াছ, তার কাছে এর চেয়ে ঢের বেশী নিরাশা পাইয়া জলিবে, তা তুমিও জানো! তবু তারি ধ্যানে তোমার কি সুখ, তা তুমিই বোঝো!

আমার কি নাই? ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, রূপ, যৌবন... মানুষ যা কিছু কামনা করে, আমি তা সব তোমায় দিতে পারিতাম! তুমি মূর্খ, তাই হেলায় তুমি রাজার রাজত্ব হারাইলে!

কে তুমি? পথের কাঙাল! কি তোমার আছে? কি তুমি দিতে পারো?···কিছু না! তবু কেন তোমার কাঙাল হইয়া অমন নির্লজ্জের মত আসিয়াছিলাম? তার কারণ জানো কি? আমার আশে-পাশে ভক্তের দল ষোড়শোপচারে আমায় পূজা যোগাইতেছে—সে পূজা

পাইয়া পাইয়া আমি শ্রান্ত হইয়াছি, মন আর তাতে বসেও না! তোমার ঘরে আসিয়া তোমার যে নিষ্ঠা, যে ধ্যান দেখিয়া গিয়াছি, তার জন্যই আকুল হইয়াছিলাম। যদি এই বনের মধ্যে এই ভাঙা কুঁড়েয় আমায় পাশে রাখিতে, তা হইলে আমি সব ত্যাগ করিয়া তোমারি হইতাম!...

তোমার জন্য আমি সব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম। সে ত্যাগের মর্ম্ম...তুমি মূর্খ, উন্মাদ, কি বুঝিবে!

এর জন্য কোনদিন কি তুমি অনুতাপ করিবে না? আমি বলিতেছি, করিবে। ঐ রাক্ষসীর ধ্যানে নিরাশার ঘা খাইয়া খাইয়া যেদিন জীর্ণ হইবে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে, সেদিন বুঝিবে, কি-বস্তু কি মিথ্যা দর্পের ভরেই তুমি হারাইয়াছ! একদিন এই আমারি জন্য তুমি পাগল হইবে! কিন্তু তখন—থাক্ সে কথা!

যদি কোনদিন আমায় চাও, ডাকিয়ো...তোমায় রাজার ঐশ্বর্য্যে ভরাইয়া দিব। তোমার আশা একেবারে ছাড়িতে পারিলাম না—তবে এমন দীন ভিখারিণীর মতও তোমার দ্বারে আর আসিব না, জানিয়ো। যদি মন না মানে, মনের গলা টিপিয়া মারিব।...যাইবার সময় তোমার কপালে একটি চুম্বন রাখিয়া গেলাম।...মূঢ় মন!

পিয়ারী।

চিঠি পড়িয়া অমল স্তব্ধভাবে শয্যায় বসিয়া পড়িল। তার চোখের সামনে বাগান গাছপালা সব ঝাপ্‌সা হইয়া গেল—পায়ের নীচে পৃথিবীখানা বিষম দোলে দুলিয়া উঠিল।... চিঠিখানা আর-একবার খুলিয়া সে চোখের সামনে ধরিল... এ কি এ, অক্ষরগুলা যেন আগুনের মত জ্বলিতেছে—! সর্ব্বনাশ! এ কি লিখিয়াছে পিয়ারী! নিতান্ত সরল মনে কোনো সাধ-আশার সন্ধান না রাখিয়া নিতান্ত নিরীহের মত সে শুধু কবিতা লেখে,...চপলা কোথায় থাকে, কোনদিন তার দেখা মিলিবে কি না, তাকে পাওয়া তো পরের কথা—এ-সব না ভাবিয়াই সে কবিতা লেখে...সেই কবিতার কয়টা ছত্র পড়িয়া এই সুন্দরী, তরুণী, ঐশ্বর্য্যের রাণী—সে এক দুঃখী কাঙালের হৃদয়-মনের দ্বারে এমন ভিখারিণীর মত আসিয়া লুটাইয়া পড়িল! এ কি এ—সেও পাগল হইয়াছে, তাই এগুলাকে সত্য ভাবিতেছে! না, না, এ সব স্বপ্ন! সে জাগিয়া আরব্য উপন্যাসের রঙীন স্বপ্ন দেখিতেছে! ...স্বপ্ন ছাড়া এ আর কিছু হইতেই পারে না!

কিন্তু না, স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিবারো তো উপায় নাই! পিয়ারী যে আসিয়াছিল তা সত্য, কঠিন সত্য! আর এই চিঠি সেই কঠিন সত্যের মূর্ত্তি লইয়া তাহারি চোখের সামনে!

অমল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার মাথার মধ্যে কি যেন দপ্‌দপ্ করিতেছিল, বুক অসহ্য ভারে ভারী বোধ হইতেছিল। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে ঘরের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, অলস কল্পনায় কি সে এমন লিখিয়াছে বা পড়িয়া...

অমল কবিতার খাতা তুলিয়া তার পৃষ্ঠাগুলার উপর চোখ বুলাইয়া লইল। মিথ্যা কথা, মিথ্যা সাধ, মিথ্যা আশার মালা গাঁথিয়াছে সে! দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি ধরিয়া এই অলস কল্পনা!...মিথ্যা নেশা, এ মিথ্যা মোহ! সে যে এই লিখিয়াছে—

ওগো বিজন বনের মাঝে একা,...
বড়ই একা, আমি বড় একা...
কোনোদিন কি কোনো সন্ধ্যাবেলা,
জ্যোৎস্না-রাতে চাঁদের লীলাখেলায়
এই বিজনে মনের মত মেলায়
পাব না কি ওগো, তোমায় দেখা!

এ কি সত্যই সে এমন আশা করিয়া লিখিয়াছে যে, একদিন উত্তেজনার বশে তার জীর্ণ গৃহে সে আসিয়া দেখা দিবে?... না, না।...সে জানে, এ আশা তার বাতুলতা! তবে? কবিতা লেখা বলিয়াই লিখিয়াছে। সে তো সত্যই অন্ধ নয়, মূঢ় নয়, বাতুল নয় যে, এমন আশা করিবে!

অমল খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল...এ কি, সামনের পাতায় চপলার যে ছবিখানি আঁটা ছিল, সে ছবিখানিকে কালি লেপিয়া তাকে কদর্য্য মলিন অস্পষ্ট করিয়া দিল কে! এই যে ছবির তলায় লেখা—"সর্ব্বনাশী, পোড়ারমুখী...নিপাত যা"। এ যে...অমল চিঠির লেখার সহিত এ লেখা মিলাইল। এ পাপিয়ার হস্তাক্ষর!...ছবিখানায় কালি লেপা! এ'ও তবে তার কাজ!—অমল অবাক হইল। তার রাগ হইল—একখানি নিরীহ ছবি...তার প্রতি এ কি প্রচণ্ড বিদ্বেষ এই নারীর! অমল শিহরিয়া উঠিল।

বহুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে বসিয়া থাকিবার পর সে শয্যায়

গিয়া বসিল। বালিশটা কোলে লইতেই কি একটা হাতে ঠেকিল! একটা আংটি! তাতে মস্ত এক-টুকরা চুণী পাথর বসানো...লাল টকটক করিতেছে...এ পিয়ারীর আংটি! নিশ্চয়! ফেলিয়া গিয়াছে! সর্ব্বনাশ!

অমল আংটি হাতে লইয়া বাগানের দিকে ছুটিল। মালীকে ডাকিয়া খপর লইয়া জানিল, বিবি সকালে একবার আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চকিতের জন্য! বাগানে আসিয়া মুখ-হাত ধুইয়া একটু চা খাইয়াছে, তারপর একটা ভাড়া গাড়ী কোথা হইতে আসিয়া ফটকে দাঁড়াইল, তিনিও অমনি সেই গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন!

অমল চোখে অন্ধকার দেখিল। তাই তো, আংটিটা তবে ফিরানো যায় কি করিয়া! রাখিয়া দিবে?...যদি হারাইয়া যায়?...কি বিপদ! মালীর কাছে রাখিয়া যাইবে? না। কি জানি, ছোট লোক, যদি গাপ্ করিয়া বসে! তার চেয়ে ঠিক! সে মালীকে প্রশ্ন করিল,—বিবি কোথায় থাকে, ঠিকানা জানো?

মালী কৌতূহল দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিল। অমল কহিল,—আমার একটু দরকার আছে তাঁর কাছে। জানো তাঁর ঠিকানা?

মালী একটু অবাক হইয়াই বলিল, ঠিকানা সে জানে। কাগজে লেখা আছে।

অমল কহিল,—দেখি।

মালী অমলকে লইয়া ঘরে গেল, এবং তার কালো কাঠের বাক্স খুলিয়া একটা গেঁজিয়া বাহির করিল। তার পর গেঁজিয়ার মধ্যে হাত পুরিয়া একটুকরা কাগজ বাহির করিল। অমল সেই টুকরা কাগজে লেখা ঠিকানাটা লইয়া বাগান ছাড়িয়া নিজের ঘরে ফিরিল।

ফিরিয়া সে তখনি আবার উঠিল। যাইবে কি সেখানে!...কি জানি, এ-সব ব্যাপারের পর অভ্যর্থনা কেমন হইবে! যদি আবার এম্‌নি সব কথার বাণ সহ্য করিতে হয়...তেমনি মিনতি! তেমনি অশ্রুময় আবেদন... কত লোকের সামনে...! যদি বিবাদ ঘটে..। যদি বাবুরা তার এ-সব রহস্য বুঝিয়া তাকে নির্য্যাতন করে!

অমল হাসিল, এও কি সম্ভব! বাবুরা এ-সবের কিছু জানেও না! চরিত্রহীনা নারী! তার কি না সংযম! এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় নেশার ঝোঁকে কি সব বকিয়া গিয়াছে—তা কি তার নিজেরই এখনো মনে আছে! সে পাগল, তাই ঐ কথাগুলা লইয়া এমন করিয়া ভাবিয়া মরিতেছে! এ সব কিছু নয়—রঙ্গিণীর ক্ষণিক রঙ্গ, খেয়ালী নারীর মুহূর্ত্তের খেয়াল শুধু, নেশা...! তাছাড়া আর কিছু নয়...!

অমল স্থির করিল, দুপুর বেলায় সে যাইবে—এখন তো ছাত্র দুটিকে পড়ানো চাই। আংটিটা সযত্নে বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া সে ঘর বন্ধ করিল এবং ছাত্রদের পড়াইবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু পড়াইবার মন কোথায়! কাণের কাছে ঝড়ের সেই বিকট গর্জ্জন...আর তার অন্তরালে সেই বেদনা-আকুল আর্ত্ত স্বরে মিনতির ধারা...! অমলের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল।

দুপুরবেলায় সে ভাবিল, অত লোকের ভিড়ে, সেই কোলাহলের মাঝে সে যাইবে কি করিয়া! হয়তো সে তার সহচর-সহচরী লইয়া কালিকার ঘটনাটা দুঃস্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া তাকে বিদ্রূপ-বাণে জর্জ্জরিত করিয়া সেখানে কত রঙ্গই করিতেছে! সে গেলে তখনি হয়তো তার কবিতাগুলিকে, তার মনের অতি-গোপন গানকে কি খোঁচায় যে জর্জ্জরিত করিবে!—তার প্রসঙ্গ লইয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িবে...না, না, এ সে সহ্য করিতে পারিবে না!...ছবি—একটা তুচ্ছ ছবিকেই কালি লেপিয়া বিশ্রী কদর্য্য করিয়া দিয়া গেল!...তার অসাধ্য কি আছে!

অমল ভাবিতে লাগিল। তার শান্তিভরা বিজন ঘর, তার সহজ তৃপ্ত সরল মন—এ লইয়া সে নিশ্চিন্ত আরামে বাস করিতেছিল...ঝড়ের মত সে আসিয়া তার সে ঘরে অশান্তি-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া, সে মনে ঝড় তুলিয়া এ কি করিয়া গেল!...অমল তো তার কাছে কোন অপরাধ করে নাই...তার দ্বারে তার শান্তি-সুখে এতটুকু আঘাতও কোন দিন দিতে যায় নাই! তবে? সে কেন এমন করিয়া অমলকে দারুণ বিশৃঙ্খলার মাঝে ফেলিয়া গেল!...খেদে হতাশ্বাসে অমলের দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল।

(ক্রমশঃ)

হস্তপদাদির বিকৃতি ও বৈচিত্র্য

কাপ্তেন শ্রীসত্যকুমার রায়, এম্-বি

অস্থি আমাদের শরীরের ঠাট বা কাঠাম। শরীরের বিভিন্ন অস্থির সামঞ্জস্য ও পরিপুষ্টিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন সুন্দর হয়, ও দেহ কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। জন্মাবস্থায় এই কাঠামটি যথাবিন্যস্ত না থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব পরিপুষ্ট ও যথাযথ সুন্দর রূপে পরিবর্দ্ধিত হয় না। সর্ব্বাঙ্গ-পুষ্ট অবয়ব-বিশিষ্ট লোক বড়ই বিরল। অবশ্য পিতামাতার দৃষ্টিতে তাঁহাদের সকল সন্তানই সুন্দর।

বর্ণ উজ্জ্বল থাকিলেই লোক সুন্দর দেখায় না। অঙ্গ-সৌষ্ঠবই সৌন্দর্য্যের পরিমাপক; তাহার সহিত যদি বর্ণ উজ্জ্বল গৌর হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই।

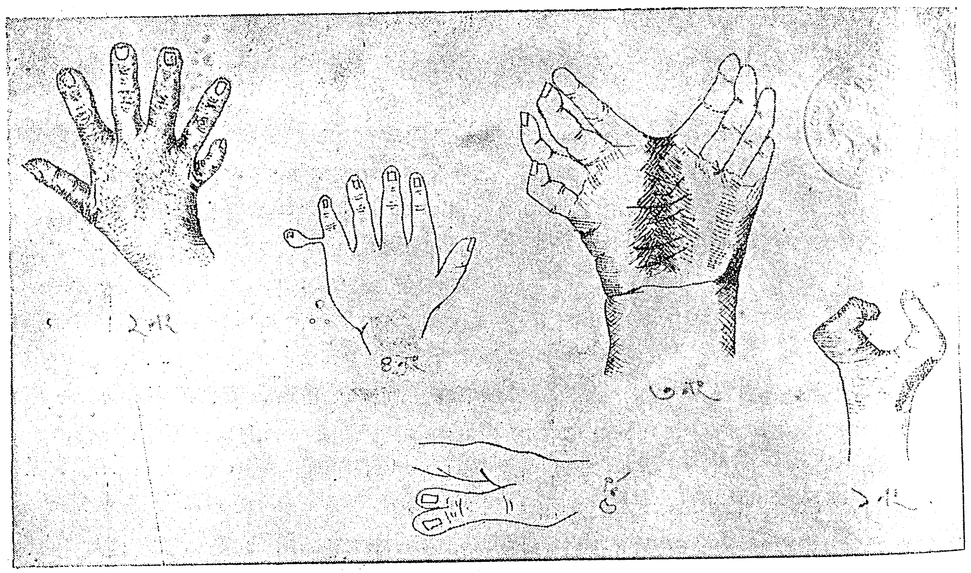

হস্তের অঙ্গুলির বিকৃতি

প্রকৃতির বৈচিত্র্যে সময় সময় আমরা বিকলাঙ্গ মনুষ্য দেখিতে পাই। কার্য্যক্ষমতার দিক দিয়া দেখিতে গেলে হস্তই আমাদের বিশেষ কার্য্যকরী। সেই জন্য হস্তের গঠন-বিকৃতি বা অসামঞ্জস্যের দিকেই আমাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। বিকৃত-পদ মনুষ্যের সংখ্যাও কম নহে। পদের বিকৃতি চলিবার সময় ধরা পড়ে। হস্ত-পদ বেশ কার্য্যক্ষম থাকিলে, শরীরের অন্যান্য অস্থিগুলিও সম্যক রূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে পায়।

সাধারণ লোকের হাতে ও পায়ে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি আছে। কিন্তু সময় সময় ইহাদের সংখ্যা কমিয়া বা বাড়িয়া যাইতে দেখা যায়। হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের স্থানে দুইটিও দেখা যায় (১ নং ছবি); আবার ছয়টি, আটটিও অনেক সময় দেখা যায়। (২, ৩নং ছবি) এমন কি, দশটি বা বারটি পর্য্যন্তও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ছয়টির বেশী অঙ্গুলি হইলে সেইগুলি প্রায়ই বাঁকা ও ছোট হয় এবং সেইজন্য সেই আঙ্গুলগুলি অকর্ম্মণ্য হয়। বংশানুক্রমে এইরূপ বহু-অঙ্গুলিবিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মিতে দেখা যায়। কিন্তু ঐ অঙ্গুলিবিশিষ্ট লোকের অঙ্গুলি-সঞ্চালন ভাল করিয়া দেখিলে বেশ বোঝা যায় যে, তাহার ছয়টী অঙ্গুলিই বেশ কার্য্যক্ষম; বরং এই ষষ্ঠ অঙ্গুলিটি তাহার কাজের অধিক সহায়তা করে। এই ষষ্ঠ আঙ্গুলটি প্রায়ই কনিষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পর দৃষ্ট হয়। সময় সময় এই ষষ্ঠ অঙ্গুলিটি (৪ নং ছবি)

এই দুই অঙ্গুলি হইতে ঝুলিয়া থাকে; তখন কিন্তু ইহা কার্য্যকরী হয় না। এ অবস্থায় ঐ অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলেই ভাল হয়। কখন কখন একটি আঙ্গুল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। (৫ নং ছবি)

কাহারও কাহারও কয়েকটি অঙ্গুলি যুক্ত অবস্থায় দেখা যায়। কেবল যদি দুইটি অঙ্গুলি জোড়া থাকে (৬ নং ছবি), তাহা হইলে কাজের কোন অসুবিধা হয় না। আঙ্গুলগুলি আবার কখন কখন হাঁসের পায়ের মত পাত্‌লা চামড়ায় জোড়া থাকে (৭ নং ছবি)। এই চামড়া কাটিয়া আঙ্গুলগুলি ফাঁক করিয়া দিলে তাহারা কার্য্যক্ষম হয়। শিশু অবস্থায় ইহাতে অস্ত্রচিকিৎসা করা যায়। অন্য প্রকারে জোড়া থাকিলেও ৪ বা ৫ বৎসর বয়সে অস্ত্রচিকিৎসা করান উচিত। আঙ্গুল বাঁকা বা শরীরের অবয়বের তুলনায় খুব ছোট বা সরু প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

পায়ের আঙ্গুলের সংখ্যা হাতের আঙ্গুলের মত কমিয়া বা বাড়িয়া যায়।

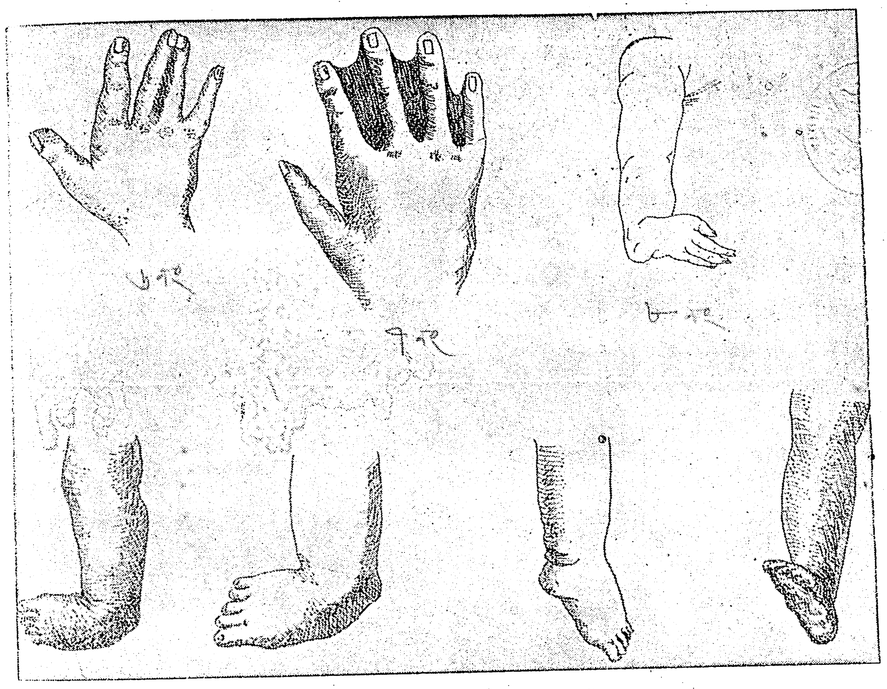

আঙ্গুলের বিকৃতি ছাড়া, সমুদায় হাতটি বাঁকা হইতে পারে (৮ নং ছবি)। বাঁকা হাত অপেক্ষা বাঁকা পা বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজীতে এইরূপ বাঁকা পা-কে "টেলিপিজ্" (Telipes) বা "ক্লাব্ ফুট্ (Clubfoot) বলে। এই বিকৃতি অবস্থাপন্ন শিশুরা চলিতে আরম্ভ করিলে পায়ের তলা ভূমিতে সমান ভাবে পড়ে না। তাহারা কখনও বা ঘোড়ার মত কেবল পায়ের অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া (৯ নং ছবি) চলে; কখনও বা কেবল গোড়ালি দিয়া চলে (১০ নং ছবি)। আবার কখন বা পায়ের ভিতর বা বাহির দিকটা দিয়া চলে (১১, ১২ নং ছবি)। এই বিকৃতির বেশীর ভাগই এক রকম হয় না। উপরি-উক্ত দুই বা ততোধিক বিকৃতি এক পায়েই থাকে। সেই জন্য পায়ের বক্রতাও বেশী হয়।

এই সকল বিকৃতির কারণ কি, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে প্রথমে আমাদের পা দুইটি ঐরূপ বক্রাবস্থায় থাকে, কিন্তু জন্ম হইবার পূর্ব্বে উহারা ঘুরিয়া সোজা হয়। অনুমান হয় যে, গর্ভাশয়ের

কোন দোষ বশতঃ পা না ঘুরিতে পারিলে, উহা বক্র ভাবেই থাকিয়া যায়। ইহা ছাড়া অন্য কারণও আছে, যাহাতে পা বাঁকিয়া যাইতে পারে। যেমন সময় সময় শিরদাঁড়ার (Vertebral Columa) নীচের দিকের হাড় জোড়া না লাগার দরুণ ফাঁক থাকে। এইরূপ অবস্থার নাম ইংরাজীতে "স্পাইনা বাইফিডা" (Spina Bifida)। এই ফাঁকের ভিতর দিয়া মেরুদণ্ডের স্নায়ু সমস্ত স্থানচ্যুত হয় এবং অবশ হইয়া যায়। আমাদের পায়ের পেশীসমূহ এই সব স্নায়ুর দ্বারা পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। স্নায়ুর অবশতার জন্য মাংসপেশীও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। এই মাংসপেশীগুলি হাড়ে সংযুক্ত আছে; সুতরাং পায়ের হাড়গুলিও যথাস্থানে না থাকিয়া বক্র ভাব ধারণ করে।

পায়ের মত একটা বা দুইটা হাঁটু বাঁকা হয় (১৩ নং ছবি)। কখনও চলিবার সময় দুই হাঁটু ঠেকে, পা দুটি ফাঁক থাকে (১৪ নং ছবি); আবার পা দুইটি জোড়া করিলে ধনুকের মত হাঁটু দুইটি বাহিরের দিকে বাঁকিয়া ফাঁক থাকে। কখনও বা হাঁটু পশ্চাতে বা সম্মুখেও বাঁকে।

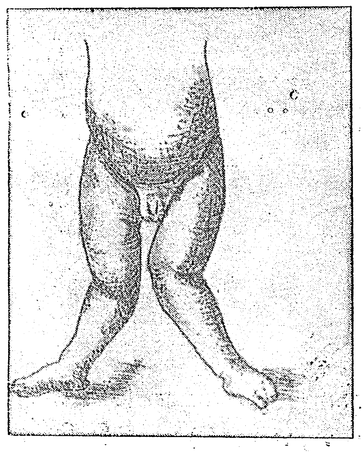

১৩ নং বক্র পদ

উরুর অস্থি (Femur), শিরদাঁড়ার অস্থি, বুকের অস্থি বা পাঁজরা ইত্যাদি সমুদায় বাঁকা হইতে পারে। জন্মজ কারণ ব্যতীত নানারূপ রোগেও অস্থি প্রথমে সোজা থাকিলেও পরে বাঁকা হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে "রিকেট" (Ricket) ব্যাধিতে অস্থির ক্ষতি বেশী হয়। এই ব্যারামটিও আমাদের দেশে বড় কম দেখা যায় না। ইহাতে শিশুদিগের একটু একটু জ্বর হয়, পরিপাক-শক্তি কমিয়া যায়; শিশুরাও রুগ্ন হয়। আহারের দোষে এই ব্যারামের উৎপত্তি হয়। বহু-সন্তানবিশিষ্ট গৃহে বা খুব গরীব অবস্থার জন্য শিশুর নিয়মিত আহার ও যত্ন না হওয়ায়, অস্থি

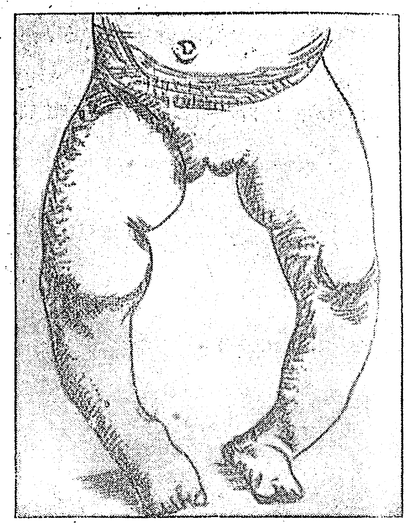

১৪ নং ধনুকের মত পদ

পরিপুষ্ট হইতে পায় না; এবং ফলে নরম হইয়া নানা বক্র রূপ ধারণ করে। এই ব্যারামে শরীরের সমস্ত হাড়ই বাঁকা ও ছোট হইয়া যাইতে পারে। আবার "এক্রোমেগালি" (Acromegaly) নামক আর এক প্রকার ব্যারামে এই "রিকেট" ঠিক উল্টা হয়। ইহাতে হাড় খুব বড় হয়,—এত বড় হয় যে মানুষের আকার ভীষণ দেখায়।

"ইনফেণ্টাইল পেরালিসিস্" (Infantile paralysis) নামক আর এক ব্যাধি আছে। ইহাতে শিশুদিগের দুই এক দিন জ্বর হয়। তাহার পর দেখা যায় যে, তাহারা আর হাত বা পা নাড়িতে পারে না। এই ব্যারামে হাত পায়ের কতকগুলি স্নায়ুর মূল নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্নায়ুর সহায়তায় মাংসপেশী চালিত ও পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং ইহারা নষ্ট হইয়া গেলে মাংসপেশী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়; ও সঙ্গে সঙ্গে হাড়েরও অনিষ্ট হইয়া উহারা বক্র ভাব ধারণ করে। কিন্তু প্রথম হইতে যত্ন সহকারে চিকিৎসা করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। এই ব্যারামের চিকিৎসায় সুফল লাভ করিতে

অনেক দিন লাগে। যাহাতে মাংসপেশী সমূহ ক্ষীণ না হয় ও হাড় বাঁকিয়া না যায়, তাহার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথম হইতে অবহেলা করিলে, পরে যথারীতি চিকিৎসাতেও তেমন আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে কিম্বা সরিয়া গেলে, যদি তাহা যথাস্থানে বসান না হয়, তাহা হইলে হাড় বাঁকা ভাবেই জুড়িয়া বা থাকিয়া যায়। সেইজন্য এইরূপ অবস্থায় যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা উচিত। একবার বক্রভাবে জোড়া লাগিলে সেই অঙ্গটি আগের মত আর কার্য্যক্ষম হয় না। এই রূপ বক্র অস্থি আজ কাল অস্ত্র-চিকিৎসায় সোজা করা যায়।

আবার ব্যবহার বা অভ্যাস দোষেও হাড় বাঁকিয়া যায়। শিশুরা যদি কুঁজা হইয়া বা বাঁকিয়া বসিতে অভ্যাস করে (১৫নং ছবি), তাহা হইলে তাহাদের মেরুদণ্ডের নরম হাড়গুলি সাম্‌নে বা পাশে বাঁকিয়া যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের হাড়ও বাঁকে। যাহারা খুব ভারি দ্রব্য স্কন্ধে বা মস্তকে সর্ব্বদা বহন করে, তাহাদেরও শিরদাঁড়ার হাড় বাঁকিতে দেখা

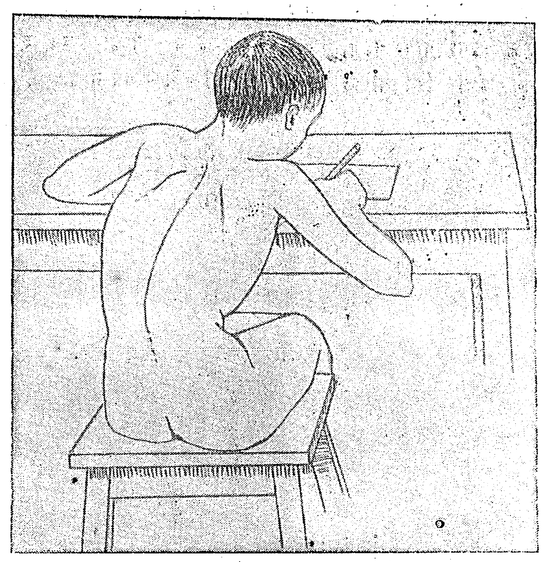

১৫নং বক্র মেরুদণ্ড

যায়। আমাদের জুতার দোষেও পা বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। খুব সরু-মুখ জুতা পরিলে পায়ের আঙ্গুলগুলি খেলিতে পায় না,—ক্রমশঃ ছোট হাড়গুলি বাঁকিয়া যায়। গোড়ালী উঁচু হইলে শরীরের সমুদায় ভার আঙ্গুলগুলির উপর গিয়া পড়ে, সুতরাং তাহারা বাঁকিয়া যায়। এইরূপ পায়ে ভাল হাঁটা যায় না। এই সব বিকৃতি বা বিকলাঙ্গের কথা অনেক বলা যাইতে পারে; এবং উহাদের চিকিৎসারও আজ কাল এত উন্নতি হইয়াছে যে, চিকিৎসার ফল দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বাঁকা হাড় কাটিয়া সোজা করা যায়, আবার হাড় না থাকিলে অন্য কাহারও দেহাস্থি অসম্পূর্ণ স্থানে লাগান যায় (Bone transplantation)। মাংস-পেশী অবশ হইয়া গেলে সুস্থ মাংসপেশীর সহিত উহা জোড়া লাগাইয়া (Tendon transplantation) পুনরায় কার্য্যক্ষম করান হয়। স্নায়ু অবশ হইয়া গেলে সুস্থ স্নায়ুর সহিত যোগ করাইয়া (Nerve Transplantation) পুনরায় তাহার দ্বারা কাজ করান হয়। অন্যান্য দেশে এই সব চিকিৎসার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

কিসের ডর ?

শ্রীবা————

মানুষ ওরাও, ওদের কেন করিস্ তবে ডর ?
দেবতা নয়, দানব নয়, ওরা নয় ত অমর।
ওদের জুতা মাথায় করে ঘুরিস্ কেন তবে ?
মাথা ঝেড়ে ওঠ্ না কেন, নাম রাখ্ না ভবে!
পরের জুতা, পরের লাথি, লাগে এতই ভাল ?
বুঝিস্ না কি এতে দেশের মুখ হ'য়েছে কাল ?
মোটা কাপড়, মোটা ভাতেই থাক্‌তে সুরু কর,
পরের দেশে হুলুস্থুল বাধবে এরই পর।

ওদের জিনিষ এলে হেথায় কিন্‌বি না ভাই কভু,
কি ভয়! ওরা সত্য সত্য নয় ত তোদের প্রভু!
সমান করে পা ফেলে ভাই চল্ রে ওদের সনে,
বুক ফুলিয়ে চল্‌তে শেখ, সাহস কর্‌রে মনে।
ওদের দমন করতে গেলে মিলন আগে চাই,
তোদের মধ্যে সে জিনিষটা একেবারেই নাই।
নিজের মধ্যে দলাদলি করিস্ যদি ভাই,
ওরা হাসবে, আর ভাব্‌বে সবাই "এই ত আমরা চাই!"

চন্দননগরের ক্রীড়া-কৌতুক *

শ্রীহরিহর শেঠ

পূর্ব্বে দেশে কুস্তি খেলার বিশেষ আদর ছিল; সুতরাং কুস্তিগির পালোয়ান এবং কুস্তির আখড়া স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইত। অধুনা পালোয়ান বলিয়া কাহারও পরিচয় এ প্রদেশে বড় একটা শুনা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে পালোয়ানের কথা শুনা যাইত এবং সেখানে দেখিতে পাওয়া যাইত। অবশ্য উহার উদ্দেশ্য বিষয়ে বিশেষ কিছু সাফল্য লাভ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায় না। যে দুই পাঁচজন পালোয়ান বা কুস্তিগিরের এখানে এ পর্য্যন্ত উদ্ভব হইয়াছে, তাহা তাহারই ফল বলিয়াও মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে এখানে কুস্তি খেলার

আই, এফ, এ, শিল্ডের বিজয়ী মোহন বাগান।—১৯১১
ছবির মধ্যের লাইনের বামদিকের প্রথম—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সরকার ওরফে হাবুল সরকার

লোকে তাহাদের নাম করিত, প্রতিযোগিতা হইত, বলবত্তার আলোচনা চলিত। আজকাল থিয়েটার, ফুটবল বা ভেল্ দিগ্ দিগ্ খেলা যেমন সহরের পল্লীতে পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে এক সময় কুস্তি খেলা ও জিমনাষ্টিকের আড্ডাও তেমনি চন্দননগরের যেখানে ইতিহাস বা বিবরণ তেমন কিছু বলিতে পারিব না, আর কয়েকজন পালোয়ানের কথা বলিব।

গোন্দলপাড়ায় রাধানাথ বেড়েল নামক গোপ জাতীয় একজন প্রসিদ্ধ পালোয়ান ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল। কথিত আছে, এক সময় কলিকাতার দুর্গা

* এই প্রবন্ধে লিখিত বিষয়ের মধ্যে কেহ কোন ভুল দেখিলে বা কাহারও কোন নূতন কথা জানা থাকিলে, তাহ অনুগ্রহপূর্ব্বক লেখককে চন্দননগরের ঠিকানায় জানাইলে বাধিত হইব।

মধ্যে ইয়োরোপ হইতে একজন মহাবলশালী কুস্তিগির পালোয়ান আইসেন। তিনি ঘোষণা করেন, মল্ল যুদ্ধে যে কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন; এবং পরাজিত হইলে ঐ পরিমাণ টাকা তাঁহাকে দিতে হইবে।

তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয় স্বর্গীয় রামধন বাবুর তখন বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি রাধানাথকে বড়ই স্নেহ করিতেন। সাহেবের এই ঘোষণার কথা শুনিয়া, তিনি রাধানাথকে উহার সহিত কুস্তি করিতে

ফুটবল ম্যাচ

অনুরোধ করিলেন। পরাস্থ হইলে, রাধানাথের হাজার টাকা দূরে থাক, হাজার পয়সা দিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং এই অনুরোধে তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, রাধানাথ পরাস্থ হইলে টাকা তিনি দিবেন, আর জয়ী হইলে প্রাপ্ত টাকা রাধানাথই পাইবে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া রাধানাথ উক্ত সাহেবের সহিত মল্লযুদ্ধের জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত কলিকাতার কেল্লায় গমন করিলেন। সাহেব ইহাতে সম্মত হইয়া দুর্গাধ্যক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

উভয়ের কুস্তির জন্য যে স্থান স্থির হইল, তথা হইতে কতকগুলি কামান গোলা অন্যত্র স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হওয়ায়, অধ্যক্ষের আদেশে বহু সংখ্যক কুলিকে ঐ কার্য্যে নিয়োজিত করা হইল। কুলিদের বিশেষ পরিশ্রম সত্ত্বেও এক একটি কামান সরাইতে অনেক সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাধানাথ বলিল,—"এতগুলি কামান এই ভাবে সরাইতে হইলে ত দশ দিনেও এ কাজ শেষ হইবে না,—বল, কোথায় রাখিতে হইবে, আমি রাখিয়া আসি।"—এই বলিয়া এক একটি কামান লইয়া তিনি স্বচ্ছন্দে অন্যত্র রাখিয়া আসিতে লাগিলেন।

রাধানাথের এই কার্য্যে তাঁহার অমানুষিক বলের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেই পালোয়ান সাহেব আর তাঁহার সহিত কুস্তি করিতে চাহিলেন না; এবং নিজের পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি মত হাজার টাকা দিলেন।

রাধানাথের পূর্ব্বে ও পরে আর তেমন পালোয়ান এখানে কেহ হইয়াছেন বলিয়া জানিতে পারি নাই। অন্য যাঁহাদের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে পালপাড়ার

৺হারাণচন্দ্র ও তৎপুত্র ৺নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ; গোন্দলপাড়ার ৺ দাশরথি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত নলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুৎ ব্রজেন্দ্রনাথ বসু ; সরিষাপাড়ার কালাচাঁদ চন্দ্র ওরফে কালু চন্দ্র ; কাঁটাপুকুরের ৺গগনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গোস্বামীঘাটার ৺জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে পল্টু, ইহারাই প্রধান। ৺হারাণ ও নবীন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পালপাড়ায় উদয়চাঁদ নন্দীর বাগানে আখড়া ছিল। হারাণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যথেষ্ট বলশালী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি উদয়চাঁদ নন্দীর বাগানে একটি বড় লিচু গাছ বিনা অস্ত্র সাহায্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। দুই জনে সজোরে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিলেও তিনি একটি রম্ভা গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন। নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দৈহিক বল অপেক্ষা কুস্তির কৌশল সকল ভাল জানা ছিল। ৺দাশরথি মুখোপাধ্যায় ডম্বেল ও লাঠি খেলায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতার সহিত সাহসও যথেষ্ট ছিল। শুনা যায়, একবার শিয়ালদহ ষ্টেশনে তিনজন সাহেবের সহিত তাঁহার মারামারি হয়, তিনি একাই তিনজনকে পরাস্থ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুষ্টি যুদ্ধে এবং ব্রজেন্দ্রবাবু, কালাচাঁদ চন্দ্র, ৺গগনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সকলেই কুস্তিতে অল্প বিস্তর পারদর্শী ছিলেন ; এবং সকলেই বিলক্ষণ বলবান ছিলেন। কথিত আছে, গগন বাবু তাঁহার কর্ম্মস্থান ছোটনাগপুরে একটি দুরন্ত ঘোড়াকে ভূমি হইতে শূন্যে তুলিয়াছিলেন।

আজকাল মজুমদারগড়ের শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও পদ্মপুকুর সায়রের সুপ্রসিদ্ধ যাত্রার দলের অধিকারী ও খ্যাতনামা বাদক ৺মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর পালোয়ান বলিয়া খ্যাতি আছে। বয়সে প্রাচীন হইলেও কুস্তিতে এখন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমকক্ষ এখানে কেহ নাই। তিনি সুপ্রসিদ্ধ পালোয়ান অম্বু গুহ মহাশয়ের শিষ্য। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ন্যায় বলশালী লোক এখানে উপস্থিত আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। ৫।৬টি বলদে যে সব রোলার টানিয়া থাকে, তিনি একাকী তাহা টানিতে পারেন। তাঁহার এই বলের পরিচয় পাইয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের কোন পদস্থ পুলিশের কর্ম্মচারী তাঁহাকে একটি পুলিশের কাজ দেন। তিনি এক্ষণে পুলিশের ইনস্পেক্টরের কার্য্য করিতেছেন।

এখানে কুস্তির আদর ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। চন্দননগরে এক সময় জিমনাষ্টিকেরও খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। এই উভয় বিষয়েই সহরের উত্তরাংশের লোকের কিছু অধিক উৎসাহ ছিল। শ্রীযুত কান্তিপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, কেশবলাল ধড়, কালীপদ নন্দন, অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সেখ করিমবক্স, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী, নারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু, রামচন্দ্র গোস্বামী ও লক্ষ্মণচন্দ্র গোস্বামী ইঁহারা জিমনাষ্টিক খেলায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে দুই তিনটি ভাল জিমনাষ্টিকের দল গঠিত হইয়াছিল। শশীবাবু স্কেটিং ও তারের খেলায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে পালপাড়ার ৺বীরুচাঁদ বড়ালের বাটীতে পালপাড়ার দলের উদ্যোগে ফরাসী গভর্ণর বাহাদুরকে দেখাইবার জন্য একবার ব্যায়াম-ক্রীড়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লাট সাহেব তাহা দেখিয়া বাঙ্গালীর ছেলের বল ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ফুটবল ও ক্রীকেট খেলার প্রচলনের পূর্ব্বে এখানে ছেলেদের ঘোড়ানুটি, ধাঁসা ও গুলি-ডাণ্ডা খেলায় খুব ধুম ছিল। ঘোড়ানুটি কতকটা ভেল্ দিগ্ দিগের মত খেলা। ছেলেদের মধ্যে মারবেল খেলাও পূর্ব্বে খুব প্রচলিত ছিল। ভেল্ দিগ্ দিগ্ প্রাচীন জাতীয় খেলা হইলেও তখন আজকালের মত এত বেশি প্রচলিত ছিল না। উহার পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ছোট ছেলেদের মধ্যে হাপু খেলা নামে একপ্রকার খেলার খুব আদর ছিল। ভেল্ দিগ দিগ্ খেলায় যেমন মুখে একদমে দিগ্ দিগ্ বা একটা কিছু উচ্চারণ করিতে হয়, সেই খেলায়ও একটি ছড়ার মত বলিত। উহা এই রূপ,—

হাপু হাটে হাপু বাটে হাপু কেনে হাপু বেচে।
হাপু খায় হাপু ধায় হাপু নাচে হাপু গায়॥

শুনিয়াছি পল্লীগ্রামে এখনও কোথাও কোথাও এই খেলা প্রচলিত আছে।*

বালক ও যুবকদের মধ্যে ঘুড়ি উড়ান এখানে বহু পূর্ব্ব কাল হইতে বেশি রকম প্রচলিত ছিল। এখনও ছেলেরা

* শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র কুণ্ডু মহাশয়ের নিকট হইতে এই খেলার কথা জানিতে পারি।—লেখক

ঘুড়ি উড়ায়, কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কম। কেহ কেহ অনুমান করেন, নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের তুলনায় এখানে এ খেলার অধিক প্রচলনের কারণ, এখানে তন্তুবায়ের আধিক্য। তাঁতিদের ছেলেরা বস্ত্র বয়নের সুতা দুই চারি খাই একত্র করিয়া সেকালে ঘুড়ি উড়াইত। তাহা হইতেই ঘুড়ি উড়ানর প্রচলন হয়। এ কথার সপক্ষে এই একটি প্রমাণ গাওয়া যায় যে, এখানে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা ও বিজয়া দশমীর দিন ছেলেদের মধ্যে ঘুড়ি উড়ানর আধিক্য দেখা যাইলেও, বিশ্বকর্ম্মা পূজার দিন এ খেলার সর্ব্বাপেক্ষা ধুম দেখা যাইত। অবশ্য অনেকেই জানেন, ঐ দিন তাঁতিদের বয়ন যন্ত্রাদির পূজা হইয়া থাকে, এবং ব্যবসায় কার্য্য বন্ধ থাকে। শুনিয়াছি, ঢাকার তন্তুবায়-প্রধান পল্লীতে ঐ দিন ছেলেরা খুব ঘুড়ি উড়াইয়াথাকে।

৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে মেড়ার লড়াই ও শিকরের লড়াই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একটি আমোদজনক খেলা ছিল। ভদ্রলোকদের মধ্যে এসব না থাকিলেও, খেলার সময় দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভদ্রলোকের অভাব থাকিত না। ভারতের অন্যান্য স্থানেও পূর্ব্বে শিকরে এবং মোরগের লড়াই বড়ই আমোদের ব্যাপার ছিল। তখনকার সাহেবরাও এই খেলায় বিশেষ আমোদ উপভোগ করিতেন। সুবিখ্যাত চিত্রকর জোফানির (Zoffany) ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে অঙ্কিত কুক্কুটের লড়াই (Colonel Mordant's Cock Match) নামক একখানি চিত্রে তাহা স্পষ্ট করিয়া প্রমাণিত হয়। উহার মধ্যে জেনারেল মার্টিন (Major General Blaud Martin) কর্ণেল মরডাণ্ট্ প্রভৃতি কতিপয় পদস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

শত বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগরের ভদ্রলোক, বিশেষতঃ ধনীদের মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল পাখী পোষার খুব সখ ছিল। বৈকালে বেড়াইতে যাইবার সময় অনেককেই একটি

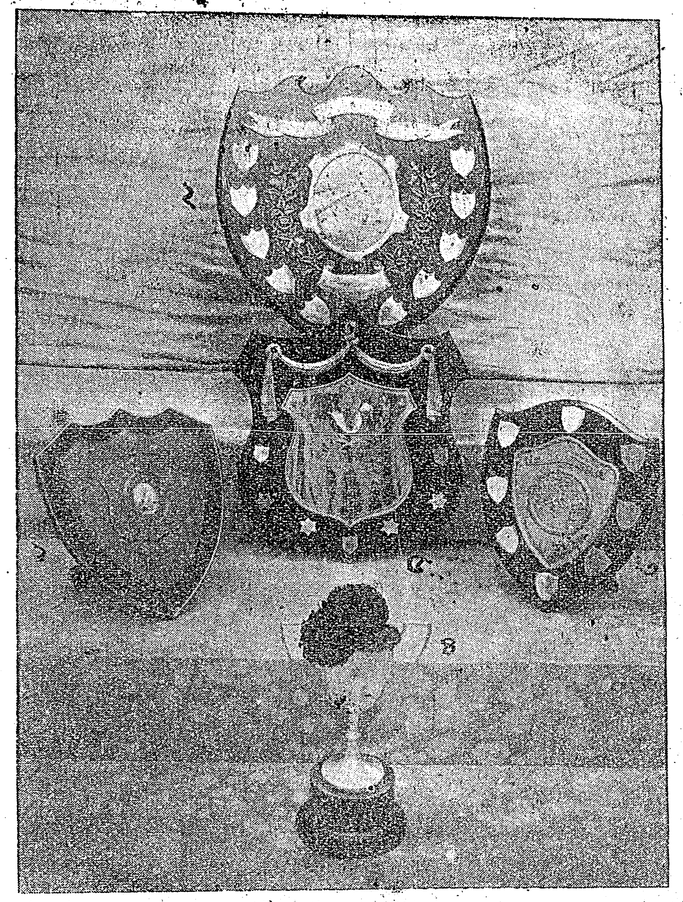

ভেল দিগ্ দিগ্ খেলার প্রতিযোগিতার ঢাল ও কাপ্
(১) বঙ্গীয় ভেল দিগ্ দিগ্ ঢাল (বোড়াই চণ্ডীতলা)
(২) চন্দননগর ভেল দিগ্ দিগ্ ঢাল (কক্কি)
(৩) চন্দননগর ভেল দিগ্ দিগ্ লীগ্ (কক্কি)
(৪) ফটকগোড়া ভেল দিগ্ দিগ্ কাপ্ (ফটকগোড়া)
(৫) নিখিল বঙ্গ ভেল দিগ্ দিগ্ ঢাল (পালপাড়া)

ক্রীকেট ও ফুটবল খেলার দল এখানে অনেকগুলি ছিল এবং এখনও কয়েকটি আছে। চন্দননগর স্পোর্টিং

ক্লাবই তন্মধ্যে প্রধান। তৎপরে টাওয়ার ওয়াচ, বেঙ্গল স্পোর্টিং ও ডায়মণ্ড জুবিলী ক্লাবের নাম করা যাইতে পারে। শেষোক্ত দুইটি এখন উঠিয়া গিয়াছে। বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবেরও এক সময় খ্যাতি ছিল।

চন্দননগর স্পোর্টিং ইং ১৮৮৮ সালে কতিপয় বাঙ্গালী ও ইয়োরোপীয় যুবক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ৺নন্দলাল দত্ত এবং ক্যাপটেন্ ছিলেন শ্রীযুত গগনচন্দ্র ভড়। চন্দননগরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর ইহার সভাপতি। মোহন বাগান, ন্যাসন্যাল, এরিয়ান্, হেয়ার

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পলশাই

স্পোর্টিং প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর খেলার দলগুলির নাম যখন সাধারণের নিকট এত খ্যাত ছিল না, চন্দননগর স্পোর্টিংয়ের নাম এতদঞ্চলে তখন বহু লোকের নিকট সুপরিচিত ছিল। ভাদুড়ী ভ্রাতৃদ্বয়, সুকুল, উমেশ মজুমদার প্রভৃতি খেলোয়াড়দের নাম যখন তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, তখন চন্দননগর স্পোর্টিংয়ের পলশাই (শ্রীযুত সতীশচন্দ্র পলশাই) এর নাম ক্রীড়ক ও ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিদের নিকট তখনও সুপরিচিত ছিল। এই ক্লাব ইং ১৯১১ সালে ট্রেড্‌স্ কাপ্ (I. F. A. Trades Cup) ১৯১৪ না ১৬ এবং ১৯১৮ না ২১ সালে জি, কে, শিল্ড, (G. K. Shield) ১৯১৭ তে এলেন্ মেমোরিয়াল্ লিগ্, (Allen Memorial League) ১৯১৫তে বার্ণার্ড কাপ (Bernard Cup) এবং ১৯১৪তে ভিক্টোরিয়া কাপ্ (Victoria Cup) লইয়াছিলেন।

ইং ১৯১১ সালে যে বৎসর প্রথম বাঙ্গালী দল—'মোহন বাগান' সুপ্রসিদ্ধ ইষ্ট ইয়র্কস্ (East Yorks) দলকে পরাজিত করিয়া আই, এফ, এ শিল্ড (I. F. A. Shield) লন এবং ১৯০০ সালে যে প্রথম বাঙ্গালী দল 'ন্যাশন্যাল' (National association) ট্রেড্‌স্ কাপ্ লয় তাহাতে যথাক্রমে এখানকার শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র সরকার ওরফে হাবুল এবং পলশাই সাহায্য করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ পার্ল জিম্‌খানা দল (Pearl Gymkhana) কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ইং ১৯০০ সালে পলশাই বোম্বাই গিয়াছিলেন এবং তথায় কয়েকটি খেলায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন এবং সুবর্ণ পদকাদির দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। এই দলের শ্রীযুত ভাগীরথী ঘোষ এরিয়ান্ (Aryans) দলের হইয়া সময় সময় খেলা করিতেছেন।

উক্ত সকল খ্যাতনামা ক্রীড়ক ভিন্ন আর যে কতিপয় ভাল ফুটবল খেলোয়াড় আছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র নন্দী ও শ্রীযুত বন্ধুবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হাবুলও অন্যান্য দলের সহিত ভারতের বহু স্থানে খেলিতে গিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ক্রীকেট খেলাতেও তাঁহার সুনাম আছে। তিনি এখন কলিকাতায় থাকেন। ক্লাবের সৃষ্টি হইতেই পলশাই ইহার সহিত জড়িত আছেন এবং এখনও উহার প্রাণস্বরূপ।

চন্দননগর স্পোর্টিং কাপ্ নামে একটি কাপ্ প্রতিযোগিতা খেলার এখানে ব্যবস্থা আছে। অনেক ভাল ভাল দল ইহাতে যোগ দিয়া থাকেন। এই ক্লাবে ফুটবল ক্রীকেট ভিন্ন টেনিস্ ও হকি খেলাও হইয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইতে ইহার উদ্যোগে একটি বাৎসরিক স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতা খেলাও হইতেছে। অন্যান্য বহু স্থানের তুলনায় ইহা অনেক ভাল। ইহাতেও কয়েকটি কাপ্, মেডেল ও অন্যান্য মূল্যবান পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। স্বর্গীয় তিনকড়িনাথ বসু মহাশয় যখন ইহার

সম্পাদক ছিলেন, তখন তাঁহার দ্বারা ইং ১৯১৮ সালে ইহা প্রবর্ত্তিত হয়। *

এখানে আরও কয়েকটি বাৎসরিক স্পোর্টস্ প্রতিযোগিতা খেলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সন্তান সম্প্রদায় এবং পালপাড়া ও সাউলির যুবকবৃন্দের দ্বারা অনুষ্ঠিত খেলা তিনটির নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। গত তিন বৎসর হইতে সন্তান সঙ্ঘ অষ্টমী পূজার দিন একটি সন্তরণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত তিন বৎসর হইতে যে প্রসিদ্ধ ২২ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইতেছে; তাহা চন্দননগরের চৌধুরী ঘাট হইতে আরম্ভ হয়। অবশ্য

ট্রেড্‌স্ কাপ্ বিজয়ী ন্যাসন্যাল এসোসিয়েশন।—১৯০০
কাপের বামদিকে প্রথম শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পলশাই

ইহাতে চন্দননগরের কোন কৃতিত্বের কথা নাই। বরং প্রতিযোগী প্রভৃতিদের যোগ্য সমাদর না করিতে পারায় চন্দননগরের ত্রুটীই হইয়া থাকে।

আজকাল চন্দননগরে ভেল্ দিগ্ দিগ্ খেলার খুবই প্রচলন হইয়াছে। প্রাচীন ভেল্ দিগ্ দিগ্ বা কপাটি খেলাকে কতকটা আধুনিক ভাবে সংস্কার করিয়া এখন এই খেলা হইয়া থাকে এবং ইহার প্রতিযোগিতায় কাপ, ঢাল ও পদক দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গলার শুধু পল্লীগ্রামে নয়, অনেক সহরেও এই ভাবের খেলা হইয়া থাকে। এই জাতীয় খেলাকে সুসংস্কৃত করিয়া শিক্ষিত সমাজের কাছে আদরণীয় করিবার মূলে চন্দননগরের কৃতিত্ব বহু অংশে বিদ্যমান। সহরের কতিপয় যুবক দ্বারা প্রধানতঃ নবভাবে এই খেলা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত 'হিতবাদী' পত্রে, সম্পাদক মহাশয় "দেশীয় ও বিদেশীয় খেলা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে চন্দননগরের যুবকবৃন্দের বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সাগরকালী ঘোষ মহাশয় লিখিত উহার নিয়মাদি সম্বলিত একখানি ছোট পুস্তিকা বোড়াই চণ্ডিতলা বঙ্গীয় ভেল্ দিগ্ দিগ্ ঢাল প্রতিযোগিতা হইতে প্রকাশ করেন। এখানকার বহু সংখ্যক দলের মধ্যে সপ্তরথী, সন্তান, পালপাড়া, (চন্দননগর) কল্কি, গোন্দলপাড়া ও বাগবাজার দলই উল্লেখযোগ্য। ইহাদের কোন কোন দলের প্রতিযোগী খেলার জন্য একখানি করিয়া ঢাল আছে। সপ্তরথী, পালপাড়া, সন্তান ও কল্কি ও অন্য স্থানের বহু দলকে পরাস্ত করিয়া বহুবার প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়াছেন। এই সব খেলার দিন কোন কোন ক্ষেত্রে চন্দননগরের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর, স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ

* শ্রীযুত সতীশচন্দ্র পলশাই ও শ্রীযুত মাণিক লাল বড়াল মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রীড়কদিগের ও স্পোর্টিং ক্লাবের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। লেখক

প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

তাস, পাশা ও দাবা খেলার এখানে বরাবরই প্রচলন থাকিলেও, ২।৩ বৎসর হইতে এখানে 'রয়েল অক্‌শান্ ব্রীজ' নামক তাস খেলার বিশেষ আদর হইয়াছে এবং ইহাতেও গত দুই বৎসর হইতে 'এককড়ি নাথ বসু চ্যালেঞ্জ কাপ' নামক একটি কাপ প্রতিযোগিতা খেলার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বৎসর 'বেণীমাধব নিয়োগী' ও 'মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল কাপ' নামক দুইটি নূতন 'কাপ' খেলার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতার শ্রীযুত অমরনাথ মিত্র মহাশয়কেই এখানে এই সকল ক্রীড়া-কৌতুকের প্রবর্ত্তনের প্রধান উদ্যোগী বলা যাইতে পারে।

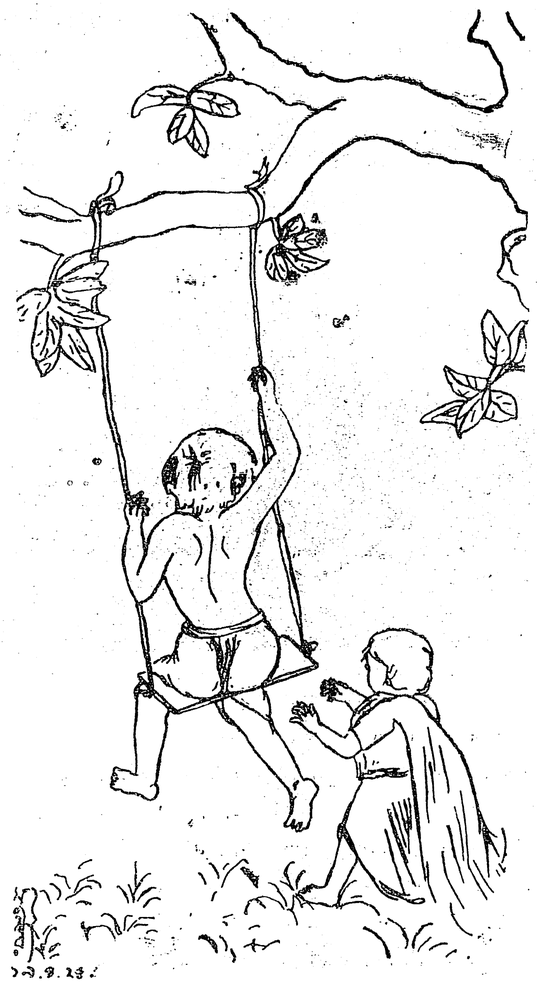

দোলনা

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগির

গর্‌মিল *

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রথম অংশ)

১

রায়বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদার অনেক দিন হইল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটী কাজে অবসর লইয়াছেন। কলিকাতার নিকটস্থ রাজনগরে তাঁহার কিছু পৈতৃক জমীদারী ছিল। হাকিমী কাজে যথেষ্ট নগদ টাকা উপার্জ্জন করিয়া তিনি সেইখানেই আসিয়া দস্তুরমত সাহেবী চালে বাস করিতেছিলেন।

পরিবারের মধ্যে তাঁহার পুত্রশোকাতুরা পত্নী কল্যাণী, মৃত বিধবা পুত্রবধূ কমলা ও নব-বিবাহিতা কন্যা লীলা। একমাত্র পুত্র শশাঙ্কসুন্দর বিবাহের অল্প দিন পরেই তিন দিনের সামান্য জ্বরে মজুমদার পরিবারকে বজ্রাহত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কমলার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া শশাঙ্ক তাহাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল। সে দরিদ্রা, পিতৃমাতৃহীনা জানিয়াও পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শশাঙ্ক তাহাকে বিবাহ করিয়া আনিতে একটুও ইতস্ততঃ করে নাই। পত্নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, ও একমাত্র পুত্রটী পাছে অসুখী হয় এই আশঙ্কায়, রায় বাহাদুরও শেষ পর্য্যন্ত এ বিবাহে তেমন জোর আপত্তি করিতে পারেন নাই।

কমলা মজুমদার-গৃহে আসিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই স্বামীর সকল আত্মীয়কেই নিজ গুণে আপন করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু জনমদুঃখিনী অনাথা তাহার ললাট-লিখিত দুর্ভাগ্যকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, বৎসর না ফিরিতেই স্বামীকে হারাইয়াছে। কল্যাণী ও মুকুন্দবাবু এই গুণবতী পুত্রবধূকে লইয়া একমাত্র পুত্রের অভাব-বেদনা যেন কতকটা ভুলিয়াছিলেন। তার পর, এই সেদিন লীলা যখন নরেশকে বরণ করিল এবং রায় বাহাদুর তাহাকে স্বর্গগত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত করিয়া আপন গৃহেই চিরদিন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন, শশাঙ্কর মৃত্যুর পরে এই শোকার্ত্ত পরিবার অনেক দিনের পরে আবার যেন একটু সুস্থ হইয়া উঠিল।

লীলার বিবাহের এখনও এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই। রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদার সেদিন সকালে একটি আপাদলম্বিত ড্রেসিং-গাউনে আবৃত হইয়া তাঁহার ড্রয়িং-রুমের একখানি আরাম-চৌকীতে হেলান দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। নরেশ ঘরে ঢুকিয়া শ্বশুরের পাশের চায়ের টেবিলটার দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল "যাক্, বড় বেঁচে গেছি! আজ যখন চা আসেনি এখনও, তখন নিশ্চয়ই আমার উঠ্‌তে বেশী দেরী হয়নি!"

মজুমদার সাহেব খবরের কাগজ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নরেশের দিকে চাহিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। নরেশ তাহা দেখিয়া শশব্যস্তে শ্বশুরের নিকট সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি? আজ কি কাগজে কিছু ভয়ানক খবর বেরিয়েছে? জার্ম্মানরা প্যারিসে ঢুকে পড়েছে বুঝি?"

মজুমদার সাহের জামাতার পোষাকের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "এই দারুণ শীতে তুমি কেবল একটা ফ্লানেলের সার্ট গায়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লে কি বলে? তোমরা ছেলে-ছোকরার দল শরীর সম্বন্ধে বড্ড অসাবধানী! এখনি হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে জানো? যাও, যাও, শিগ্‌গীর তোমার ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে এসো।"

নরেশ শান্ত বালকের মতো তৎক্ষণাৎ ভিতরে গিয়া ওভারকোটটী পরিয়া আসিল। মজুমদার সাহেব একটা মোটা চুরুট ধরাইয়া বলিতে লাগিলেন "দেখ নরেশ, ওই কোরেই সে ছোঁড়াটা বাঁচ্‌লো না। সকালে রোজ ঘর থেকে বার হবার সময় কিছু না পাও তো অন্ততঃ বিছানার চাদরখানাও গায়ে জড়িয়ে তবে বাইরে বেরোবে। খবর্দ্দার যেন হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে।"

* Bjorrsjernee Bjornson's De Nygifte (Newly Married Couple) শীর্ষক নাটিকা অবলম্বনে।

নরেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল "যে আজ্ঞে, এবার থেকে তাই কোরবো।"

চায়ের সরঞ্জাম সমেত একখানি ট্রে হাতে করিয়া কমলা এবং তাহার পশ্চাতে একখানি রেশমী পাড়-বসানো খয়েরি রংয়ের আলোয়ানে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া কল্যাণী ঘরে আসিবামাত্র মজুমদার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "লীলার কি হোলো? সে আজ এখনও ওঠেনি কেন?"

"এই যে বাবা আমি উঠেছি—! আমার অল্‌ষ্টারটা খুঁজে পাচ্ছিনি, তাই ঘর থেকে বেরোতে পাচ্ছিনি। এই যে পেয়েছি—" বলিতে বলিতে একটা চমৎকার লেডীজ্ অল্‌ষ্টার্ হাতে করিয়াই লীলা আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেশ তখন শ্বশুরের পরিত্যক্ত খবরের কাগজখানা একমনে পড়িতে সুরু করিয়াছে।

কমলা চায়ের টেবিলের উপর ট্রে'খানি গুছাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

কল্যাণী মেয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন "উঠ্‌তে এত বেলা করলি যে লিলি! কোন অসুখ বিসুখ করেনি তো?"

লীলা অল্‌ষ্টারটী পরিতে পরিতে মরাল গ্রীবাটি লীলায়িত ভঙ্গীতে সঞ্চালন করিয়া বলিল "না মা, রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি বলে, ভোরের দিকটায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তোমার কাশিটা একটু কমেছে কি?"

কল্যাণী ইহার কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মজুমদার সাহেব বলিয়া উঠিলেন "তোমার মার শরীর বড্ডই খারাপ। কাল রাত্রে খুব কেশেছেন। আমি ডাক্তার চাটার্জ্জীকে আসবার জন্যে লিখে পাঠিয়েছি।" পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "ডাক্তার এলে লিলিকেও একবার দেখে যেতে বোলো। রাত্রে ভাল ঘুম হয় না বল্‌ছে, ওটা তো ভাল কথা নয়।"

লীলা চায়ের পেয়ালাগুলি ভর্ত্তি করিয়া সবার হাতে একটী একটী তুলিয়া দিল, কেবল নরেশের বাটিটা টেবিলের উপরই একটু নরেশের দিকে ঠেলিয়া রাখিয়া, নিজের জন্য এক পেয়ালা হাতে লইয়া মার পাশের একখানি সোফায় আসিয়া বসিল।

কল্যাণী চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বলিলেন "লিলি, আমি বোধ হয় আজ চারুদের ওখানে নিমন্ত্রণে যেতে পারবো না!"

লীলা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন মা! শরীরটা কি আজ বড্ড খারাপ বোধ হচ্ছে!"

মজুমদার সাহেব চাম্‌চে দিয়া চায়ের পেয়ালার চিনিটুকু নাড়িয়া লইয়া বলিলেন "এইমাত্র আমার কাছে শুন্‌লে তো লিলি, যে কাল সমস্ত রাত উনি কেশেছেন, তবু আবার—"

কল্যাণী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন "সমস্ত রাত বোল না, মোটে দু'বার তো কেশেছিলুম।" বলিতে বলিতে কল্যাণী কাশিয়া উঠিলেন। মজুমদার সাহেব তাড়াতাড়ি একঢোঁক চা গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন "ওই দেখ, এখনও কাশছো, আর বল্‌ছো মোটে দুবার! এই ঠাণ্ডায় রাত্রে তোমার কিছুতেই নেমন্তন্নে যাওয়া হ'তে পারে না।"

লীলা চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া বলিল "মার যখন এতো অসুখ, তখন আমরাও কেউ আর নেমন্তন্নে যাবো না।"

লীলার এই কথা শুনিয়া মজুমদার সাহেব উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "সেই ভালো, এই হিমে তোমাদেরও আর গিয়ে কাজ নাই, সময়টা বড় খারাপ, চারিদিকে অসুখ বিসুখ হচ্ছে।"

কল্যাণী তাড়াতাড়ি বলিলেন "না না, সেটা ভালো দেখায় না। চারু এসে অমন কোরে সকলকে যাবার জন্য বলে গেছে,—কেউ না গেলে সে কি মনে করবে? কি বল নরেশ?—"

নরেশ খবরের কাগজখানি ভাঁজ করিয়া টেবিলের উপর রাখিল; নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালাটি তাহার উপর চাপাইয়া দিয়া বলিল "আমিও ওই কথাই বোল্‌বো মনে করছিলুম। কারুর না যাওয়াটা একটু অভদ্রতা হবে।"

মজুমদার সাহেব বলিলেন "তাতে আর কি হ'য়েছে, একখানা চিঠি লিখে তাকে আগে থাকতে খবর দাও না যে তোমরা কেউ যেতে পার্ব্বে না।"

নরেশ যেন একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "হ্যাঁ, তা'করলেও হয় বটে, কিন্তু কারুর একেবারে না যাওয়াটা কি ভালো দেখাবে?—"

লীলা তাহার পিতার দিকে চাহিয়া বলিল "মার অসুখের কথা লিখে দিলে তাঁরা বোধ হয় কিছু মনে কর্ব্বেন না, কি বল বাবা?"

নরেশ তখন শাশুড়ীর দিকে ফিরিয়া বলিল "আপনি জানেন তো মা, চারু আমাদের বিয়ের সময় এখানে ছিল না। আমেরিকা থেকে এসে যেদিন শুনেছে, সেই দিন থেকেই আমাদের একদিন নিয়ে গিয়ে আমোদ ক'রবে বল্‌ছে। আজকে সে যখন তার সমস্ত আয়োজন করেছে, নিজে স্ত্রীকে সঙ্গে করে এসে আমাদের সকলকে যাবার জন্য বিশেষ ক'রে বলে গেছে, তখন অন্ততঃ আমাদের দুজনের নিশ্চয়ই যাওয়া উচিত, কি বলুন?"

কল্যাণী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "নিশ্চয়, কেন না তোমাদের দুজনের খাতিরেই সে আজ খরচপত্র করে এই আয়োজন করছে।"

লীলা অসহিষ্ণুর মত বলিয়া উঠিল "কিন্তু তুমি তো যেতে পার্ব্বে না মা! তোমার এই অসুখ শরীর; তোমাকে ফেলে রেখে আমি একলা সেখানে গিয়ে তো একটুও আমোদ পাবো না!"

ইহার উত্তরে গম্ভীর ভাবে নরেশ বলিল "আমোদ পাওয়া যায় না এমন অনেক কাজই সংসারে থাক্‌তে হলে মানুষকে করতে হয়।"

লীলা একবার চকিতে নরেশের দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল "সে হয় কর্ত্তব্যের খাতিরে, কিন্তু এখানে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে মার ভাল-মন্দ দেখা। এই রোগা মানুষকে একলা বাড়ীতে ফেলে রেখে আমি কি আমোদ করতে যেতে পারি?"

নরেশ একটু অপ্রতিভের মত মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল "কেন, বৌদি তো রয়েছেন, তিনিই তো সব দেখেন শোনেন—তিনি কি—"

বাধা দিয়া লীলা বলিল "মার প্রতি মেয়েরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। হাজার কেন যেই থাক না, তবু আমার কাজ তো আমাকে করতে হবে। আমি বুড়ো মেয়ে, তাঁর এমন অসুখ দেখেও কি বলে সেজেগুজে নেমন্তন্ন খেতে যাবো?"

নরেশ কাতরভাবে গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "হ্যাঁ মা, আপনার কি বড্ড অসুখ? আমি কিন্তু এতক্ষণ তা বুঝতে পারিনি!"

ইহার উত্তরে রায় বাহাদুর মুকুন্দ মজুমদার তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর আরও গম্ভীরতর করিয়া বলিলেন "তুমি কি শুন্‌তে পাওনি নরেশ, আমি সকাল থেকে দশবার বলিছি যে ওঁর শরীর বড্ডই খারাপ, কাল সমস্ত রাত কেশেছেন?"

কর্ত্তার কণ্ঠস্বরে বিচলিত হইয়া কল্যাণী বলিলেন "আমি যে নিজে বলিছিলুম গো, যে মোটে বার-দুই কেশেছি,—তাই বোধ হয় নরেশ মনে করেছে আমার অসুখটা তেমন কিছু নয়" বলিতে বলিতে গৃহিণীর দৃষ্টি পড়িল জামাতার রুদ্ধরোষে আরক্ত ও অপমানে আহত অবনত মুখের উপর। তিনি বলিতে লাগিলেন "আর যথার্থই তো তাই! এমনিই বা কি অসুখ করেছে আমার? তোমাদের বাপু কেমন যেন বাড়াবাড়ি করাটা একটা অভ্যেস! একটু কেশেছি বই ত নয়!"

"কাশিটাকে সামান্য বলে অগ্রাহ্য করা ঠিক নয়" বলিয়া মজুমদার সাহেব খবরের কাগজখানা তুলিয়া লইয়া আবার পড়িতে সুরু করিলেন; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে আবার সেখানি মুড়িয়া রাখিয়া দুই একবার গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন "আর কি জানো—কাল থেকে আমার নিজের শরীরটাও তত ভাল বোধ করছিনে। কেমন যেন—"

ব্যস্ত হইয়া কল্যাণী বলিয়া উঠিলেন "তাইতো, তোমার গলাবন্ধটা তো আজ নাওনি দেখ্‌ছি? দাঁতের, গোড়াটা বোধ হয় কন্ কন্ করছে! ও লিলি, যা মা, ওঁর গলাবন্ধটা ও ঘর থেকে শীগ্‌গির এনে দে।"

লীলা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া গলাবন্ধটা লইয়া আসিল এবং অতি যত্নের সহিত পিতার কণ্ঠে জড়াইয়া দিতে লাগিল। কল্যাণী বলিতে লাগিলেন "তাইতো বলি, আজ আমাদের কাগজ পড়ে লড়াইয়ের কোন খবর শোনালে না কেন; আমি মনে করিছিলুম আজ বুঝি কাগজে তেমন নতুন খবর কিছু নেই।"

রায় বাহাদুর ডানদিকের দাঁতের গোড়াটায় হাত চাপা দিয়া অন্ধ নাচারের মতো কাতর কণ্ঠে বলিলেন "আজ নরেশ আমাদের কাগজটা প'ড়ে শোনাক্; আমার শরীরটা তত ভাল নেই।"

নরেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে যেন শোনাচ্ছি, কিন্তু চারুর ওখানে নেমন্তন্নে যাবার কি হবে, তার তো একটা কিছু ঠিক হোল না।"

লীলা এবার নরেশের দিকে একটু ভ্রূকুটি করিয়া মাকে

বলিল "আচ্ছা মা, উনি কেন একলাই নেমন্তন্ন রাখতে যান না।"

নরেশ তৎক্ষণাৎ চেয়ার সমেত গৃহিণীর নিকট আরও সরিয়া আসিয়া বলিল "দেখুন মা, এটা যদি অন্য কোনও একটা সামাজিক ব্যাপারের নেমন্তন্ন হোতো, তা হ'লে ওকে নে যাবার জন্যে আমার কোনই মাথা-ব্যথা ছিল না। আমি একলা গিয়েই স্বচ্ছন্দে নেমন্তন্ন রেখে আসতে পারতুম। কিন্তু, আপনি তো জানেন, কেবল ওকে নিয়ে যাবার জন্যেই সে আজ এই আয়োজন করেছে। যার জন্যেই সব, তিনিই যেতে পারবেন না! এ সব ছেলে-মানুষী কথা নয়?"

গৃহিণী ইহাতে সায় দিয়া বলিলেন "তা বই কি! নরেশ না গেলেও হয়ত' চোলতো, কিন্তু তোমার না যাওয়াটা ভারি অন্যায় হবে লীলা।"

নরেশ উৎসাহিত হইয়া বলিল "সেই জন্যেই তো আমি এতটা পেড়াপিড়ি করছি, নইলে আপনার অসুখ শুনেও আমি কি নেমন্তন্ন যাওয়ার কথা মুখে আনতে পারতুম?"

বিরক্ত হইয়া লীলা বলিল "তা, হ্যাঁ মা, তোমার এই অসুখ, বাবার শরীরটাও ভাল নয়, এ অবস্থায় আমি কি ক'রে নেমন্তন্ন রাখতে যাই বল তো? এটা ওঁর মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না কেন জানিনি।"

নরেশ এবার রাগিয়া উঠিয়া বলিল—"শুনলেন তো মা, কি রকম আহাম্মুকের মত কথা! উনি যে আমার স্ত্রী, সেটা একেবারেই বেমালুম ভুলে গেছেন। চারু যখন কেবল আমার আর আমার স্ত্রীর অভিনন্দনের জন্যেই আজকের এই সমারোহ ব্যাপারটা খাড়া করেছে, তখন আমার স্ত্রী হিসেবে ওর সহস্র ক্ষতি স্বীকার করেও যে আজ সেখানে উপস্থিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন, এটা ও কিছুতেই বুঝতে পার্চ্ছে না।"

রায় বাহাদুর মুকন্দ মজুমদার তাঁহার দামী চামড়ার খাপ হইতে আর একটা বড় চুরুট বাহির করিয়া ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন "আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্ নরেশ। ওদের সকলকে একদিন আমাদের এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে বেশ পরিতোষ করে খাইয়ে দেওয়া যাক্, কি বল? এই তো আসছে মাসে লীলার বের ঠিক এক বছর পূর্ণ হবে, সেদিন একটা সাম্বৎসরিক উৎসবের আয়োজন করা যাবে এখন। বেশ নতুন রকমের একটা ব্যাপার হবে, অনেকটা ইংরিজী ধরণের, কি বল?"

কল্যাণী মৃদু হাস্যে তাঁহার সম্মতি জানাইয়া বলিলেন "মন্দ নয়, সে একটা বেশ নতুন রকমের আমোদ হবে বটে। জন্মতিথির পূজো, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, এ সবই আমাদের রয়েছে, কিন্তু বিয়ের তো কই কিছু সাম্বৎসরিক স্মৃতির ব্যবস্থা নেই! ওটাও আরম্ভ করে দিলে মন্দ হয় না।"

নরেশ ইতাবসরে উঠিয়া গিয়া লীলার পিছন হইতে তাহার সোফার পিঠের উপর ভর দিয়া তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, চুপি চুপি বলিতেছিল "পূজোর সময় তোমায় যে নেক্‌লেসটা কিনে দিয়েছি, সেটা পরলে তোমায় কেমন মানায় আমার সেটা একবার দেখবার ইচ্ছে আছে। সেইটি পরে আজকে তোমায় নেমন্তন্নে যেতে হবে।"

লীলা ঘাড় নাড়িয়া মৃদু স্বরে বলিল "উহুঁ, মা-বাবাকে এ রকম অবস্থায় ফেলে রেখে আমি নেমন্তন্নে গিয়ে একটুও স্বোয়াস্তি পাবো না। নেকলেস্ ছড়াটা আমার গলায় যেন সাপের মতো জড়িয়ে ধরেছে বলে মনে হবে।"

এমন সময় রায় বাহাদুর বলিলেন "তা হলে রাজি আছো নরেশ! উৎসবের আয়োজনটা তবে সুরু করে দিই?"

ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ নিরাশ ও ব্যথিত চিত্তে নরেশ লীলার নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া বলিল "আচ্ছা, সে না হোক্ এর পর করা যাবে না হয়, এখন যখন না যাওয়াটাই সাব্যস্ত হোলো, তখন এই বেলা আমি তাদের একটা খবর পাঠিয়ে দিইগে"

বলিতে বলিতে নরেশ মুখখানি অন্ধকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, মজুমদার সাহেব তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ওহে, শোন, শোন, চিঠিটা আমিই লিখে দিচ্ছি। তোমার লেখার চেয়ে আমার লিখে দেওয়াটাই এস্থলে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে।"

কল্যাণী বলিলেন "সেই ভাল, তুমি যখন বাড়ীর কর্ত্তা, তখন আমাদের সকলের হোয়ে তুমিই চারুকে লিখে পাঠাও। না যেতে পারবার কারণটা বেশ স্পষ্ট করে লিখো। আর দেখ, আমার নাম করে আর একটু লিখে দিও যে, এই যে আজ আমরা কেউ তার ওখানে উপস্থিত হোতে পারলুম না, এটা আমাদের একটা পরম দুর্ভাগ্য বলে মনে হচ্ছে; আর এই দুর্ঘটনার জন্যে সব চেয়ে বেশি দুঃখিত হোয়েছেন লীলার মা।"

কর্ত্তা শুনিয়া নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত বলিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা, থামো, সে জন্যে তোমার কোনও চিন্তা নেই। আমি আজ এই বিশ বছরের ওপোর শুধু কলমের জোরেই এতগুলো জেলা শাসন করে এসেছি; কি লিখতে হবে না হবে সে আর তোমাকে আমার কাছে বাত্‌লে দিতে হবে না।"

এমন সময় কমলা আসিয়া দ্বারের বাহির হইতে বলিল: "বাবা, আপনার নাইবার জল গরম হোয়েছে, স্নানের ঘরে পাঠিয়ে দেবো? এখন নাইবেন কি?"

কমলাকে দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন "হ্যাঁ বৌমা, তুমি তো কই আজ চা খেতে এলে না?"

লীলা বলিয়া উঠিল, "বৌদি যে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, আর কোন দিন খাবে না বলেছে।"

নরেশ শুনিয়া বলিল "সত্যি বৌদি, কি ক'রে তুমি চা খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে বল ত? চা না খেয়ে আজ এ ক'দিন আছো কেমন করে?"

কমলা ইহার কোনও উত্তর না দিয়া নতমুখে ঈষৎ হাসিয়া শ্বশুরকে আবার স্নানের তাগিদ্ দিল। কর্ত্তা তখন ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই তো, স্নানের সময় হোয়েছে দেখছি! তা'চল, স্নানটা সেরে নিই।"

ড্রেসিং গাউনটা খুলিতে খুলিতে মজুমদার সাহেব উঠিয়া কমলার সহিত বাহির হইয়া গেলেন। কল্যাণীও উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "যাই—একবার রান্নাবান্নার কতদূর কি হচ্ছে দেখে আসি। নতুন বামুনঠাকুরকে নিয়ে বৌমা একা ভারি মুস্কিলে পড়েছে।"

লীলা বলিল "কিন্তু লোকটা রাঁধে ভালো।"

"বাঙালী বামুন কি না, সব জানে শোনে" বলিয়া গৃহিণীও বাহির হইয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

ভোরের বায়

মৌলবী গোলাম মোস্তফা বি-এ, বি-টি

(আরবী ছন্দ—মোজারাহ্)

ন্দ-সূত্র ঃ—

মফা- । ঈল ফাএলাত । মফা- । ঈল ফাএলাত

ভোরের । বায় বও যবে । প্রিয়ার । দ্বার-পাশ দিয়ে

ভোরের বায় বও যবে, প্রিয়ার দ্বার পাশ দিয়ে ব্যথার দাগ নাই দিও কোমল তার প্রাণ-পুটে!
এস তার আধ-ফোটা কুসুম গা'র বাস নিয়ে। বুকের নীল চিল বাসে দোদুল দোল নাই দিও,
চারু শ্যাম কেশ-পাশে ছাওয়া তা'র মুখখানি, গোপন ধীর পা'য় সেথা ক্ষণ- কাল তিষ্ঠিও;
চির- পূত প্রেম-সুধায় ভর- পূর বুকখানি। বুকে লীন যেই ভাষা চির মূক প্রেম-লাজে,
যেন শ্যাম পত্র-ছায় শোভা পায় লাল্ গোলাপ শুনো তাই কাণ দিয়ে পশি' তার বুক মাঝে!
মুখে ধীর-স্নিগ্ধ হাস, বুকে লাজ-রক্ত-ছাপ! বুকে তার কোন্ আশা সদা যায় চঞ্চলি—
ছাড়ি' সে-ই ফুল-রাণী কেন যাও ফুল-বাগে, করে কার প্রেম-পূজা ভরি' তার অঞ্জলি'
কেন আন্ ফুল দেখি' তব তায় মন লাগে? হিয়া কার পথ চাহি সারা রাত রয় জেগে,
ওগো মোর প্রেম-দূতী, আমি চাই চাই তোমায়, ফোটে কোন্ প্রেম্-বাণী সেথা কার রং লেগে!
এনে দাও তা'র খবর ব্যথা- ম্লান এই হিয়ায়! সেকি মোর নাম জপে, কভু মোর গান কি গায়?
দখিন্ দ্বার তার খোলা, সেথা যাও চুপ করি' কভু মোর প্রেম-পরশ বুকে তার প্রাণ কি চায়?
শিথিল তার কেশ-পাশে বেড়াও ধীর সঞ্চরি! এনে দাও সেই খবর আজি দূর পরবাসে
ঘুমের ঘোর দুই চোখে যেন তার নাই টুটে, হৃদি- দ্বার মোর খুলি' আছি আজ সেই আশে।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ

"পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ—আর এক দৃশ্য শ্মশান—" এই দুই দৃশ্যের দুই দিকে যে ঘনতমসাবৃত যবনিকা রহিয়াছে, তাহা উত্তোলন করিবার জন্য মানুষ আদি কাল হইতেই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। সেই চেষ্টার ফলে সে লাভ করিয়াছে—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। সুখ দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও মানুষ আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চায়। সে "জলের তরঙ্গ জলে হবে লয়"—এই ধারণাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে না। আর তাহা পারে না বলিয়াই আকুলি বিকুলি করিয়া জানিতে চায়, ঐ ঘনকৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে কি লুক্কায়িত আছে। এই জীবন—এই হাসি-কান্না—সুখদুঃখের তরঙ্গ—সবই কি তবে দু' দিনের? দু'দিনের হাসি কি দু'দিনেই ফুরাবে, জীবন-দীপ কি অনন্ত অন্ধকারে নিবিয়া যাইবে? তবে এ ব্যর্থ সৃষ্টির—এ ছেলে-খেলার কি প্রয়োজন ছিল? মানুষের অন্তর-দেবতা বলিলেন—না, এ দুদিনের নয়, জীবন স্বপন নয়—সৃষ্টি মায়া-প্রহেলিকা নয়—তার পিছনে বাস্তব সত্য একটা আছে—তার অনুসন্ধান কর। সেই অনুসন্ধানের ফল—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান।

অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষায় মানব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিল—কি, মানবের ভিতরে যে অনন্তের বীজ রহিয়াছে, তাহাই তাহাকে অনুসন্ধানে প্রেরণা দিয়াছিল—এখানে তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তবে অনুসন্ধানের প্রথম লক্ষ্য ছিল, জীবন—এই পার্থিব মৃত্যুর পরে মানুষের অস্তিত্ব থাকে কি না, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা।

ভারতে অতি প্রাচীন কালেই যে এই বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন সাহিত্য একটু আলোচনা করিলেই জানা যায়। কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, আমাদের চরম পরিণতি কি—এ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। জগতের সমস্ত সভ্য জাতিই অল্পাধিক পরিমাণে এ সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা

করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের মনীষীদের মত এত উন্নত স্তরে অন্য কোন জাতি পৌছিয়াছিলেন কি না জানি না।

মানুষকে সমগ্র ভাবে দেখিতে গেলে, সমস্ত জগৎকে দেখিতে হয়,—ইহকাল ও পরকাল অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে। তখন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানে গিয়া পৌছায়। আমাদের দেশে এই বিজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে—কিন্তু উহাই যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগোপযোগী ভাবে আমরা সেই জ্ঞানালোচনায় অনেক পশ্চাৎপদ রহিয়াছি—এটা আমাদের পক্ষে খুব প্রশংসার কথা নয়।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের পূর্ণাবস্থা—ব্রহ্মজ্ঞান—সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না—বলিবার শক্তিও নাই। তবে বর্ত্তমান অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দু'একটী কথা এ প্রবন্ধে বলিতে চেষ্টা করিব।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা হইয়া থাকিলেও, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে আলোচনা অধিক দিন যাবৎ আরব্ধ হয় নাই। আমাদের দেশে যে আলোচনা ও গবেষণা প্রাচীন পদ্ধতিতে হইয়াছে, তাহা ধর্ম্ম-সাধনার অঙ্গীভূত যোগ-প্রণালীর সাহায্যে,—ব্রহ্মসাধনার আনুষঙ্গিক বিষয় রূপে। তাই ইহা কিরূপে জনসাধারণের আয়ত্তাধীন হইতে পারে, সে চেষ্টা হয় নাই। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সেই চেষ্টা করিতেছে এবং তাহার সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে দু'একটী কথা বলিবার ইচ্ছা আছে।

এ বিষয়ে আর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি। আমাদের দেশে এ বিষয়ে আলোচনা খুব বেশী হয় নাই, এবং খুব বেশী লোকেও এ আলোচনা করেন নাই। যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাও অনেকে ইংরেজী ভাষার সাহায্য লইয়াছেন। তাই এই বিজ্ঞানের পুনঃজাগরণের দিনে তাহার নাম-তত্ত্ব লইয়া একটু আলোচনা করা বোধ হয় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সম্প্রতি 'ভারতবর্ষে' 'প্রেত-তত্ত্ব' শীর্ষক একটা প্রবন্ধ দেখিলাম। আমরা যে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি—সেটা খুব সুখের বিষয়। কিন্তু নাম ও সংজ্ঞা (Nomenclature) সম্বন্ধে আমাদের একটু অবহিত হইতে হইবে।

'প্রেত' শব্দটার প্রাচীন কালে যে অর্থই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে উহা ঘৃণার্থ ব্যবহৃত হয়। পুরাণাদিতেও উহা ঘৃণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা এই পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে 'প্রেত' শব্দে অভিহিত করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। ধরুন, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বা নিজের কোন আত্মীয়ের পরলোকগত আত্মাকে 'প্রেত' বা 'প্রেতাত্মা' বলিয়া অভিহিত করা কি সঙ্গত হইবে? অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানেও 'প্রেত' শব্দে অতি নিম্নস্তরের বিগতাত্মাকে (Evil Spirit) বুঝায়। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরও এরূপ স্থলে 'প্রেত' শব্দের ব্যবহারে আপত্তি করিয়াছেন, এবং পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ভেদে 'আত্মিক' ও 'আত্মিকা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরাও উহা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। অথবা 'বৈদেহিক আত্মা' 'বিগতাত্মা' প্রভৃতিও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান শব্দও আমরা ইংরেজী "Psychical Science" অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। Spiritualismএর পরিবর্ত্তেও বাংলায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; কিন্তু Psychical Science, এবং Spiritualismএ একটু তফাৎ আছে। Spiritualism বলিলে spirit অথবা মৃতাত্মা ও পরলোক সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান বুঝায়। অবশ্য spirit শব্দ soul অর্থেও ব্যবহৃত হয়—কিন্তু বর্ত্তমানে উহা প্রথমোক্ত অর্থেই প্রচলিত হইয়াছে। Psychical Science, অথবা Psychic Philosophy, Spiritualismএর চেয়ে অনেক বিস্তৃত ক্ষেত্র অধিকার করে। মনোরাজ্যের যাবতীয় বিষয় উহার অন্তর্ভুক্ত। তাই Psychical Science = অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, এবং Spiritualism = আত্মিক বিজ্ঞান, এইরূপ অভিধাই সঙ্গত মনে করি। আত্মিক বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের একটা অংশ মাত্র। অন্যান্য সংজ্ঞা সম্বন্ধে যথা সময়ে আলোচনা করা যাইবে।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ব্রহ্ম-সাধনার আনুষঙ্গিক বিষয় রূপে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা হইয়া-

ছিল; কিন্তু স্বতন্ত্র বিজ্ঞান রূপে উহা আমাদের অবধান আকর্ষণ করে নাই। অপর পক্ষে অনেক স্থলে ব্রহ্ম-সাধনের অন্তরায় বলিয়া উহার নিন্দা করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবও 'অষ্টসিদ্ধি'কে অতি ঘৃণ্য পদার্থের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ যোগমার্গ অবলম্বনে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের চর্চ্চা সহজসাধ্য ও নয়। এই সমস্ত কারণে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। সাধারণ লোক উহাকে দৈব শক্তি ভাবিত, এবং সাধারণের আয়ত্তাধীন নয় মনে করিয়া দূরে থাকিত।

এই দৈবজ্ঞানকে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জনসাধারণের আলোচনার উপযোগী করিয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হয়ত প্রাচ্য যোগ-বিজ্ঞানের উন্নত পূর্ণাবস্থা এখনও পায় নাই; কিন্তু এখন সকলেই উহার অল্প-বিস্তর আলোচনা করিতে পারেন। পাশ্চাত্য সহজ প্রথার অনুসরণে যাহাতে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান প্রাচ্য যোগ-বিজ্ঞানের ন্যায় এত উন্নত না হইলেও, আমাদের অনেক উপকার সাধন করিয়াছে। এই পরদেশাগত বিজ্ঞানের মুকুরে আমরা নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজেকে চিনিতে পারিয়াছি। কথাটা বাহ্যতঃ একটু পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও—সত্য। প্রথমতঃ আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র আলোকে নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলাম—আমাদের নিজেদের যাহা কিছু তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্যই যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। অবশ্য এ ভাব স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু উহার প্রভাব একেবারে নষ্টও হয় নাই। তাই যখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমাদের নিজস্ব ধনের মূল্য কষিয়া দিতে লাগিল, তখনই আমরা একটু আশ্বস্ত চিত্তে ঘরের ধন সামলাইতে মনোযোগ দিলাম। ইহার আরও একটা কারণ ছিল। তুলনা ব্যতীত কোন বিষয়ের সম্যক জ্ঞান লাভ হয় না। যখন কেবল মাত্র আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা সম্বল ছিল—তখন উহার উপর আমরা সম্যক আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই—একপেশে জ্ঞান বলিয়া একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতাম। কিন্তু যখন দেখা গেল—বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে থাকিয়া ভিন্ন পথাবলম্বনে অন্যেও সেই একরূপ জ্ঞানই লাভ করিয়াছে, তখন আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না—নিঃসংশয়ে আমরা সেই জ্ঞানকে সাদরে বরণ করিয়া লইলাম।

তাই আজ আমাদের নিজ দেশের সাধন-লব্ধ অধ্যাত্ম-জ্ঞান আর সন্দেহের বিষয় নয়। বিশেষতঃ উহা এখন প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল বলিয়া অন্যান্য জড়-বিজ্ঞানের সঙ্গে সমান আসন পাইয়াছে। জড়-বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের তুলনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আমরা কেবলমাত্র উভয় বিজ্ঞানের আলোচনার উপায়ের সমতার কথা বলিতেছি। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সব সন্দেহ, অজ্ঞানতা দূর হইবার আরও একটা বিশেষ কারণ এই যে, উহা আজ কেবল মাত্র জনকয়েক যোগী বা ধর্ম্ম-সাধক সংসার-ত্যাগীর মধ্যে আবদ্ধ 'দৈব শক্তি' বা 'গুপ্ত-বিদ্যা' নয়—অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আজ জনসাধারণের লভ্য বস্তু।

এই নূতন পন্থায় প্রাচীন সাধনার ফলকে লোকের সাক্ষাতে ধরিতে হইবে। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্রে যে অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ আছে, তাহা যে গাঁজিকা-সেবীর উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা নয়—বাস্তব সত্য, তাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ বিজ্ঞানের সাহায্যে দেখাইতে হইবে। শ্রীযুক্ত অরবিন্দবাবু তাঁহার গীতার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—কেহ যদি বলে যে একজন হিপনোটিষ্ট তাহার সাবজেক্টকে (Subject) সম্মোহিত করিয়া দূর বঙ্গদেশের সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু তাহার চেয়ে বহুগুণে বেশী অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ব্যাসদেবের কৃপায় সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষু লাভ হইয়াছিল, এ কথাটা আমরা বিশ্বাস করি না! এই বিশ্বাস না করার কারণ অনেকটা উপরে বলিয়াছি। বিশ্বাস নয় শুধু—জ্ঞান আনিতে হইবে—বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহস্র-শক্তি বিদ্যুতালোকের সাহায্যে আমাদের ভাণ্ডারের রত্ন খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিরূপে খুঁজিতে হইবে শ্রীযুক্ত অরবিন্দের একটা উদাহরণেই তাহা স্পষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু এ কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় পন্থায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা করা দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে তাহা উপযুক্ত পরিমাণে অবধান আকর্ষণ করিতে পারে নাই। আমাদের দেশের যে কয়জন মনীষী এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে প্রকাশ করিব।

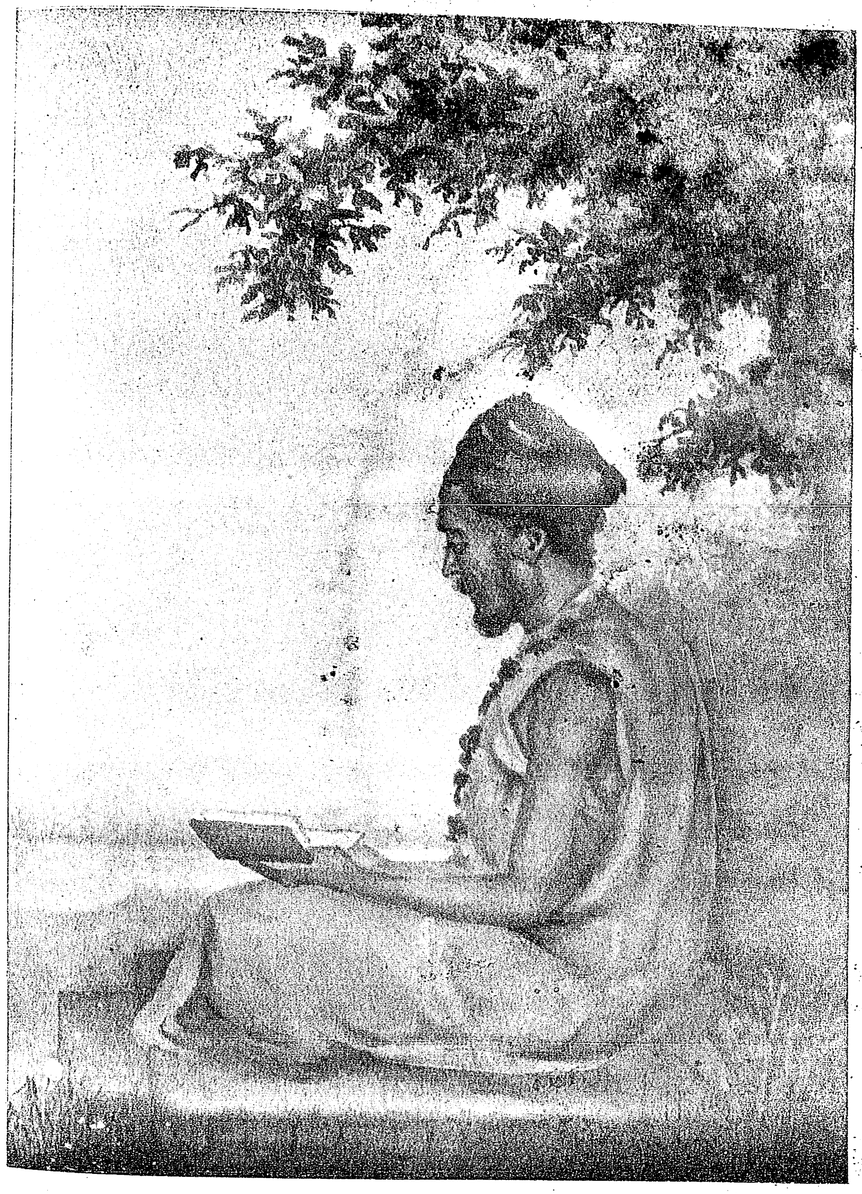

বৈরাগ্য

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র গোস্বামী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-পন্থায় যে বৈষম্য রহিয়াছে, সে বিষয়েও অনুসন্ধান করা দরকার। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু 'প্রবাসী'তে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি যেমন সূত্রাকারে গ্রথিত—সাধনলব্ধ জ্ঞানও তেমনি সূত্রে নিবদ্ধ। হঠযোগের ফলে মানুষ 'অষ্টসিদ্ধি' লাভ করিতে পারে। সে অষ্টসিদ্ধি কি, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু সাধনার কোন শক্তি বলে কোন ক্রমে বা পদ্ধতিতে কোন ধারায় মানুষের মধ্যে ঐ শক্তি বিকাশ লাভ করে, তাহার কোন ইতিহাস বা বর্ণনা নাই। এ যেন জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা (Proposition) ও তাহার ফল (Conclusion) একত্র লিখিয়া রাখিয়া মধ্যের প্রমাণগুলি মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। তাই সেখানে শুধু বিশ্বাসের বশে, বড় জোর ফল দৃষ্টে—কাজে অগ্রসর হইতে হয়,—মাঝখানের বিচার-বুদ্ধিকে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সব শৃঙ্খলা-ধারা বজায় রাখে, স্তরের পর স্তর অনায়াসে অনুসরণ করা যায়। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও আমাদের দেশে উচ্চাঙ্গের সাধনলব্ধ ফলের বর্ণনা আছে ; কিন্তু মাঝখানের শৃঙ্খলসূত্র নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদিগকে সেই সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগ যুক্তিবাদের যুগ—এই যুগধর্ম্মকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। 'কেন হইল' 'কিরূপে হইল' এ প্রশ্ন প্রত্যেক স্তরে আসে—আর তার উত্তরও যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে দিতে হইবে। অবশ্য মানুষের বিচার-বুদ্ধি এখন পর্য্যন্ত এত উন্নত হয় নাই যে, সে যুক্তি ও বিজ্ঞান-বলে জাগতিক সমস্ত সমস্যারই সমাধান করিতে পারিবে ; কিন্তু তাই বলিয়া যুক্তি ও বিজ্ঞানকে আর ঠেলিয়া রাখা যায় না।

আমাদের নিজ দেশের সাধনালব্ধ ফলের পিছনের বিচার-শৃঙ্খলা আমরা না হারাইলে, আজ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সাহায্য লইবার প্রয়োজন হইত না। নূতন পন্থায় নূতন উপায়ে পুরাতনে পৌঁছিবার চেষ্টা করার আবশ্যকতা আছে। যাহা কেবলমাত্র কয়েকজনের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল বা আছে, তাহা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত করিতে হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক—পরকালের কথা। পরকাল আছে, পাপপুণ্য আছে, এ কথা শুধু বিশ্বাস করিতে বলিলে চলিবে না—তাহা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই মানুষ, জড়-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যেমন ভাবে গ্রহণ করে, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ফলও তেমন ভাবে গ্রহণ করিবে। হাজার হাজার বৎসরের চেষ্টায় ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ যাহা করিতে পারে নাই, তাহা অতি সহজেই সুসম্পন্ন হইবে।

এই নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের জন্ম খুব বেশী দিনের কথা নয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩১ শে মার্চ্চ জগতের মঙ্গলজনক এই নব বিজ্ঞানের জন্ম হয়। আমেরিকার অন্তর্গত নিউইয়র্কের কোন পল্লীতে একজন ভদ্রলোক বাস করিতেন। তিনি এই বাড়ীতে আসার পর হইতেই বাড়ীর মধ্যে নানাবিধ টক্‌টক্, হট্‌হট্ ইত্যাদি শব্দ শুনিতেন। ক্রমশঃ বাড়ীতে নানাবিধ অলৌকিক উপদ্রব আরম্ভ হইল। এক দিন উক্ত ভদ্রলোকের নবম বর্ষীয়া কন্যা ফেমী তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত শুইয়া আছে, এমন সময় ঘরের মধ্যস্থ টেবিল ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতে লাগিল—সজীব প্রাণীর ন্যায় চলিতে লাগিল। মেয়েরা ভীত হইয়া চীৎকার করায়, তাহাদের পিতামাতাও আসিয়া এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ছোট মেয়েটী "ওহে বুড়ো, আমার মত শব্দ কর ত দেখি" বলিয়া হাত দিয়া এক প্রকার শব্দ করিল—প্রত্যুত্তরে টেবিল হইতেও এইরূপ শব্দ আসিল। সকলে অবাক হইয়া গেলেন। গৃহস্বামিনী তাঁহার পুত্রকন্যার সংখ্যা জানিতে চাহিলেন—ঠিক উত্তর পাওয়া গেল। তখন চারিদিকে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল—সেই রাত্রেই একজন বৈজ্ঞানিক কৌশল পূর্ব্বক ইংরেজী বর্ণমালার সাহায্যে টেবিলস্থ আত্মিকের কাহিনী জানিলেন। সে একজন ফেরিওয়ালা ছিল। এই গৃহের পূর্ব্বতন মালিকের নিকট আসিয়া তৎকর্ত্তৃক সে হত হয়। সেই অবধি সে ঐ বাড়ীতেই ঘুরিয়া বেড়ায়, মানুষের অবধান আকর্ষণ করিবার জন্য নানাবিধ শব্দ করে ও উপদ্রব বাধায়। চারিদিক হইতে লোক আসিতে লাগিল—তন্মধ্যে সন্দেহবাদী বৈজ্ঞানিকও ছিলেন। অশেষ কঠোর পরীক্ষার পর তাঁহাদেরও সন্দেহ দূর হইল—মৃত্যুর পরপারেও যে জীবন আছে, তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করিলেন, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের জন্ম হইল।

ক্রমশঃ আমেরিকার নানা স্থানে এ সম্বন্ধে আলোচনা,

গবেষণা চলিতে লাগিল। ক্রমে সেই আলোচনার তরঙ্গ ইয়োরোপে আসিয়া পৌঁছিল। বৈজ্ঞানিকগণ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইংলণ্ডে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা সভা (Society for Psychical Research) স্থাপিত হইল। দেশের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিকগণ সভার সদস্য হইলেন। যথারীতি চিরাচরিত প্রথায় প্রতিবাদ-নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। ধর্ম্মবিজ্ঞানের একচেটিয়া অধিকারী পুরোহিতগণ ও গোঁড়ার দল এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। সুখের বিষয়, তখন ইনকুইজিসনের (Inquisition) যুগ চলিয়া গিয়াছিল। নতুবা না জানি কত মহাপুরুষকে গিলোটিন ও অগ্নির কোলে প্রাণ আহুতি দিতে হইত বা!

ক্রমশঃ এই বিজ্ঞান-তরঙ্গ ভারতের উপকূলে আসিয়া আঘাত করিল; কিন্তু যে পরিমাণে সাড়া দেওয়া উচিত ছিল, ভারত সে পরিমাণে সাড়া দেয় নাই। আমরা নিজকে অধ্যাত্ম-জ্ঞানের একমাত্র অধিকারী ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম; এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত অফুরন্ত ধন-ভাণ্ডারের কণামাত্র পাইয়া জড়বিজ্ঞান-মূঢ় পাশ্চাত্য দেশ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া, একটুখানি সহানুভূতি মিশ্রিত অবজ্ঞার হাসি হাসিলাম। কিন্তু নব-অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মধ্যে আমাদের গ্রহণীয় কিছু আছে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বেশী প্রয়োজন মনে করি নাই।

এই সঙ্গে আরও একটি শক্তি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সহায়তা করিল—তাহা থিয়োসফি (Theosophy)। থিয়োজফিষ্টরা ও অধ্যাত্মবাদী, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবাদ সম্বন্ধে অনেক মিল আছে। বিশেষতঃ থিয়োজফিষ্টরা ভারতীয় সাধনার অনুসরণ করেন। নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও থিয়োসফি এই উভয় মিলিত শক্তি আমাদিগকে একটু সজাগ করিয়া তুলিল। আমাদের কয়েকজন মনীষী বৈজ্ঞানিক প্রথায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনায় মন দিলেন। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেও দু-একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই বিষয়ক পত্রিকাও কয়েকখানা আছে।

বাংলাদেশে যাঁহারা নব প্রথায় অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৺শিশিরকুমার ঘোষ, ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও ৺সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশিরবাবু একখানা ইংরেজী পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন—নাম Hindu Spiritual Magazine। উহা এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আবার ঐ পত্রিকাখানি প্রকাশ করা হইবে বলিয়া শুনিয়াছিলাম—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। মধ্যে "অলৌকিক রহস্য" নামক একখানা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা বাহির হইয়াছিল—কিন্তু উহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। বাংলা ভাষায় কয়েকখানি মাত্র বহি আছে, তাহাও অসম্পূর্ণ। অবশ্য একখানা বহিতে সমস্ত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। বাংলা সাহিত্যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের পুস্তকের সংখ্যাও অল্প।

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি যদি আকৃষ্ট হয়, তবেই সুখের বিষয়।

বাংলার বাহিরে দু-একটী অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-সভার খবর জানি; কিন্তু তাঁহারা ইংরেজী ভাষাতে পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে উপযুক্ত পরিমাণে সাহিত্য ও পত্রিকা যাহাতে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য বিশেষজ্ঞগণ চেষ্টা করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

অধ্যাত্মবাদিগণ কিরূপে এই নব বিজ্ঞানকে জগতের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করিতেছেন, তাহার একটু আভাষ ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা রহিল।

নৃতত্ত্বে জাতি-নির্ণয়

অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এম-এ

সাধারণ লোক মধ্যে নৃ-তত্ত্ব একটি অজ্ঞাত বিষয়। নৃ-তত্ত্ব অর্থে অনেকে জাতি-নির্ণয় বুঝেন; এবং জাতির কথা উত্থাপিত হইলেই অনেকে চমকিয়া উঠেন। কারণ "জাতির" অর্থ লোকে সাধারণতঃ রাজনীতিক অর্থেই গ্রহণ করেন। অমুক "জাতি" ভাল, আর অমুক জাতি খারাপ, ইহা তাঁহারা লোক মুখে শুনিয়া, নিজেদের কোন দলে গণ্য হইতে হইবে সেই ভয়েই ভীত হন!

বিগত ত্রিশ বৎসর ইয়োরোপে সাম্রাজ্যবাদীরা "জাতি" শব্দটার অতি কদর্য্য অর্থ করিয়াছে, নৃ-তত্ত্বকে রাজনীতির কার্য্যে খাটাইয়াছে; এবং আনাড়ীর দল নিজেদের বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচয় দিয়া, সাম্রাজ্যবাদকে জাতীয়তাবাদের আবরণে ঢাকিয়া, বিজ্ঞানকে রাজনীতির প্রয়োজনে নিযুক্ত করিয়া, একটা অদ্ভুত নৃ-তত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। এই অজ্ঞানতাই (pseudo science) লোক-সমাজে নৃ-বিজ্ঞান নামে অভিহিত, এবং তাহার ঢেউ বিশেষ ভাবে ভারতে আসিয়া লাগিয়াছে। সেই জন্যই ভারতে অমুক আর্য্য, অমুক দ্রাবিড়, অমুক মঙ্গোলো-দ্রাবিড় ইত্যাদি অদ্ভুত বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়, এবং ফলে লোক মধ্যে ঈর্ষা ও দ্বেষের উদ্ভব হয়। কিন্তু আসল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এ ভাবের উদয় হয় না। যাহারা বিজ্ঞান ও জাতীয়তাবাদের খিচুড়ি করিয়া জগতে স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছে, তাহারা কেহই বৈজ্ঞানিক নহে।

জার্ম্মাণিতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা বিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে; এবং জার্ম্মাণিই নৃ-বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে; কিন্তু সেই সঙ্গে খাঁটির সঙ্গে মেকিও চলিয়াছে; এবং এই ঝুটা মালই জগতে বেশী চলিয়াছে! আসল নৃ-বৈজ্ঞানিকদের মত জগতে বিশেষ পরিচিত নহে; কিন্তু Houston, Chamberlain, Wilser, Poesche, Penka, প্রভৃতির ঝুটা মতগুলা বাজারে বিশেষ পরিচিত; কারণ, ইহা রাজনীতিক দলাদলির গলাবাজী! অথচ ইহাঁদের কেহই নৃ-বৈজ্ঞানিক নহেন। ইহাঁদের মতে, মূল "আর্য্য-জাতি" হয় সুইডেন, না হয় জার্ম্মাণিতে সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং জার্ম্মাণরাই খাঁটি আর্য্যত্বের অধিকারী। এই মতটা জার্ম্মাণিতে সৃষ্ট হইলে, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীরা তাহা লুফিয়া লয় এবং তথা হইতে তাহা আমেরিকায় যায়। এই মতের মর্ম্ম এই:—নীলচক্ষু, কপিশকেশ লাল রঙ্গের উত্তর ইয়োরোপের লোকেরাই খাঁটি আর্য্য, এবং তাহারাই Teuton বা German নামে আজ পরিচিত; এবং তাহারা মনুষ্যের সমস্ত গুণের আকর, অতএব জগৎটা তাহাদেরই জন্য! অবশ্য ফ্রান্স, ইতালী, রুষ প্রভৃতি দেশের নৃ-বৈজ্ঞানিকেরা অন্য কথা বলেন। ফলে, বিজ্ঞানের দলাদলি হইতে জাতীয়তার দলাদলি, এবং কোন জাতি জগতে বড় আর কোন জাতি জগতে ছোট, তাহা লইয়া বিবাদ চলিতেছে!

কিন্তু আজকাল একটা নূতন দল উঠিতেছে, যাঁহারা বিজ্ঞানকে রাজনীতিক বা জাতীয়তার বিবাদের ভিতর আনিতে চাহেন না। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে নবীন, কিন্তু জনকতক প্রবীণ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকও এই সঙ্গে আছেন। ইহাঁরা বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের চক্ষেই দেখেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বের উদ্গারিত বিষকে নষ্ট করিতে সময় লাগিবে। আর আমাদের দেশে নৃ-বিজ্ঞানের সংবাদ অতি কম লোকেই রাখেন,—সাধারণতঃ "পরের মুখে ঝাল খাইয়া" ঈর্ষা ও দলাদলিতে মজেন।

নৃ-তত্ত্ব অর্থে বিশদ ভাবে মানবের কার্য্যের সমস্ত বিভাগই বুঝায়; সমাজ-তত্ত্ব, অর্থনীতি, শারীরিক নৃ-বিজ্ঞান, রাজনীতি, জাতি-তত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই নৃ-তত্ত্বের বিষয়। সঙ্কীর্ণ ভাবে সাধারণতঃ শারীরিক নৃ-বিজ্ঞান (physical anthropology বা somatology) এবং জাতি-তত্ত্ব (ethnology) নৃ-তত্ত্বের অনুসন্ধানের বিষয়। শারীরিক নৃ-বিজ্ঞান জাতির (race) উৎপত্তির পরিচায়ক; কোন্ দেশের লোকদের বাহ্যিক আকৃতি কি প্রকার এবং তাহার সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী জাতির কি প্রভেদ বা ঐক্য, ইহাই শারীরিক নৃ-বিজ্ঞানের বিচারের বস্তু। এস্থলে শারীরিক নৃ-তত্ত্বের একটা মোটামুটি পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

ইয়োরোপীয় ভাষায় race কথাটার নানা অর্থ। অনেক সময় এই শব্দটা people অর্থে ব্যবহৃত হয়। অমুক দেশের লোকেরা অমুক raceএর অন্তর্গত বলিলে আজকাল কোন অর্থবোধ হয় না; কারণ বর্ত্তমান কালের নৃ-বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক দেশের লোকেরাই নানা racial elementsএর সমষ্টি। পূর্ব্বের উল্লিখিত প্যান-জার্ম্মাণিষ্ট পণ্ডিতের দল যখন বলিলেন যে, জার্ম্মাণ বা টিউটনদের ধমনীতে খাঁটি আর্য্যরক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তখন ইতালীর Sergi বা ইংলণ্ডের Karl Pearson বা সুইডেনের Lundbory দেখাইয়া দিলেন, খাঁটি টিউটন জাতি বলিয়া জাতি বিদ্যমান নাই, জার্ম্মাণ-ভাষী জাতিসমূহ মিশ্রজাতি; এবং Sergi বলেন, কোন কালে একটা খাঁটি টিউটন বা জার্ম্মাণ জাতি জগতে ছিল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়! কেল্ট ও শ্লাভদের সেই প্রকার অবস্থা। প্রাচীন গ্রীকেরা নিজেদের সব এক জাতীয় বলিয়া স্পর্দ্ধা করিত; কিন্তু আধুনিক শারীরিক নৃ-বৈজ্ঞানিকেরা

দেখাইয়াছেন যে, তাহাদের ভিতরেও ভিন্ন-ভিন্ন racial elements ছিল! অতএব race শব্দটার তাৎপর্য্য কি? ব্লুমেনবাকের (Blumenback) আমল হইতে "শ্বেত জাতি" "পীতজাতি" প্রভৃতি জাতিবাচক নামের পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই সব শব্দ ভ্রমপূর্ণ ও জাতির পরিচায়ক নহে। বরং আজকাল ইহা রাজনীতিক দলাদলির পরিচায়ক। তৎপরে Caucasian, Mongolian প্রভৃতি জাতি-পরিচায়ক নামগুলিরও অবস্থা তদ্রূপ! একজন আমেরিকান নৃ-বৈজ্ঞানিক আমায় বলিয়াছিলেন যে, Caucasian শব্দটার অতি জঘন্য (vicious) অর্থ হইয়াছে! এই সব কারণে race, ও তাহার পরিচায়ক লম্বা-চওড়া নামগুলি বিজ্ঞান হইতে উঠিয়া যাইতেছে। আজকাল Biology ও Physical anthropologyতে race শব্দ ব্যবহৃত হয় না; তৎপরিবর্ত্তে biotype ও phenotype শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে race অর্থে লোকে যাহা বুঝিত, আজকাল biotype অর্থে তাহাই বুঝে। Biotype জিনিসটা তাহাই, যাহা একটি জাতির মধ্যে অবিনশ্বর ও বংশপরম্পরায় প্রকট শারীরিক লক্ষণের সমষ্টি। যদি একটি বিশিষ্ট লোকমণ্ডলী মধ্যে সকলেই এক বাহ্যিক আকৃতির লক্ষণালঙ্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একটি biotypeএরই সন্ধান পাওয়া যাইবে, এবং সেই মণ্ডলীটি বিশুদ্ধ বলিয়াই পরিগণিত হইবে। যদি এই কল্পিত বিশুদ্ধ লোকমণ্ডলীর একটা curve অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে binomial theorem অনুসারে তাহা একটা polygonal curve হইবে। কিন্তু এ প্রকারের বিশুদ্ধতা জীব-জগতে পাওয়া যায় না। সেই জন্যই বলিতে হইবে যে, কোন জাতি আর বিশুদ্ধ নয়। তৎপরে phenotype হইতেছে প্রত্যেক মানুষের বাহ্যিক আকৃতি; অর্থাৎ আজকালকার মানুষের দেহে নানা প্রকার রক্ত মিশ্রিত। সে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত বহু সহস্র পূর্ব্বপুরুষের লক্ষণের সম্মিলন (mosaic)। সেই জন্য প্রত্যেক মানুষ খাঁটি biotypeএর পরিচায়ক নহে; সে ব্যক্তিগত ভাবে একটি phenotype।

ইহাতে দেখা গেল যে, race শব্দের পরিবর্ত্তে আজ কাল biotype শব্দ ব্যবহৃত হয়; এবং biotypeদের পরস্পরের সহিত প্রভেদ করিবার জন্য কোন্ biotype কোন শারীরিক লক্ষণালঙ্কৃত তাহার পরিচয় দেওয়া হয়। ইহা গেল ইয়োরোপীয় ভাষার ব্যবস্থা; কিন্তু আমাদের ভারতীয় ভাষাসমূহে race, tribe, peaple, nation প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থবাচক শব্দের পরিচায়ক ভারতীয় শব্দের অভাব। সংস্কৃত "জাতি" অথবা ফার্শি "কৌম" শব্দ এই প্রকার ইয়োরোপীয় শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে যথার্থ অর্থ গ্রহণে অনর্থ ঘটে! সংস্কৃত "জন" শব্দ tribe ও nation উভয় অর্থে প্রযুজ্য। ইহাতে বৈজ্ঞানিক অর্থের প্রাঞ্জলতার লাঘব হয়। আশা করি যে, আমাদের দেশের সাহিত্য-পরিষদসমূহ এই সব বৈজ্ঞানিক শব্দের ভারতীয় প্রতিশব্দের সৃষ্টি করিবেন। শুনা যায় যে, হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আরবী হইতে মূল শব্দ সংগ্রহ করিয়া উর্দ্দু ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দসমূহের সৃষ্টি করিতেছেন। জানি না, তাহা ভারতে সার্ব্বজনীন হইবে কি না।

পূর্ব্বে মানবজাতিকে নানা প্রকারে বিভক্ত করিয়া নানা নামে অভিহিত করা হইত। সুইডেনের Linneus মনুষ্য জাতিকে—আমেরিকান, ইয়োরোপীয়ান, এসিয়াবাসী ও আফ্রিকান এই চারি জাতিতে (race) বিভক্ত করেন। তিনি গাত্রের রংএর দ্বারা মানবকে বিভক্ত করেন নাই; কারণ, তিনি বলিয়াছিলেন, nihim credo colori (আমি রংএ বিশ্বাস করি না)! তৎপরে আসেন Blumenback। তিনি রং দ্বারা মানবজাতিকে, Caucasian (শ্বেত), Mongolian, (পীত), Ethiopian (কৃষ্ণ), American (লাল) ও Malay (brown) এই পাঁচ জাতিতে বিভক্ত করেন। কিন্তু এ বিভাগ যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন নহে। ইহার পর অন্যান্য লেখকেরা মানবকে আরও নানা ভাগে বিভক্ত করেন এবং জগতে অজস্র জাতির (race) সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন! এই প্রকারে Buffon ছয় জাতি, Peschel সাত জাতি, Agassit আটজাতি, Morton বাইশ জাতি, Crawford ষাট জাতির সৃষ্টি করেন! আবার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন নৃ-বৈজ্ঞানিক Gustave Fritsch এই জাতিগুলিকে গুলিয়া তিনটিতে দাঁড় করান! তাঁহার মতে জগতে তিন প্রকারের মানব জাতি আছে; যথা, মূল জাতি (Protomorphope), মিশ্রিত জাতিসমূহ (metamorphope), আর শাসক জাতিসমূহ (archimorphope)! ইহাতেই দৃষ্ট হয় যে "race" এই শব্দটার মানে স্থিরীকৃত করা যাইতে পারে না। তবে কোন স্থানের বিশিষ্ট শারীরিক লক্ষণযুক্ত সাধারণ লোক-সমষ্টিকে,—যাহারা এই লক্ষণ-সমূহের বিশেষত্ব দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবাসী হইতে কম-বেশী ভাবে পৃথক প্রতীয়মান হয়—তাহাকে একটা race বলিলে কতকটা মানে হয়। কিন্তু আজকাল এবম্প্রকার বিশুদ্ধ raceকে biotype বলে। উপরি উক্ত তালিকা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানবজাতিকে যথেচ্ছভাবে বিভক্ত করাকে কোন বৈজ্ঞানিক স্থিরীকৃত ভিত্তির উপর স্থাপন করা যায় না। যাঁহার যেমন ইচ্ছা তিনি তদুপযোগী একটা মত দিয়াছেন। যাহাদের "শ্বেত" জাতি বলা হইয়াছে, তাহারাই একমাত্র শ্বেতচর্ম্মী নহে। যাহাদের "পীত" বলা হয় তাহারা পীত নহে, ইত্যাদি। তৎপরে যাহাদের Caucasian বলা হয়, তাহাদের সঙ্গে Caucasus প্রদেশের কোন সম্পর্ক নাই, ইত্যাদি!

এতক্ষণ আমরা race শব্দটার বিচার করিলাম। এক্ষণে কথা হইতেছে, মানব কোন্ সময়ে সর্ব্বপ্রথম এ জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, ও সেই প্রকাশ-স্থল কোথায়? বিভিন্ন ধর্ম্মের Cosmogonyতে নানাপ্রকার গল্প আছে। সে সব কিংবদন্তী বিজ্ঞান হইতে একেবারেই বাদ দিতে হইবে। অনেক dilettantও মানবের জগতে প্রকাশের বয়স নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এ চেষ্টা বৃথা হইয়াছে। কারণ, আমরা আজ পর্য্যন্ত নিশ্চয় রূপে জানি না, কোন্ সময়ে প্রথম মানব তাহার পশু-সদৃশ পূর্ব্বপুরুষ হইতে পৃথক হইয়াছে। অবশ্য ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, অগ্নিকে সম্পূর্ণ রূপে আয়ত্ত করিয়া মানবের পূর্ব্বপুরুষ প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য হইয়াছে। কিংবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, কার্য্যকরী যন্ত্রাদি (tools) ব্যবহারের জন্য আয়ত্ত করিয়া, অথবা একটি উচ্চারিত ভাষা ব্যবহার করিয়া, মানব তাহার পূর্ব্বপুরুষ হইতে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে।

শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ডারউইনের মত অবগত আছেন যে, বানর হইতে মনুষ্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। এ অভিব্যক্তি principleটা আজকাল অন্য আকারে গৃহীত হয়। মানব "বনমানুষে"র বংশধর নহে; বরং মানব ও বানরজাতি

(primates) উভয়েই Lemur নামক ক্ষুদ্র পশু হইতে পাশাপাশি অভিব্যক্ত হইয়াছে। মানব ও গরিলা, সিম্পাঞ্জি, ওরাংউটাঙ্গ প্রভৃতি মানব সদৃশ বানর জাতির (anthropoid apes) পূর্ব্বপুরুষ এই Lemur। এই জন্তু বর্ত্তমান সময়ে মাদাগাস্কারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আকৃতিতে ইহা বানরের মতন নহে; কিন্তু শরীরের আভ্যন্তরীন (anatomical) গঠন বানরজাতি সদৃশ। এই পশুই মানবের primatedদের পূর্ব্বপুরুষ। সেই জন্য গরিলা, সিম্পাঞ্জি ও মানবের মধ্যের missing link (সংযোগের হারান শিকল) সন্ধান করিবার জন্য আজকাল কেহ ব্যস্ত নহেন। কিন্তু মাঝে যবদ্বীপে একটি মানবসদৃশ জন্তুর অস্থি-কঙ্কাল (skeleton) আবিষ্কৃত হওয়ায়, বৈজ্ঞানিক জগতে হুজুগ উঠিয়াছিল যে, মানব ও বানরের মধ্যবর্ত্তী missing link প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই অস্থির অধিকারী জন্তুকে pithecan-thropos erectus নামে অভিহিত করা হয়। এই জীবের অস্থির পায়ের বুড়া অঙ্গুলি মানবের সদৃশ ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন না—এ বিষয়ে মানব ও বানরের ব্যবধান কোথায়! তৎপরে মানবের খাড়া হইয়া চলার অভ্যাস নিশ্চয়ই অনেক geologic periodএর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া গমন করিয়াছে! এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই অস্থি missing link নহে, ইহা একটি বড় মানব সদৃশ বানরের (anthropoid ape)! তৎপরে ভূতত্ত্ববিদেরা (Geologists) বলেন, ভূগর্ভের যে স্তরে এই অস্থি পাওয়া গিয়াছে, তাহা আধুনিক যুগের। সে সময়ের ভূ-স্তরে মানবের অস্থিই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এই সব কারণে, কোন্ সময়ে যথার্থ মানব উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ করা অতি শক্ত ব্যাপার। মানবের সভ্যতার উৎপত্তির সময় বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা বলিতেন যে, প্রস্তর-যুগ (stone period) কাংস্য-যুগ (Bronze period) ও লৌহ-যুগ (iron period) গড়ে ২০০০ বৎসর করিয়া ছিল। অতএব ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে মানব-সভ্যতার আরম্ভ হইয়াছে! কিন্তু আজকাল স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উত্তর ইয়োরোপে লৌহ খৃঃ পূঃ ৩০০ সালে সার্ব্বজনীন হয়, এবং বাবিলন ও আসিরীয়ায় খৃঃ পূঃ ৯০০

সালের পূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। খৃঃ পূঃ ৫০০ সালে (500 B-C) পশ্চিম ইয়োরোপে ও আলপ্স প্রদেশে Hallstatt period of cultureএর সময় কাংস্য যুগ বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু ৪০০ খৃঃ পূঃ La-Te'ne cultureএর সময়ে কাংস্যের ব্যবহার কম হইতে আরম্ভ হয়। কখন তাম্র হইতে কাংস্য নির্ম্মাণ-পদ্ধতির আবিষ্কার হয়, তাহা এখনও অজ্ঞাত। কেহ কেহ বলেন যে, খৃঃ পূঃ ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে বোধ হয় সিশরে উহা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই কাংস্য যুগের পূর্ব্বে neolithic period—যে সময়ে ধারাল প্রস্তরের, ও প্রস্তরের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া দাণ্ডা লাগাইয়া যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নির্ম্মিত হইত,—কয়েক সহস্র বৎসর বিদ্যমান ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, neolithic period (নূতন প্রস্তরের যুগ) বিশ সহস্র বৎসর বর্ত্তমান ছিল। এই যুগের পূর্ব্বে আবার প্রাচীন প্রস্তরের যুগ (palaeolithic period) অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া বর্ত্তমান ছিল। এই যুগ কত দিন ব্যাপী ছিল, তাহার স্থিরতা এখনও হয় নাই। বার্লিনের ভূতত্ত্বের (geology) অধ্যাপক A. Penek বলেন যে, তিনি ইয়োরোপে অনেকবার glacial periodএর (বরফের যুগ) অস্তিত্ব পাইয়াছেন। অর্থাৎ একবার বরফ যুগ আসিয়া সব ধ্বংস করিয়া দেয়; আবার বরফ হটিয়া যায় ও উত্তর ইয়োরোপ জীবের বসবাসের উপযোগী হয়। আবার বরফ নামিয়া সব ধ্বংস করিয়া দেয়। এই প্রকারে কতিপয়বার বরফ-যুগ উত্তর ইয়োরোপে অবতীর্ণ হয়। এই যুগগুলির ব্যবধান কাল এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু এই ব্যবধান সময়ে যখন বরফ বর্ত্তমান ছিল না, তখনকার প্রস্তরের যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন dilettant এই একটি ব্যবধান-সময় এক লক্ষ বৎসর বা দেড় লক্ষ বৎসর বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু এই প্রস্তর-যন্ত্রপাতির সৃষ্টি ও ব্যবহার যে অনেক লম্বা geologic period দ্বারা সংগঠিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যথার্থ মানব যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিত ও একটা ভাষায় কথা কহিত এবং বাস করিবার জন্য একটা আস্তানা নির্ম্মাণ করিত, সে যে কখন এ জগতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই।

মানবের সভ্যতার প্রথম উদয়-কাল প্রাচীন প্রস্তর-যুগ। এ যুগ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান ছিল। তবে তাহার আয়ু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের। এ স্থলে ইয়োরোপের প্রস্তর ও অন্যান্য যুগের কথার উল্লেখ করিলাম; কারণ, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা ভূখণ্ড তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন। অন্য ভূখণ্ডে (উত্তর আমেরিকা ব্যতীত) এ প্রকারের অনুসন্ধান বিশেষ ভাবে হয় নাই। এই স্থলে পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উল্লেখ করিলাম যে, ভারতেও প্রস্তর যুগের অস্তিত্ব Seton Kerr আবিষ্কার করিয়াছেন। সে যুগের ব্যবহৃত প্রস্তরের হাতুড়ি ইত্যাদি (tools) অনেক বাহির হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের অধিকারীরা কোন ভাষা-ভাষী ছিল তাহা অন্য কথা; কিন্তু আর্য্যভাষা-ভাষী নিশ্চয়ই নহে।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে, বিজ্ঞান মানবের উৎপত্তির সময় নির্দ্ধারণ করিতে এখনও অক্ষম। কিন্তু সর্ব্ব প্রাচীন মানবের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রাচীন প্রস্তর-যুগের সময়ের মানবের অস্থিকঙ্কাল Neanderthal, Spy, Gibralter, ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থান ও Croatiaর Krapina হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কঙ্কালের মস্তক পরীক্ষা করিয়া দৃষ্ট হয় যে, ইহার লক্ষণসমূহ হইতে ইহাকে "primitive" (অতি প্রাচীন) পদবাচ্য করা যায়। এই মস্তকের চক্ষের ভ্রূযুগল বড় ঠেলিয়া বাহির হওয়া (গরিলার মতন) লক্ষণযুক্ত, গঠন বড় শক্ত ও brutal আকার। অন্যান্য লক্ষণাদি বড়ই প্রাচীন। তৎপরে উপরিউক্ত বিভিন্ন স্থানের কঙ্কালের মস্তকগুলি দেশের ব্যবধান সত্ত্বেও এক প্রকারের। এই জন্য তাহাদের বিভিন্ন species বলা যায় না। এবম্প্রকার কঙ্কালের অধিকারী যে প্রাচীন প্রস্তর-যুগে জীবিত ছিল, তাহাকে নৃ-বৈজ্ঞানিকেরা Homo neandertalensis (কারণ নিয়াণ্ডার উপত্যকায় এই প্রকারের কঙ্কাল প্রথম আবিষ্কৃত হয়) অথবা Homo primigenius (প্রথম মানব) বলিয়া অভিহিত করেন। এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানব—বর্ত্তমান Homo sapiens (জ্ঞানবিশিষ্ট) মানবের সহিত এক Zoologic speciesএর অন্তর্গত কি না? অর্থাৎ এই প্রাচীন মানব হইতে বর্ত্তমান মানব জাতির উৎপত্তি হইয়াছে কি না? এ বিষয়ে বিভিন্ন মত বিদ্যমান। Gustav Schwalb—যিনি এই কঙ্কাল বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করিয়াছেন—বলেন "না"। অর্থাৎ, তাঁহার মতে, এই প্রাচীন লক্ষণাক্রান্ত মনুষ্যজাতি লোপ পাইয়াছে। আর বর্ত্তমানের মানব অন্য species; অর্থাৎ তাহার উৎপত্তির মূল বিভিন্ন। কিন্তু ৺পরলোকগত বিখ্যাত Kollmann বলেন যে, বর্ত্তমান কালের অনেক জীবিত ইয়োরোপীয়ান যে তাহাদের স্কন্ধের উপর এই প্রাচীন লক্ষণাক্রান্ত মস্তক লইয়া বেড়াইতেছে, তাহা তাহারা atavistic উপায়ে প্রাপ্ত হইয়াছে (বিখ্যাত জার্ম্মাণ সঙ্গীতাচার্য্য wagnerএর এবম্প্রকারের লক্ষণাক্রান্ত মস্তক ছিল, অবশ্য তাহা তাঁহার কঙ্কাল-মস্তক পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হয়)। তাহার অর্থ এই যে বর্ত্তমান কালের ইয়োরোপীয়ানরা সেই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের Homo neander-talensisএর বংশধর। আমার পরলোকগত অধ্যাপক Von Luschenও তাহাই বলেন। তিনি মানবজাতির একতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আজকালকার মানব-জাতির উৎপত্তির মূল সেই পুরাতন মানব-জাতি হইতে বিভিন্ন, এরূপ বলিবার প্রমাণ নাই,—বর্ত্তমান ইয়োরোপীয়েরা প্রাচীনদের বংশধর। এই তর্ক উদয় হইবার কারণ এই যে, neandertal মানবের অস্তিত্বের পরে যখন ইয়োরোপে cro-magnon মানবের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তখন শেষোক্ত মানবের মস্তক বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় মস্তকের সদৃশ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। আর প্রাচীন ও নব-আবিষ্কৃত কঙ্কালের মস্তকের সাদৃশ্য নাই; এবং দুয়ের মধ্যে যে ব্যবধান-সময় আছে, তাহাতে অন্য লক্ষণাক্রান্ত মানবের ক্রমবিকাশের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদের মস্তক এই Homo neandertalensisএর লক্ষণযুক্ত! ইহাতেই অনুমান হয় যে, ইয়োরোপের প্রাচীন মানবজাতির সহিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিম মানব-জাতির "জাতিগত" (racial) সম্পর্ক ছিল। অবশ্য এই স্থলে উল্লেখ্য যে, neandertal কঙ্কালের মস্তক ব্যতীত অন্য অস্থির সহিত অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সাদৃশ্য বা ঐক্য নাই। কিন্তু তাহা দেশ ব্যবধানে বিভিন্ন হইতে পারে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মস্তকের (skull) উপর জোর দিতেছেন। এই জন্য বোধ হয় যে, প্রাচীন প্রস্তরযুগে ইয়োরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ার সংযোগ ছিল।

আবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি skull পাওয়া গিয়াছে, যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে Homo Rhoden-siensis তাহার সঙ্গে Homo primigeniusএর না কি সাদৃশ্য আছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে স্থলেই প্রাচীন মানবের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা প্রায় একই লক্ষণাক্রান্ত।

এই প্রাচীন মানব কি প্রকারে নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া বর্ত্তমানে নানা প্রকারের মানব জাতিতে পরিণত হইল, তাহা ক্রমশঃ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

অজ্ঞাত পর্ব্ব

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুদীর্ঘ বনবাস তো বটেই, তাহার উপর আবার কিছুকাল অজ্ঞাতবাস,—এইরূপ ব্যবস্থা লইয়া পাণ্ডবগণ আজ এখানে কাল ওখানে করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। দুরাচার দুর্য্যোধনের চর পিছনে লাগিয়াই আছে—কিসে তাঁহাদের অনিষ্ট করিবে। বনবাস-কাল এমনি করিয়া কাটিয়া গেল, কিন্তু অজ্ঞাতবাস তো এ ভাবে চলে না! অজ্ঞাতবাস, জ্ঞাত হইলেই সর্ব্বনাশ, পুনরপি নিশ্চয় বনবাস! কাজেই তাঁহাদিগকে গভীর অরণ্যানী, পাহাড়-পর্ব্বতাদি দুর্গম স্থানের আশ্রয় লইতে হইল। এ হেন অজ্ঞাত বাসাবস্থায় তাঁহারা কিছু দিন বিন্ধ্যাচলের শাখা-প্রশাখা-পরিশোভিত বিশাল-বৃক্ষ-বনাচ্ছাদিত, সাওতালী সিংভূমের সুবর্ণরেখা স্রোতস্বতী তটে ঘাটশীলা নামক স্থানে অবস্থান করেন, এ প্রবাদ এ প্রদেশে আবহমানকাল প্রচলিত। ঘাটশীলা, লেখকের কর্ম্মস্থান জেমসেদ্‌পুর হইতে

কলিকাতার দিকে রেলে মাত্র ২২ মাইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, অযুত বলশালী ক্ষিপ্রগতি ভীম, বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন, রণদুর্ম্মদ ভ্রাতৃদ্বয় নকুল ও সহদেব যেখানে 'গা-ঢাকা' দিয়া কিছুকাল কাটাইয়া গিয়াছেন,—ধর্ম্মজ্ঞান-বিরহিত, ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল, শম্বুকগতি, ভীরুর অগ্রগণ্য, গৃহকোণে অসম-সাহসী লেখকেরও সেই স্থানে কিছু দিন অজ্ঞাতবাসের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তাই সেদিন সদলবলে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

ঘাটশিলা গিরিবর্ত্ম—চাইবাসা-মেদিনীপুর রোড
শ্রীপার্ব্বতীচরণ মাইতি গৃহীত ফটো

উপস্থিত তো হইলাম,—কিন্তু যাঁহার গৃহে এই অজ্ঞাতবাসের ব্যবস্থা, তিনি অনুপস্থিত ও অন্যত্র—সুতরাং নিজেই অজ্ঞাত। কাজেই ব্যবস্থা এই পাহাড় ও পাথরের দেশে তখন অকূল পাথার। সন্ধ্যা তখন হয়-হয়,—ধীরে-ধীরে বন্ধুর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এক পা দুই পা করিয়া তাঁহার বাংলায় অনধিকার-প্রবেশ পূর্ব্বক বারান্দায় একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অনধিকার-উপবেশনও করিলাম। শুনিলাম, তিনি আমাদের থাকিবার ব্যবস্থাদিও করিয়া গিয়াছেন। মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইল। বাসার,—হায় হায়, Gross insult—সব ক্ষমা করিবেন, এ যে changeএর দেশ!—বাংলার, চাকর-বাকর—না-না, বেহারা ও খানসামারা, যে যার গৃহে প্রস্থান করিল। বারান্দায় বসিয়া আমি এদিক-ওদিক চাহিতেছি ও অদূরের অনতিবৃহৎ গাছটা বট না আর কিছু তাহাই ভাবিতেছি, এবং সাম্‌নের ঝোপ-ঝাড়ের উপর দিয়া ডোবার জলের খানিকটা ও তদুপরি অসংখ্য পদ্মের সারি দেখিতেছি,—আশে-পাশে ধানের ক্ষেতও নজরে পড়িতেছে। সবেমাত্র আসিয়াছি,—অন্ধকারও হইয়াছে,—চারিদিক কেমন যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। এমন সময় একটী বালক একপাল গরু লইয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। আঁধারের ঘনত্ব

নুভব করিতে করিতে আমি ভাবিলাম, ব্যস্— "and eaves the world to darkness and to me!" স্তুতঃ এক রাত্রির জন্যও আমি 'গ্রে',—সম্মুখের পদ্ম-কুরের পাড় "a country churchyard,"—ভাব্য বিষয় Elegy"; সামনের ঝোপ-ছাড়গুলি "those rugged lms." আর সেই বড় গাছটা that yeu tree; এবং জ্ঞাতবাসে আসিয়া হয়ত অজ্ঞাত Village Hampden Cromwellএর অস্তিত্ব অচিরেই সকলকে ত করাইবে। কিন্তু যাহা হইবার নয়, তাহা

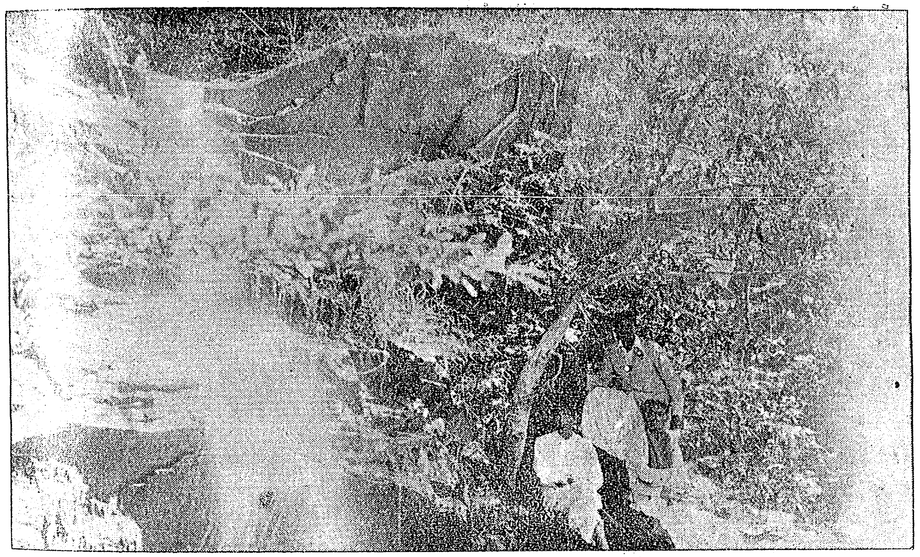

ঘাটশিলার একটি প্রপাত
শ্রীপার্ব্বতীচরণ মাইতি গৃহীত

হইতেও পারে না। কাজেই আমারও তাহা হইল না।

অজ্ঞাতবাসে আসিয়া প্রথমেই শুনিলাম যে, এখন চেঞ্জের (changeএর) সময়; এজন্য বাড়ী ভাড়া পাওয়া যাইতেছে না। কি করি, বাড়ী না মিলিলে আমার অজ্ঞাতবাসও এই পর্য্যন্ত; কারণ, সপরিবারে আসিয়াছি। পরদিন প্রত্যূষে এক বন্ধুর পরিচয়পত্র দলিল স্বরূপ লইয়া মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর তহশীলদার,—তাঁহার এক আত্মীয় ভদ্রলোকের বাসায় উপস্থিত হইলাম। ভদ্রলোক আমাকে কোথাও দেখিয়া থাকিবেন, এবং দৈবাৎ হয়ত নামটা কোন প্রকারে মনেও রাখিয়াছেন। তিনি শুধু ডাকিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন—আবার যেন দেখা হয়।

তথাস্তু, আমার নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতে এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহার অনুরোধ মত (?) একবার তাঁহার উপর চড়াও করাই স্থির করিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি এরূপ ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন—যেন কত দিনের আলাপ। অনুমানে বুঝিলাম যে, সাত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ২।১

দিন মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আলাপ যে বিশেষ কিছু হইয়াছিল তাহা নহে। তথাপি তিনি আমাকে মনে করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতেই বুঝুন, তিনি কি ধরণের লোক। আমিও বুঝিলাম যে, যে এতটা মনে করিয়া রাখিতে পারে, এবং ঘরের ভিতর হইতে, কিছু দূরস্থিত পথে চলন্ত লোককে এরূপ অকস্মাৎ চিনিতে পারে,—সে কাজও কিছু করিতে পারে। সুতরাং গৌর-চন্দ্রিকা না করিয়াই, কত দিন ওখানে থাকিব, তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম যে, সেই বৈকালেই ফিরিব। পক্ষকাল অজ্ঞাত-বাসের জন্য আসিয়াছিলাম; কিন্তু বাসা না পাওয়ায় ফিরিতে

সুবর্ণরেখার পারাপারের শালের ডোঙ্গা

শ্রীশঙ্কররাও গৃহীত

হইতেছে। আমি ইতিমধ্যেই সংবাদ লইয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, এখন Changeএর Season ও বাস্তবিক সমস্ত বাড়ীই বায়ুসেবীদের দ্বারা বায়না হইয়া গিয়াছে, একটীও খালি নাই। পোষ্টমাষ্টার বাবু বলিলেন, সবই সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া, পক্ষকাল থাকিতে আসিয়া, একটী বাসা অভাবে ফিরিয়া যাইব, তাহা হইতেই পারে না। যেমন করিয়াই হউক, ঐ দিনই তিনি একটী বাসা ঠিক করিয়া দিবেন—নেহাৎপক্ষে ডাকঘর সংলগ্ন তাঁহার বাসা তো আছেই। আমি তো অবাক যে, লোকটা বলে কি? বোধ হয় লেখাপড়া কিছু শেখে নাই, অন্ততঃ জ্ঞান কিছু হয় নাই; নহিলে, হিতোপদেশের সোজা কথাটাও জানে না—অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসঃ দেয় ন কস্যচিৎ! নহিলে, বলে কি না, ডাকঘরের সংলগ্ন বাড়ীতে স্থান দিবে! তাহাও আবার আজকালকার বাজারে! ভাবিলাম, লোকটা হয় বোকা, নয় পাগল। কিন্তু পরে যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিলাম যে, দুয়ের কিছুই নয়—বরং তিনিই লোককে তাহা বানাইতে পারেন।

কয়েকটী বাংলো ঘুরাইয়া, বাস্তবিকই তিনি তৎক্ষণাৎ একটী ছোট বাংলো ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্টের চেয়েও অধিক। ভাড়াও আশাতীত কম। ৪০৲।৫০৲ হইতে ১৫০৲।২০০৲ যেখানে বাংলোর ভাড়া, সেখানে আমার বাংলো একরূপ বিনা ভাড়ায় বলিলেও চলে। তার পরই চারিদিকে তিনি লোক পাঠাইতে লাগিলেন। কয়লা পাওয়া যায় না—কেহ কাষ্ঠের সন্ধানে গেল, কেহ গেল বাজারে, কেহ ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিল। জিনিসপত্র বাসায় আনিবার জন্য একখানি গাড়ী করিয়া দিলেন। নিজের বাড়ীর দাসীকে আমার বাসায় কাজ করিতে পাঠাইলেন। বিছানার জন্য খাট পাঠাইলেন। এইরূপে যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত অচিরে বন্দোবস্ত হইয়া গেল,—দেখি, হাঁ, Village Postmaster

বটে। শুধু কি তাই, আবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে,—তারে কি বেতারে জানি না,—আমার আগমন-বার্ত্তা জানাইয়া দিলেন। আমরা হাঁপ ছাড়িয়া অজ্ঞাতবাস সুরু করিলাম।

নূতন বাসার বারান্দায় বসিয়া আছি, এমন সময় পাড়ার কাশী মোড়ল একগাড়ী কাঠ লইয়া উপস্থিত। নূতন বাসা বলিলাম, তাহার কারণ, সাহেবী প্যাটার্ণের লোকের বা সাহেব বা ইংরাজদের বাংলোয় বা বাংলায় বাস বেশ মানায়, কিন্তু আমার মত পাড়াগেঁয়ে বাঙ্গালীর বাংলায় বাস কি ধাতে সয়? যাক্, যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। মোড়লের-পো, বলা বাহুল্য, একেবারেই পাড়াগেঁয়ে, সঁব হাঁওয়া খেঁতে আঁস্‌ছেন।" সে জানে যে, এখানকার যত বায়ুসেবী বাবু—সব কলিকাতার আমদানী। অন্য স্থান হইতে যে কেহ আসিতে পারে, সেটা তাহার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নহে। সে জিজ্ঞাসা করিল্, "কলকাতার গিরিঁশ বাবুকে জানেন?" আমি ভাবিলাম, লোকটা সমজদার বটে, নিশ্চয়ই থিয়েটারের খোঁজ খবর রাখে। আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে আবার কথা কহিল—যেন আমাকে ঠকাইতে পারিলে বাঁচে। বলিল "চিন্‌লেন নাই? গিরিঁশ বাবু আঁমাদের ই-ঠিনে (এখানে) কিরাণী বাবু ছিলেন, ভারী কিরাণী বটেন।" আমি চিনি না শুনিয়া সে একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল। তাহার পর তাহাদের

সুবর্ণরেখার সাধারণ দৃশ্য

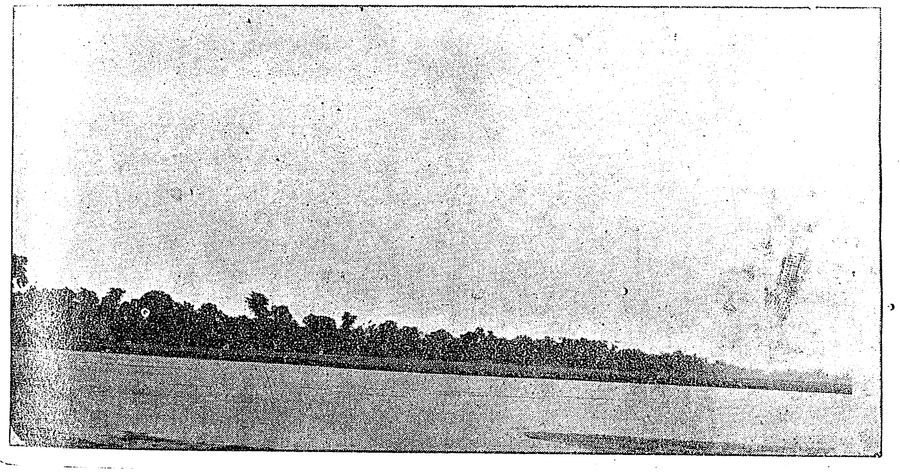

শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত

আমারই মত—সম্পূর্ণ খাজা বলিলেও চলে। আমাকে দেখিয়া সোজা তাঁহার নিজের ভাষায় বলিলেন,—আপন্যাই আসঁ্যাছেন বটেক? আমি বলিলাম "হাঁ।" দেখিলাম, বেশ আলাপী লোক; তাতে আবার খাস এখানকার; সুতরাং আমিও একটু ঘেঁসিলাম—তাহার কাছে তাহাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি কিছু কিছু জানা যাইবে বলিয়া।

সে বলিল, "এজ্ঞে, আপনাদের ঘরটা কল্‌কাতায় বটেন!" আমি বলিলাম, "হঁ, লগিজ্যাঁই (কাছেই) বটেন।" সে তৎক্ষণাৎ বলিল, "হঁ, এই কল্‌কাতালেই তো বাবুরা দেশের রসিক ময়রাকে চিনি কি না একবার জিজ্ঞাসা করিল, কারণ সেও কলিকাতায় থাকে। তাহাকেও চিনি না শুনিয়া সে ঠাওরাইল যে, তবে আমি কলিকাতার কিছুই জানি না। তাহার পর সে বেশ স্পষ্টই বলিল—"এই দেখ্‌ছেন নাই, দ্যাঁশে তো বাবুগুলানের কুছু খাঁতে নাই মিল্‌ছেন, তাই ই-ঠিনে হাঁওয়া খাঁতে আঁসে কোঁরে হামাদের মাথাগুলানকে খাঁলেন। আমরা দুকুড়ি পৈলা (কাঠা পালি) চাল কিন্‌তি। এক কুড়ি দশ পৈলা হোলোক, এক কুড়ি হোলোক্, অখন্ (এখন) ৭।৮ পৈলা নাই মিল্‌ছেন। কুঁকড়া (মুরগী) গুলা বাবুরা

খাঁইয়ে খাঁইয়ে মাঙ্গা করে দিলেক। আট দশ আনার কম একটা নাই মিল্ছেন। এক টাকায় দু টাকায় একটা ডাগর পাঠা মিলতক্, খাতে লারতি (পারিতাম না), আর অখন বার আনা সের মাঙ্গছেন্। ঝিলা, রামতরই (ঢেঁড়স) কাঁকড় (শশা), দিঙ্‌লা (কুমড়া) কি আর কিইনে খাঁতি? অখন দেখছেন নাই চার গণ্ডা দিতে মাঙ্গলে বাবুরা তিন গণ্ডা মাঙ্গ্‌ছেন" ইত্যাদি।

বাবুদের উপর মোড়লের এইরূপ সু-উচ্চ ধারণা দেখিয়া আমি অন্য কথা পাড়িলাম। আগেই শুনিয়াছিলাম যে, এই সময়ে এ দেশের প্রধান পর্ব্ব হইয়া থাকে। আমাদের দুর্গোৎসবও শরৎ কালেরই উৎসব। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কোন না কোনরূপ শারদোৎসব আছেই। এ দেশেও আছে, তবে এখানে ইহা প্রধানতঃ হো, কোল্, সাঁওতাল-দের। সুতরাং আমার পক্ষে এ এক অজ্ঞাত পর্ব্ব।

পরব এদের অনেকগুলি, যথা—মাঘীপরব, বা-পরব, দাঁমুরাই পরব, হীরা পরব, বাতায়ুলী পরব, জাম্‌নাসা পরব, কালাম্ পরব ইত্যাদি। কিন্তু ঘাটশীলায় বিঁধা পরব ও ইন্দ্ পরবই প্রধান।

মোড়লকে তাহাদের বর্ত্তমান বিঁধা পরবের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে যেরূপ বলিল আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

"হুঁ, বিঁধা বটেক। দেখ্‌বেন ভারী পরব। দু দশ বিশ কুড়ি লোক আস্‌বেন। এ-কে-বা-রে লোকে লো-কা-র-ণ। আপনারা ই-ঠিন্‌লেই (এখান থেকেই) জান্‌তে পারবেন। আজ রাত দুপুর বাজে পরব সুরু হবেন। বাজী চল্‌বে, আগোন, আগোন, (আগুন, আগুন,) বোমা ফাট্‌বেন্ দুল্-দুল্ (দুম্-দুম্), ঘুমাতে লারবেন। সারা রাত আপনাদের পথটায় লোক চলবেন। তার পর উঠিনে রিঙ্কিনি মন্দিরে রাজা আস্‌বেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ রাজা। সে তো অবাক্! কারণ, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি "কোন্ রাজা"! তাহাদের রাজার কথা জানে না—এরূপ যে কেহ আছে, তাহা তাহার অজ্ঞাত।

সে বলিল "এজ্ঞে বুঝ্‌লেন নাই? ধলভূঁঞার রাজা বটেন। ভারি রাজা। রাজার উল্ আছেন, ডিগ্রি আছেন (উইল ও ডিক্রী)। যেমন তেমন কি বটেন? হাঁকোটলে (হাইকোর্ট হইতে) হুকুম আন্‌লো। কে পারবেক রাজাকে। সি (সে) বারে মোকর্দ্দমা কর্‌লেক্, ৭ হাঁজার টাকা মিল্‌লেক।" মোড়ল আবার খেই হারিয়েছে দেখে, আমি বিঁধার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে,

ঘাটশিলার আর একটি প্রপাত
শ্রীপার্ব্বতীচরণ মাইতি গৃহীত

"রাজা আঁসে করে কি করবেন?" তখন সে আবার বলিতে লাগিল, "এজ্ঞ্যা রাজা হাঁওয়াগাড়ীনে আঁসে কোরে কাঁড়্যা দিবেন।" আমি বলিলাম, "সে কি?" সে বলিল,—"রাজা আঁসে করে কাঁড়্‌লে কাড়াটাকে বিঁধবেন। (অর্থাৎ তীর দ্বারা মহিষ শাবককে বিঁধিবেন।) ইহাই তো বিঁধা বটেক।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তার পর"—সে বলিল "তার পর সাঁওতালরা কাড়াটাকে কাঁট্যা দিবেন। রাজা কাড়াটার রক্ত লিঁয়ে কপালে ফোঁটা দিবেন, জিভে দিবেন—আর সকলাইও দিবেন। তার পর পাঁঠা পড়্‌বেন তো পড়্‌বেনই, কি একটা দুটা! পাঁঠার পর্ব্বত হবেন। তার পর সেই

রক্ত লিঁয়ে কর‍্যা সব ছিঁটায়ে দিবেন। আর সাঁওতাল মেয়েরা সব লাচ্‌বেন আর জঙ্গলীরাও লাচ্‌বেন; কত রকম বাজনা বাজবেক।"

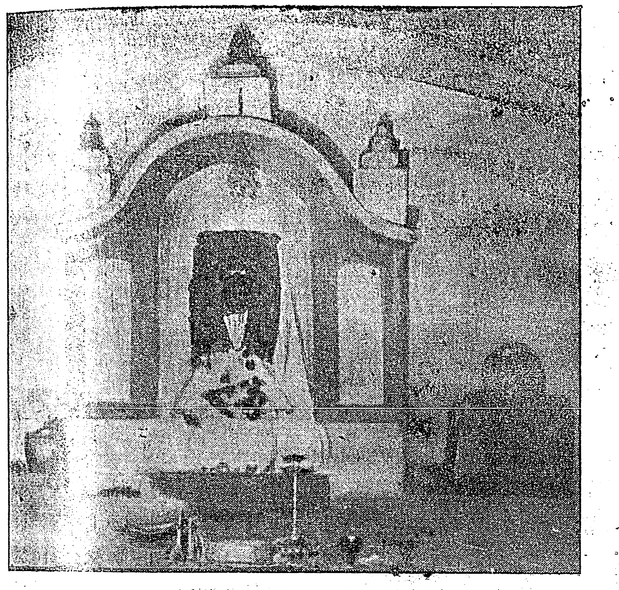

মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীশ্রীরঙ্কিনী দেবী
শ্রীপার্ব্বতীচরণ মাইতি গৃহীত

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজই হবে, না পরেও আরো হবে।" সে বলিল, "এজ্ঞ্যা কাল বেলা তিন পহরেও হবেক দেখ্‌বেন আপ্‌নারা।"

মোড়লের পো বক্তৃতা শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে সংবাদ পাইয়া পূর্ব্বকথিত তহশীলদার বাবু আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে নানাবিধ জিনিস-পত্র। বলিলেন, আমরা নূতন আসিয়াছি—নিশ্চয়ই জিনিসপত্রের অভাবে কষ্ট হইতেছে; সুতরাং তাঁহার সামান্য কিছু দ্রব্যাদি লইতেই হইবে, তাহা নহিলে তিনি ছাড়িবেন না। এবং দ্বিতীয়তঃ, আমরা এখানে বাসা না করিয়া, তাঁহার বাসায় থাকিলে, তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। আপনারাও যে হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষ তিনি আবার নিমন্ত্রণও করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে পোষ্টমাষ্টার বাবু আসিয়া উপস্থিত। অবশ্য ইতিমধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে এদিক ওদিক হইতে কিছু জানিয়াও লইয়াছিলাম। তাঁহার নাম শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জেম্‌সেদ্‌পুর হইতে তিনি লড়ায়ের সময় মেসোপটেমিয়া, আরব, পারস্য, পারস্যোপসাগর, রুষ ইত্যাদি অনেক স্থানে গমন করেন। সুতরাং তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। বেশ মোটা মাহিনায় কাজ করিতেন; সুতরাং বড় বড় circleএ চলা-ফেরাও করিতেন। একেবারে আপ্ টু ডেট্ (up to date)। সঙ্গে সঙ্গে পরোপকারী যতদূর হইতে হয়—এ কথা সেখানে সকলেই বলিতেন। তাঁহার সহিত বিঁধা পরব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল; দেখিলাম, তিনি মোড়লের কথারই প্রায় সমর্থন করিলেন।

এত বড় একটা ব্যাপার যখন, তখন স্থির করিলাম যে, সংবাদপত্রাদির প্রতিনিধি রূপে রাজা ও রাজ-কর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ইহার ইতিবৃত্ত বিশেষ ভাবে সংগ্রহ করিয়া আপনাদের সকলকে শুনাইব। কিন্তু শুনিলাম, ইহাতে কিছু ফল হইবে না। হোরে বলিবে "রামা জানে", রামা

সুবর্ণরেখা-তটে বালুকা-পাহাড়
শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত

বলিবে "শ্যামা বুল্‌লেও বুল্‌বেক্—হামি লারব" (পারিব না)।

এ সব 'হোপলেস্' (!) বুঝিয়া গভীর গবেষণা (?) দ্বারা একটা অজ্ঞাত পর্ব্বের আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত স্থির করিলাম।

সুবর্ণরেখা—ঘাটশিলা
শ্রীপার্ব্বতীচরণ মাইতি গৃহীত

প্রথমতঃ দেখা যাক্—যাহাদের এই দেশ ও পরব, তাহারা কাহারা, এবং কোথায় তাহাদের উৎপত্তি।

এ দেশের নাম সিংভূম বা সিংহভূম। অর্থাৎ সিং বা সিংহ রাজাদের দেশ। আদিমদের এ বিষয়ে মতভেদ আছে। তাহারা বলে যে, সিংভূমেই জগৎ প্রথম সৃষ্ট হয়। জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা, 'সিংবোঙ্গা'র নামানুসারে, দেশের নামও 'সিংবোঙ্গা' হয়। সিংভূম তাহারই অপভ্রংশ। 'সিংবোঙ্গা' অর্থে সূর্য্য।

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রথম যুক্তিই ঠিক। মানসিংহ

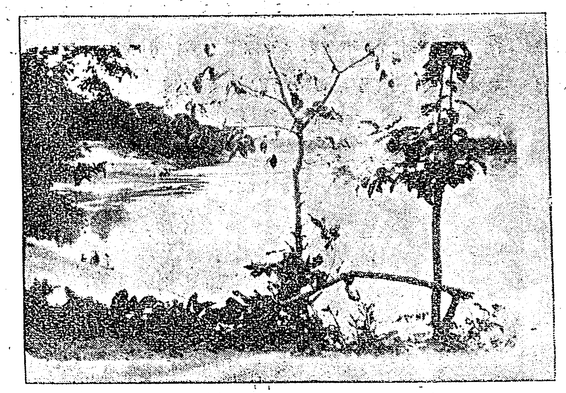

সুবর্ণরেখার সান্ধ্য প্রতিচ্ছবি
শ্রীশঙ্কর রাও গৃহীত

যখন উড়িষ্যা-বিজয়ে ব্যস্ত, সেই সময় এ দেশের ভুঁইঞা রাজারা 'হো'দের দ্বারা উত্যক্ত হইয়া তাঁহার শরণ লন। মানসিংহ তিনজন রাজপুতকে তাহাদের সাহায্যার্থ পাঠান। তাঁহারা তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ কাশীনাথ সিং হো-গণকে পরাভূত করিয়া রাজা হন। ভুঁইঞা রাজারা তাঁহার অধীন জায়গীরদার রূপে গণ্য হন। অন্য দুই ভ্রাতাও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের রাজা হন। কাশীনাথ সিংয়ের রাজ্যের নাম ছিল পরাহাট। ক্রমশঃ তাঁহাদের বিস্তৃত রাজ্যের নাম পরে সিংভূম হয়। এদিকে মল্লরাজাদের দেশ ক্রমে ধলভূম নামে পরিচিত হয়। ঘাটশীলা সিংভূমের ধলরাজগণের সদর স্থান।

এ দেশের আদিম অধিবাসীদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাহাদের শাস্ত্রে যেরূপ বলে—Col. Tickell ১৮৮৪ খৃঃ তাঁহার কোল্‌হান নামক প্রবন্ধে, এবং তাঁহার সমসাময়িক Col. Dalton তাঁহার Ethnology of Bengal নামক গ্রন্থে তাহা এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ওটেবোরাম ও সিংবোঙ্গা স্বয়ংসিদ্ধ আদি দম্পতি ও ভগবান-ভগবতী। তাঁহারা প্রথমতঃ নগ্না ধরিত্রীকে বৃক্ষ-পত্র-লতা-তৃণ-গুল্মে আচ্ছাদিত করেন। তৎপরে যে সকল প্রাণী মানুষের গৃহপালিত হইবে, তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন। তৃতীয়তঃ বন্যজন্তু। এবং চতুর্থতঃ এক বালক ও এক বালিকা। সিংবোঙ্গা এই বালক বালিকাকে এক পাহাড়ের গুহায় রাখিয়া দেন। বয়ঃপ্রাপ্তি সত্ত্বেও তাহাদিগকে দাম্পত্য-ধর্ম্মে অমনোযোগী দেখিয়া, তিনি 'ইল্লি' বা ধান্যেশ্বরী (মদ) প্রস্তুত ও পান-বিধি তাহাদিগকে শিখাইয়া দেন। ইহাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় এবং সেই বালক-বালিকা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পিতা-মাতা হ'ন। তাঁহাদের ১২টী পুত্র ও ১২টী কন্যা হয়। সিংবোঙ্গা যথাকালে তাহাদের সকলকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। তথায় নিম্নলিখিত ভাবে মাংস সাজাইয়া রাখা হয় মহিষ, গরু, ছাগ, মেষ, শূকর, মুরগী ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন তরিতরকারীও ছিল। সিংবোঙ্গা একসঙ্গে একটী বালক ও একটী বালিকাকে দম্পতি রূপে আসিতে বলিয়া, তাহাদের ইপ্সিত খাদ্য লইয়া যাইতে আদেশ দেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দম্পতি গরু ও মহিষ মাংস গ্রহণ করে ও তাহাদের সন্ততিরা 'কোল,' অথবা 'হো' এবং 'ভূমিজ' বলিয়া পরিচিত হয়। যাহারা শুধু তরিতরকারী গ্রহণ করে, তাহাদের সন্ততিরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হয়। ছাগ ও মেষ-খাদকের সন্ততিরা শূদ্র এবং মৎস্য-খাদকের সন্ততিরা 'ভুঁইঞা' হয়। যাহারা শূকর গ্রহণ করে, তাহাদের সন্ততিরা 'সাঁওতাল' হয়। কোন দম্পতি দেরীতে আসায়, কিছুই পায় নাই। এজন্য প্রথম দম্পতি তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট কিছু তাহাদিগকে দেয়। তাহাদের সন্ততিরা 'ঘাসী' বলিয়া পরিচিত হয়। যেহেতু তাহাদের ভাগ্যে কিছুই ছিল না—অন্যের প্রদত্ত খাদ্য তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল, এজন্য ঘাসীদের কোনরূপ কাজ-কর্ম্ম করিতে নাই—পরের অন্নে দিন কাটানই প্রথা (যথা, চৌর্য্য-বৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি)। হো'দের মতে, ইংরাজেরা, প্রথমোক্ত গো বা মহিষ-মাংসগ্রহী দম্পতির সন্ততি; অর্থাৎ কোল বা হো বা ভূমিজদের জাতি।

এই সব জাতিদের পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে ১৮৪০ খৃঃ Col. Tickell লিখিয়াছেন—"The women of the lowest order went about in a disgusting state of nudity wearing nothing but a miserably insufficient rag round the loins." এবং Col. Dalton লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"The men care little about their personal appearance. It requires a great deal of education to reconcile them to the encumbrance of clothing; and even those who are wealthy move about all naked, as proudly as if they were clad in purple and fine linen. The women in an unsophisticated state are equally averse to superfluity of clothing. In remote villages they may still be seen with only a rag between the legs, fastened before and behind to a string round the waist."

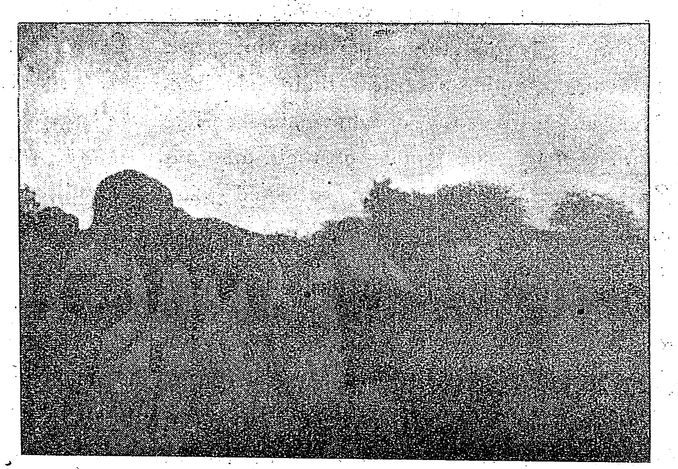

বিঁধা পরবে নৃত্য
শ্রীপার্ব্বতীচরণ মাইতি গৃহীত

এখন অবশ্য তাহারা অনেক সভ্য হইয়াছে। পর্ব্ব উপলক্ষে তাহাদের চাল-চলন কিরূপ হয়, তৎসম্বন্ধে Ethnology of Bengal গ্রন্থে যাহা পাইয়াছি তাহা এই—

"The religious ceremonies over, people give themselves up to feasting, drinking immoderately of rice beer till they are in the state of wild ebriety most suitable for

the process of letting off steam. As the utmost liberty is given to girls, the parents never attempting to exercise any restraint, the girls of one village sometimes pair off with the young men of another, and absent themselves for days. The festival becomes a Saturnale, during which servants forget their duty to their master, children their reverence for parents, men their respect for women, and women all notions of modesty, delicacy and gentleness. Their natures appear to undergo a temporary change. Sons and daughters revile their parents in gross language, and parents their children. Men and women, become almost like animals in the indulgence of their amorous propensities. It cannot be expected that chastity is perserved when the shades of night fall on such a scene of licentiousness and debauchery."

বিঁধা পরবে দেখিলাম, ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। অধিক টীকা অনাবশ্যক। বিঁধার বর্ণনা মোড়ল যাহা করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া বিশেষ কিছুই দেখিলাম না। প্রকাণ্ড মেলা, ১২ দিন উৎসব, সাঁওতাল নাচ, কোল নাচের ছড়াছড়ি। তবে সে নাচ দেখিবার উপযুক্ত। এক স্থানে ৪।৫টী সাঁওতাল বা কোলবালা নৃত্য আরম্ভ করিল,—বাদ্যকরেরা কাড়ানাকাড়া লইয়া তাহাদের অদূরে তালে তালে বাজাইতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই ৪।৫ জন নৃত্যশীলার সহিত ৪।৫ শত নৃত্যশীলা দিল্ খুলিয়া চক্রাকারে যোগদান করিয়া একেবারে সমগ্র স্থানটীকে নূতন আকার প্রদান করিল। বাদ্যকরগণ তখন সেই চক্রব্যূহের মধ্যে পড়িল। নর্ত্তকীগণ পরস্পরের সহিত হস্ত সংবদ্ধ। নৃত্যের ভঙ্গী লঘু, গতি সরল, আবর্ত্তন মৃদু, বিবর্ত্তন ধীর, ভাব গম্ভীর ও বাহ্যিক দর্শন ছবি স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত,—যেন কলের পুতুল বা বায়োস্কোপের ছবি একতালে, একমনে, একভাবে, এক-প্রাণে নাচিয়া যাইতেছে। কোন গোলমাল নাই, বাক্যালাপ নাই, হাবভাবের ছড়াছড়ি নাই, নয়ন-কোণে বিদ্যুৎ-লেখাও নাই। কোন আগন্তুকী নৃত্যে যোগদান করিতে আসিলে, যাহার হাত সে ধরিতে চাহে, সে আসিবামাত্র অতি সুন্দর কুর্ণিশের ভঙ্গীতে উভয়ে উভয়কে অভিবাদন পূর্ব্বক নৃত্য আরম্ভ করিবে। কোন কোন মুহূর্ত্তে ৪০।৫০ জন ঠিক ঐভাবে নৃত্যের বিভিন্ন অংশে যোগদান করে। এই এক প্রকার নৃত্য। সকলেরই একই ধরণে কাপড় পরা, প্রায় সকলেরই মস্তকে একটী করিয়া রূপা বা কাঁসার অদ্ভুত দর্শন চোঙাকৃতি শিরোভূষণ, ও গলায়,সঙ্গতি হিসাবে, কাহারো টাকার, কাহারো আধুলির, কাহারো বা সিকির মালা। আবার কাহারো বা দুই প্রস্থ, যথা টাকা ও আধুলি, বা আধুলি ওসিকি, অথবা টাকা ও সিকির মালা।

দ্বিতীয় প্রকার নাচ এই প্রকারই, তবে তাহাতে প্রতি ২০।২৫ জন নর্ত্তকী বিভিন্ন সঙ্গীতের আলাপনে নিযুক্তা। ইহাদের সঙ্গীত দুর্ব্বোধ্য হইলেও সুমিষ্ট ও শ্রুতি-সুখকর। সকলে ঠিক একই সময় কোন একটী তাল একই সুরে আরম্ভ করে, আবার একই সময়ে তাহা ছাড়িয়া দেয়।

আবার অন্য প্রকার নাচও আছে। কোথাও বা একমাত্র নর্ত্তকী লম্ফ-ঝম্প প্রদান করিয়া নানা ভঙ্গীতে ব্যায়ামোচিত নর্ত্তনে নিযুক্তা। আবার কোথাও বা ৪।৫ জন হইতে আরম্ভ করিয়া ২০।২৫ জন পর্য্যন্ত একসঙ্গে অনুরূপ ভঙ্গীতে, আবার কখনও বা প্রত্যেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে, নৃত্য-পরায়ণা। সঙ্গে কাড়া-নাক্কাড়া সর্ব্বদা তাল যোগাইতেছে ও বোধ হয় উৎসাহ দানেও নিযুক্ত। এসব সাময়িক নৃত্য, এবং বাস্তবিকই তাই,—প্রতি চরণ-ক্ষেপে, প্রতি ভঙ্গীতে, অথবা প্রত্যেক লম্ফে-ঝম্পে বীরত্বের ব্যঞ্জনা বিশেষ ভাবে বিকশিত।

পরবের মোটামুটী একটা বিবরণ এই পর্য্যন্ত। এখন ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে সঠিক কেহ কিছু বলিতে পারিল না। একজন বলিলেন, পূর্ব্বকালে এদেশের এক রাজা এক দিন সদলবলে শিকারে বাহির হন। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও কোনরূপ শিকারের সুবিধা না হওয়ায়—রাজা অতি ম্রিয়মান ও চিন্তিত হইয়া পড়েন। এমন সময় এক বন্য মহিষ দর্শনে সকলে সোৎসাহে তাহার পশ্চাদ্ধাবন

করিলেন। মহিষও দ্রুতবেগে পলায়নপর হইল। ঠিক সন্ধ্যার সময় রাজার অব্যর্থ সন্ধানে মহিষ শরবিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইল। শিকারের সফলতায় মহোল্লাসে সকলে রাজার নিকট হইতে শিকারের প্রসাদ গ্রহণ করিল। বর্ত্তমান বিঁধা পরব সেই শিকার পর্ব্বেরই স্মরণোৎসব। শিকারে সফল-মনোরথ হইয়া পূর্ব্বে যেমন তাহারা পূজাদি প্রদান করিত, এখনও সেইরূপ বর্ত্তমান উৎসব পূজা-প্রাঙ্গণেই হইয়া থাকে।

এ বিবরণ কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। তবে ইহা যে এ প্রদেশের শারদোৎসব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উপরন্তু বোধ হয়, ইহা এ অঞ্চলের রাজপুত রাজগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত রাজপুতানার শারদীয় আহেরিয়া উৎসবেরই অনুরূপ বা পরিবর্ত্তিত সংস্করণ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিংভূম বা সিংহভূম নামের উৎপত্তি—সিংহ রাজগণের নাম হইতে। এ দেশে সামন্তরাজই অধিক, এবং তাঁহারা প্রায়শঃই রাজপুত বংশোদ্ভূত।

সে দিন কাল নাই, সে বীরদর্পও নাই, তাই সে সকল উদ্দীপনাময় অনুষ্ঠানও নাই। তাই এখন পূজা-প্রাঙ্গণে নিরীহ গৃহপালিত অসহায় ভীত-ত্রস্ত মহিষ-শিশুকে দৃঢ় পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া শিকারের অভিনয়ে চারিদিক হইতে খোঁচাইয়া মারা হয়। তৎপরে অন্ততঃ ১০৮টী ও ঊর্দ্ধ সংখ্যা যতগুলি সম্ভব ততগুলি ছাগ-শিশুকে প্রাণহীন করা হয়।

বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটের রাজগণের ন্যায় ধলভূমের রাজগণ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ বর্ত্তমান। কাহারো মতে ইঁহারা আসলে রাজপুত বংশোদ্ভূত; কিন্তু দৈব-বিপাকে ধোপার গৃহে পালিত হওয়ায়, ধল আখ্যা প্রাপ্ত হন (ধল অর্থে ধবল বা ধব বা ধোপা)। আবার কাহারও মতে ইঁহারা রাজপুত বংশোদ্ভূত নহেন। সিংভূম গেজেটীয়ারের গ্রন্থ-কারও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সঠিক অভিমত দিতে পারেন নাই। তবে তিনি ধলভূম রাজগণের প্রথমোক্ত দাবীর কথার প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন।

যে রঙ্কিণী দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়, সেই রঙ্কিণী দেবী সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাক্।

রঙ্কিণী দেবী এ অঞ্চলে সর্ব্ববিদিত ও তিনিই ধলভূম রাজগণের কুলদেবতা—সুতরাং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি আগে ছিলেন এক পাহাড়ের উপর। তথায় না কি বহু নরবলি হইত। এজন্য একজন শ্বেতাঙ্গ ডেপুটী কমিশনার তাঁহাকে বর্ত্তমান স্থানে থানা-প্রাঙ্গণে আনিবার ব্যবস্থা দেন, যাহাতে তাঁহার সম্মুখে আর কেহ নরবলি দিতে না পারে। রঙ্কিণীর প্রস্তরময়ী সিন্দুর-বিভূষিতা অষ্টভুজা মূর্ত্তি। উপরের দুই হস্তে একটী ঐরাবত উত্তোলিত অবস্থায় রক্ষিত,—বোধ হয় তাঁহার অসাধ্য-সাধনের চিহ্ন স্বরূপ।

অতঃপর কালীয়দমন ও কালীয়দহ দেখিয়া আমরা পঞ্চ-পাণ্ডব দর্শনে চলিলাম। ভীষণ জঙ্গল, অদূরে স্বর্ণ-রেখা। লতা-গুল্ম-তৃণহীন একটী পাহাড়ের মাথায় কতক-গুলি মূর্ত্তি খোদিত। প্রবাদ, ইহাই পঞ্চ-পাণ্ডবের মূর্ত্তি। দেখিয়া বিশেষ ভক্তি হইল না। শুনিয়াছিলাম, অশ্ব-পদচিহ্ন, অক্ষ, গদা ইত্যাদিও অঙ্কিত আছে; কিন্তু আমরা তাহা দেখিলাম না। খোদিত রেখাগুলির যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অনুমান, আর ২০।২৫ বৎসরের মধ্যেই হয়ত তাহা একেবারে মুছিয়া যাইবে।

যাহাই হউক, হয়ত ইহা বহুকাল হইতে আছে,—এবং যখন এতবড় একটা প্রবাদ, তখন গোঁড়া হিন্দু হইয়া অবিশ্বাস করি কিরূপে?

ইহাই অজ্ঞাত বাস ও অজ্ঞাত পর্ব্ব, এবং ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই আপনারা এ সকল দেখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

জাগরণ

শ্রীরেবা দেবী

সুতারা যখন মাত্র এক বৎসরের, তখনই সে তার মাকে হারায়। জ্ঞান হয়ে অবধি সে বৃন্দাকেই মা বলে জানে। বৃন্দা ছিল তার মার বাপের বাড়ীর ঝি। ছোট মেয়েটি রেখে সুতারার মা যেদিন চোখ বুজ্‌লেন, সেইদিন থেকে বৃন্দা এই মা-মরা মেয়েটাকে বুকে তুলে নিলে।

সুতারার বাপ একজন অবসর-প্রাপ্ত সিভিলিয়ান। স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের সহিত তাঁর প্রায় সকল সম্বন্ধ শেষ হয়। সুতারা যখন সবে পাঁচ বছরের, তখন ঠিক মত শিক্ষার জন্য তার বাপ তাকে পাঠিয়ে দিলেন একটা মেয়ে বোর্ডিংএ। যাবার সময় সুতারা বৃন্দাকে বলে গেল—"দাই মা, তুমি কেঁদ না, ছুটি হ'লে আবার তোমার কাছে ফিরে আস্‌ব।" বৃন্দার তিন চার দিন একরকম অনাহারেই কাট্‌ল।

বোর্ডিংএর মেয়েরা এই ফুট্‌ফুটে, টুক্‌টুকে ছোট্ট মা-মরা মেয়েটিকে বড় আদরের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে টেনে নিলে। এখানে ছোট বড় সকলের আদরের মধ্যে থেকে সে সদ্য বাড়ী ছাড়ার শোক অনেকটা ভুলে গেল। তার বিশ্বাস ছিল, স্কুলে কেবল পড়া কর্‌তে হয়, আর কোন ত্রুটি হ'লেই বেতের ঘা ছাড়া আর কিছু উপায় নেই। এখানে কিন্তু লেখা-পড়ার চেয়ে সে খেলা কর্‌ত বেশী। এখানে সকলেই তাকে "পুতুল" বলে ডাকত। এম্‌নি ভাবে সুতারা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। সে যাদের সাম্‌নে বেড়ে উঠ্‌ল, তারা কিন্তু তাকে "পুতুল" ছাড়া আর কিছুই ভাব্‌তে পার্‌ত না। সে যখন ষোলয় পা দিল, তখনও সকলে তাকে সেই পাঁচ বছরের খুকীই মনে কর্‌ত।

এক দিন হঠাৎ তার বাপ তাকে স্কুল ছাড়িয়ে নিলেন। দু'দিন পরে স্কুলে খবর এল সুতারার বিয়ে। তাদের সেই কচি মেয়ের বিয়ে? সকলের বিস্ময়ের সীমা রইল না। স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী প্রভা-দি'র কাছে সুতারার নিজের হাতের লেখা একখানা চিঠি এল। সে চিঠি পড়লেই বোঝা যায় যে, লেখিকার সংসার সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান নেই। সে লিখ্‌ছে—এ বিয়েতে সে খুব খুসি, কারণ, বাবা তাকে অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় ও গয়না কিনে দিয়েছেন, বাবার বন্ধুদের কাছ থেকে সে এত ভাল ভাল জিনিস উপহার পেয়েছে যে, তাঁদের না দেখিয়ে সে কিছুতেই সুখী হ'তে পার্‌বে না, ইত্যাদি। প্রভা-দি একবার তাড়াতাড়ি চোখটা মুছে নিলেন। আহা, পুতুল যে নিতান্ত শিশু, সে বিবাহের কি জানে? কাপড় গহনাই যে বিবাহের আসল জিনিস নয়, কে তাকে বোঝাবে? তার মাও নেই যে তাকে বুঝিয়ে দেবে—এই বিবাহটা পুতুল-খেলার মত সরল, সহজ ব্যাপার নয়।

যা' হো'ক, শুভক্ষণে শুভলগ্নে অরুণের সঙ্গে সুতারার শুভ বিবাহ হয়ে গেল। বিয়ের আগের দিন সুতারার বাপ অরুণকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বল্লেন—"অরুণ, তোমার বাপ-মা আমার অনেক দিনের পুরান বন্ধু। আজ তাঁরা ইহলোকে নাই বটে, তবুও স্বর্গ হ'তে তাঁরা এই বিবাহে সুখী হ'বেন। আমার ঐ একমাত্র মাতৃহীন মেয়েটাকে তোমার হাতে দিয়ে এবার আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মর্‌তে পার্‌ব। একটা কথা—সুতারা যদিও ষোলয় পড়েছে, তবুও তার সংসার সম্বন্ধে জ্ঞান খুব কমই,—ও এখনও ঠিক শিশুর মত সরল। তুমি ওকে সাবধানে রেখ।" খুব গর্ব্বের সঙ্গেই অরুণ উত্তর দিয়েছিল—"আমি চোখ খুলেই ওকে নিচ্ছি। আমি জানি, ও ক্ষুদ্র বালিকা মাত্র। ও যতদিন নিজের দায়িত্ব না বুঝ্‌বে, আমি ওর কাছে কোন দিনই কিছুই দাবী কর্‌ব না।"

শুভদিনে সুতারা চ'লে গেল স্বামীর ঘরে,—সঙ্গে গেল বৃন্দা। অরুণ তাকে ছোট মেয়ের মত স্নেহ আদরে ভরিয়ে দিলে। প্রায় প্রতি দিন তাকে নূতন নূতন যায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেত,— অনবরত নানা রকম উপহার দিয়ে তার কচি মুখে হাসি ফোটাতে সে বড় ভালবাস্‌ত। স্বামীর ঘরে এসে সুতারার কোনই পরিবর্ত্তন হ'ল না,—সে ঠিক আগের মতই দাইমার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়্‌ত। অরুণ নিজের ঘরেই থাক্‌ত, কেউ কারু স্বাধীনতায় বাধা

দিত না। এম্‌নি ভাবে বিবাহের প্রথম বৎসরটা একরকম পুতুল খেলেই কেটে গেল।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা কি একটা প্রয়োজনে অরুণ সুতারার ঘরে গেল। তার কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে, ঘরের সাম্‌নের বারাণ্ডায় গিয়ে দেখে, একটা মাদুরের উপর সুতারা ঘুমিয়ে আছে,—চারিদিকে একরাশ বেলফুল ছড়ান, —একটা অসমাপ্ত মালা তার হাতের মধ্যে রয়েছে। অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে অরুণ সাম্‌নের জীবন্ত ছবির দিকে চেয়ে রইল। কে যেন তার কাণে কাণে বল্লে—"একে নিয়ে তুমি কি চিরজীবন পুতুল-খেলা কর্‌বে? এ যে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী! তুমি কি পুরুষ নও?" অরুণ এক পা এগিয়ে আবার দু' পা পিছিয়ে গেল। মনে পড়ে গেল তার প্রতিজ্ঞা।

এর পর থেকে অরুণ আস্তে আস্তে সুতারার কাছ থেকে সরে যেতে লাগ্‌ল। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রাখ্‌তে সাহস হ'ত না। নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস নেই,—কে জানে, যদি কোন দিন এমন কিছু করে বসে, যা'র জন্যে চিরদিন তাকে অনুশোচনা ভোগ কর্‌তে হয়। সুতারার ভাল বন্দোবস্তই করে দিলে—তার বাহিরের অভাব কিছু রইল না। কিন্তু অরুণ আর তার সঙ্গে ছেলে-খেলা কর্‌তে নারাজ।

সুতারা কিন্তু এর কিছুই বুঝ্‌লে না,—কেবল তার মনে হ'ল, অরুণ আর পূর্ব্বের মত নেই,—তাকে তো আর বেড়াতে নিয়ে যায় না, পুরাতন সোফেয়ারের সঙ্গে সে তো আজ-কাল একাই বেড়াতে যায়। আগের মত ভাল ভাল ইংরেজি বইও তো আর অরুণ তাকে প'ড়ে শোনায় না। কথা কইতে গেলেই কায আছে বলে উঠে যায়। এ সবের মানে কি? অরুণ কি কোন কারণে তার উপর বিরক্ত হয়েছে? হঠাৎ মনে পড়্‌ল—অরুণ তাকে কাঁচা তেঁতুল খেতে মানা করেছিল, সে তো তার কথা শোনে নি,—তাই বুঝি সে রাগ করেছে?

এক দিন সুতারা আর থাক্‌তে না পেরে, সোজা অরুণের কাছে গেল। অরুণ তখন একটা খবরের কাগজ খুলে বসে ছিল। সুতারাকে আসতে দেখে, চোখ না তুলেই বল্লে—"কি চাও?" অরুণের গম্ভীর স্বর শুনে সুতারার ভয় হ'ল, সে ধীরে ধীরে বল্লে—"তোমার কথার অবাধ্য আর কখনও হব না,—আমি আর কোন দিনও কাঁচা তেঁতুল খাব না,—তুমি আমার উপর রাগ করো না।" অরুণ অনেকক্ষণ কিছুই বল্লে না। পরে কেবল বল্লে—"আমি তোমার উপর রাগ করিনি,—আজ আমার অনেক কায আছে,—তুমি এখন উপরে যাও।" সুতারা এক গাল হেসে বল্লে—"তা হ'লে কা'ল তুমি আমায় সিনিমা দেখ্‌তে নিয়ে যাবে?" "যাব।"

এ রকম করে কিন্তু আর কত দিন চলে,—রোজ রোজ তো অরুণকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাওয়া যায় না? সব কাজে অরুণের সঙ্গ পাবার আশা সুতারা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে। আর সে অরুণের কাছে কোথাও যাবার জন্যে আব্দার ক'রে না। তার এত দিনে যতটুকু জ্ঞান হয়েছিল, তাতে সে বুঝেছিল যে, যে-কোন কারণেই হোক, অরুণ তার সঙ্গে বেশী সম্পর্ক রাখ্‌তে চায় না। সেও তাই জেনে নিলে।

ক্রমে অরুণের বেশীর ভাগ সময় কাট্‌তে লাগ্‌ল বাইরে। রাত্রে শোয়া ভিন্ন বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক একরকম শেষ। বাইরের লোক তার মধ্যে বেশী কিছু পরিবর্ত্তন দেখ্‌লে না। পূর্ব্বেরই মত সে হাস্‌ত, কায কর্‌ত। কেবল তার বিশেষ বন্ধুরা তার হাসির মধ্যে একটা বিষাদের ছায়া দেখ্‌তে পেত,— যেন একটা গোপন ব্যথা সে হাসি দিয়ে লুকোতে চায়। এই ভাবে আরও এক বৎসর কেটে গেল।

যদিও সকলে সুতারাকে বালিকার মতই দেখ্‌ত, কিন্তু সত্যি তার বয়স বাড়্‌ছিল বৈ কম্‌ছিল না। এখন সে ১৮ বৎসরের যুবতী। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞান-বুদ্ধি ধীরে ধীরে পরিপক্ক হ'ল। সে এত দিনে নিজেকে বেশ করে পরীক্ষা করে দেখে বুঝ্‌লে যে, তার কোথায় কি একটা অভাব আছে। তার খাওয়া-পরার কোনই কষ্ট নেই,—যখন ইচ্ছা সে বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যায়,— তার নিজের জন্যে আলাদা একটা মোটর আছে—সে যেখানে ইচ্ছে যায়, কেউ বাধা দেয় না। তবুও তার জীবন কেন এত শূন্য?

বিয়ের প্রথম বৎসর সে বড় একটা কারু সঙ্গে মেশেনি। অরুণকে পেলেই সে সুখী হ'ত,—তাই তার বন্ধুর সংখ্যা খুবই কম। আজ কাল কিন্তু সে নিতান্তই একা হয়ে পড়েছে। অরুণ আর তার কাছে আসে না,—বৃন্দা ভিন্ন

আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় না। এইরূপ সঙ্গী-হীন জীবন তার কাছে বড়ই কষ্টকর হ'ল।

অনেক সময় ঐ সামনের বাড়ীর মেয়েটির সঙ্গে ভাব কর্‌তে তার ইচ্ছা হয়, কিন্তু হ'য়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে ও-বাড়ীর মেয়েটি তার ছোট্ট ফুলের মত শিশুটিকে কোলে ক'রে জান্‌লায় দাঁড়ায়,—মায়ে-ছেলেতে কত কথাই না কয়! সুতারার ইচ্ছা হয়, তাকে একবার প্রাণ ভ'রে আদর করে। তার খেল্‌বার মোমের পুতুলগুলি এই সদ্য-প্রস্ফুটিত মাতৃ-হৃদয়টিকে সান্ত্বনা দিতে অক্ষম।

তার বড় রাগ হয়—কেন তাকে সকলে বালিকার মত দেখে? এমন কি, তার স্বামীও তাকে দুগ্ধ-পোষ্য শিশু মনে করে,—কিন্তু সে যে এখন স্বপ্নোত্থিত নারী। আগে যে-সবে সে আনন্দ পেত, এখন যে তার মধ্যে সে কিছুই পায় না।

এক দিন হঠাৎ তার চোখ পড়্‌ল—তার খেল্‌না দিয়ে-সাজান ছোট্ট কাচের আলমারীর উপর। বিরক্তিতে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। একটানে সব চুরমার করে ভেঙ্গে ফেলে, সে বালিসে মুখ গুঁজে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। বৃন্দা মনে কর্‌লে, সাধের খেল্‌নাগুলো ভেঙ্গে গিয়েছে, তাই না তার "তারা" এত কাঁদ্‌ছে?—সে তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে, জামাই বাবুকে ব'লে তার জন্যে এক বাক্স নূতন খেল্‌না আনিয়ে দেব,—এর জন্যে কি সারা রাত না খেয়ে কাটাতে হয়? বেচারা বৃন্দা "তারার" যে কোথায় ব্যথা, সেটা বুঝ্‌ল না।

দিন তার কাট্‌তে চায় না। সংসারের কাযে তাকে একেবারে হাত দিতে হয় না,—ঝি-চাকরের অভাব নেই। সে যখুনি যা চায়, তখুনি তা পায়,—কেবল মুখ থেকে কথা খসালেই হ'ল। এমন ভাবেই কি চিরজীবন কাটাতে হ'বে? উপায় না দেখে সে লেখাপড়ায় মন দিলে। যেখানে যে বই সে পে'ত, তাই প'ড়ে ফেল্‌ত। এক দিন রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীখানা তার হাতে এল। এর পর সে রবিবাবুর সব বই একে একে পড়্‌তে সুরু কর্‌লে। মনে হ'ল, কি একটা হারান জিনিস সে আজ এই কবিতাগুলোর মধ্যে খুঁজে পেলে। কবি যেন তার অন্তরের কথাগুলি এনে সারি সারি বসিয়ে গিয়েছেন।

এদিকে অরুণ তার নিজের চিন্তায় মগ্ন,—কখন যে তার বালিকা বধূ প্রাণে যৌবনের সাড়া পেলে, সে তার কিছুই খোঁজ পেলে না।

ফাল্গুনের সন্ধ্যা। সুতারা অন্যমনস্ক ভাবে রবিবাবুর একটা গানের বইয়ের পাতা ওল্‌টাচ্ছিল,—হঠাৎ চোখ পড়্‌ল—"মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখি জাগো, মেলি রাগ-অলস আঁখি, সখি জাগো। আজি চঞ্চল এ নিশীথে, জাগো ফাল্গুন গুণ গীতে, অয়ি প্রথম-প্রণয়-ভীতে, মম নন্দন-অটবীতে পিক মুহু মুহু উঠে ডাকি, সখি জাগো!"

নীচে একটা মোটর থাম্‌বার আওয়াজ হ'ল। অরুণ এইমাত্র বাড়ী এসে আবার কোথা বেরিয়ে গেল। কি একটা আকর্ষণীশক্তি তাকে টেনে নিয়ে গেল অরুণের ঘরে। পড়্‌বার ঘর ছেড়ে সে তার শোবার ঘরে ঢুক্‌ল। স্তব্ধ হয়ে সে এই ঘরের সব জিনিস দেখ্‌তে লাগ্‌ল। মনে হ'ল এখান-কার সবই যেন তাকে নীরব ভাষায় ভৎর্সনা কর্‌ছে। তার সর্ব্ব শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

খাটের পাশের টেবিলের উপর ছিল একখানি বই ও একটি হাস্যময়ী নারীর ছবি। কম্পিত হস্তে ছবিখানি তুলে নিয়ে দেখ্‌লে তার নীচে লেখা আছে—"মা আমার—১৯০১।" ছবিখানি ভিজে গেল সুতারার চোখের জলে। কোন রকমে বেরিয়ে এসে সে অরুণের বস্‌বার ঘরে এক-খানা চৌকির উপর বসে পড়্‌ল। কতক্ষণ যে সে এমন ভাবে বসে ছিল, বলা যায় না; তবে হঠাৎ চারিদিকে আলো জ্বলে উঠাতে, সে চম্‌কে চেয়ে দেখে যে, সাম্‌নে অরুণ তারই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুহূর্ত্তের জন্যে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে সে বল্লে—"রাত্রে পড়বার জন্যে একটা বই নিতে এসেছি।" অরুণ অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলে—"এখানে তোমার পড়্‌বার মত বই নেই, কাল আনিয়ে দেব।"

পরদিন সুতারার জন্য অরুণ এক বাক্স বই পাঠিয়ে দিলে। সে আনন্দের সঙ্গে বাক্স খুলে দেখে, একের পর এক বই বেরুচ্ছে—ছেলেদের রামায়ণ, বেহুলা, রবিন্‌সন ক্রুশো, রত্নদীপ, ভূতের জাহাজ—" সুতারা হাস্‌তে গিয়ে কে জানে কেন কেঁদে ফেল্লে।

অরুণ আর সুতারার মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল, বৃন্দার তা মোটে ভাল লাগ্‌ত না। এক দিন থাক্‌তে না পেরে, বিরক্ত হয়ে সে বল্লে—"আচ্ছা তারা, তুমি কি বাছা দিন দিন কচি খুকি হচ্চ? দেখ্‌ছ না, জামাই বাবু যে মোটে বাড়ী থাকেন না! তা তারই বা কি দোষ! পুরুষ মানুষ এমন করে কত দিন থাক্‌বে? তোমার তো কোন হুঁস্ নেই,—তাকে ঘরবাসী কর্‌বারও চেষ্টা কর না। বাবুকে তখুনি বল্লাম, ও সব ইস্কুলে-মিস্কুলে পাঠিও না,—মেয়ে যেন একেবারে ধিঙ্গি হয়ে পড়েছে। কেন রে বাবু—জামাইবাবুকে কি মনে ধরে না? অনেক ভাগ্যির জোরে অমন বর পেয়েছ,—একেও যদি তোমার পছন্দ না হয় তবে তোমার জন্যে ফর্‌মাস দিয়ে গোড়্‌তে হ'বে। কি জানি বাপু বড়লোকের কি কাণ্ড।" সুতারা করুণ কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—"দাই মা, তুমিও আমায় বক্‌ছ?" তার সেই স্বর বৃদ্ধার মরমে গিয়ে বিঁধ্‌ল। ধরা-গলায় সে বল্লে—"মাণিক আমার, তোমাকে কি বক্‌তে পারি? তবে যখন দেখি—জামাইবাবু একদণ্ড বাড়ী থাকেন না, আর তুমিও তাকে কিছু বল না—তখন সত্যি রাগ ধরে।" বৃন্দা বুঝ্‌লে যে, তার তারার কচি প্রাণে একটা গভীর আঘাত লেগেছে,—কিন্তু সেটা যে কিসের ব্যথা, তা বৃন্দা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লে না। খানিক চুপ করে থেকে সুতারা বল্লে—"আচ্ছা দাই মা, মা কেন আমায় অত ছোট রেখে চলে গেলেন?" বৃদ্ধার চোখের জল বাঁধ মান্‌লে না। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে—"কেন রে তারা, আমি কি তোকে মার থেকে কিছু কম ভালবাসি?" "না, না তা' নয়; তবে মা থাক্‌লে অনেক বিষয় জান্‌তে পার্‌তাম, গোড়াতেই এমন ভুল হ'ত না। যাক্, কি হ'বে, চল শুতে যাই।" বৃন্দা চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বল্লে—"তারা, আমি না হয় জামাই বাবুকে তোর কাছে একবার ডেকে দিই,—তুই বুঝিয়ে বল্, সে নিশ্চয় তোর কথা শুন্‌বে।" সুতারা তাড়াতাড়ি বল্লে—"না দাইমা তুমি জামাই বাবুকে একটিও কথা বোল না,—যদি বল তো আমার মরা মুখ দেখ্‌বে।" "ষাট্ ষাট্, এমন দিব্যিও গাল্‌তে হয়! কি জানি বাছা—তুমি কি অমঙ্গল টেনে আনো।"

এক দিন অরুণের বেয়ারা এসে সুতারার হাতে এক টুক্‌রো কাগজ দিলে; তাতে লেখা ছিল—"তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ দরকার আছে; কখন সুবিধা হ'বে জানিও—অরুণ।" এর উত্তরে সে লিখে দিলে—"তোমার যখন সময় হয় এস।" সকালটা কেটে গিয়ে যখন সন্ধ্যা নাম্‌ল, তখনও অরুণের দেখা নেই। শুতে যাবার একটু আগে অরুণ এসে বল্লে—"আমার এক মামাত বোন অনেক দিন পরে কল্‌কাতায় আস্‌ছে,—তাকে কিছু দিন এখানে রাখ্‌তে চাই। তাতে তোমার কিছু অসুবিধা হবে কি?" কথার উত্তর দিতে গিয়ে সুতারার গলাটা কেঁপে গেল, চোখে জল এল। পর মুহূর্ত্তে একটু হেসে বালিকারই উপযুক্ত ভঙ্গীতে বল্লে—"সে বুঝি আমাকে পড়াতে আস্‌বে? আমি কিন্তু আর পড়ব না।" "তোমাকে পড়াবার মত তার বিদ্যে নেই।" "সে আমাকে এসে বোক্‌বে না তো? আমি বাপু রাঁধ্‌তে টাঁধ্‌তে জানি না।" শুষ্ক হাসি হেসে অরুণ বল্লে—"না।" "তবে তাকে আস্‌তে বল।" "আর একটা কথা—আমার এ ক'দিন উপরে শোওয়া উচিত—" বাধা দিয়ে সুতারা বল্লে—"ও বুঝেছি, তোমার ভগ্নী-পতিকে নীচের ঘরটা ছেড়ে দিতে চাও? তা এ খাটটা তো বেশ বড়—তিন জনকে বেশ ধরে যাবে।" "দাইমাকে নীচে শুতে হ'বে।" "ও বাবা, দাইমার কাছে না শুলে আমার ঘুমই হবে না। তার চেয়ে একটা কাজ কর—আমাকে কিছু দিনের জন্যে বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও। তোমার বোনকে বোল আমার শরীর ভাল নেই। সত্যি আমার গা হাত পা কেমন ব্যথা কর্‌ছে—বোধ হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'বে।"—"তোমাকে বাবার ওখানেই পাঠিয়ে দেব।" বলে অরুণ ধীরে ধীরে নেমে গেল।

প্রায় ছয় মাস হ'ল সুতারা বাপের বাড়ী এসেছে। তার বাবা নিজের বই নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন; সুতারার চেহারা যে দিন দিন ম্লান হয়ে যাচ্ছে, তা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। বৃন্দার কথায় যখন চমক্ ভাঙ্গ্‌ল, তখন তিনি কাউকে কিছু না বলে, অরুণকে আস্‌বার জন্যে একখানা চিঠি দিলেন।

সন্ধ্যাবেলা চোখের উপর হাত রেখে সুতারা শুয়ে ছিল। হঠাৎ কার স্পর্শ অনুভব করে চেয়ে দেখে, অরুণ তার খাটের উপর বসে আছে। তার শাদা মুখ যেন আরও শাদা হয়ে গেল। কিছু না ভেবেই বলে উঠল—"তুমি কেন এখানে এসেছ?" "কেন, এখানে কি আমার আস্‌তে নেই?"

"না—না, তা' নয়,—বাবা বুঝি তোমায় লিখেছেন,—আমার অসুখ করেছে? ও কিছু নয়,—ব্যস্ত হবার কিছু নেই,—তুমি বাড়ী যাও।"

"তুমি তো বল্‌ছ, ব্যস্ত হবার কিছু নেই,—কিন্তু আমার চোখ বল্‌ছে, ব্যস্ত হবার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ, তুমি কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছ! তার পর তোমার চোখের কোলে কোন দিন ত অত কালি ছিল না।"—"ও সব কিছু নয়।" "আমার কিন্তু তা বিশ্বাস হয় না।"—"তুমি কেন বৃথা সময় নষ্ট কর্‌ছ; আমি বল্‌ছি, আমার কিছু হয় নি,—তুমি বাড়ী যাও।"

"এমন ভাবে আমায় তাড়িয়ে দেবার মানে কি?"

সুতারা কোন উত্তর দিলে না। অরুণ সহসা বুঝ্‌লে, তার বালিকা পত্নী ঠিক আগের মত আর নেই,—কোথায় একটা কি বদল হয়েছে। মনে হ'ল, কিসের একটা দুঃখ সে চেপে রাখ্‌তে চায়। অরুণের ধারণা—সেই তার জীবনে দুঃখ এনেছে, কোন কারণে হয় ত সে তাকে সুখী কর্‌তে পারে নি। ধীরে ধীরে কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিতে গিয়ে সুতারার চোখের উপর হাত পড়্‌ল। চম্‌কে উঠে অরুণ বল্লে—"এ কি তারা, কাঁদ্‌ছ? আমি যে এত দিন আমার সব কষ্ট তোমার ঐ হাসিমুখ দেখে ভুলে ছিলাম। তোমার চোখের জল যে আমার কিছুতেই সহ্য হয় না। জানি, তোমাকে তখন বিয়ে করাটা অন্যায় হয়েছিল,—তুমি যে তখন সংসারের কিছুই বুঝ্‌তে না। তোমায় দেখেই আমার মনে বড় সাধ হয়েছিল—তোমার ঐ সুন্দর আধ-ফোটা হৃদয়খানি আমি ভালবাসা দিয়ে ফোটাব। বড় ইচ্ছা হয়েছিল—তোমার ঐ সাধের ঘুমটাকে চুম্বন দিয়ে ভাঙ্গাব। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সে ক্ষমতা ভগবান আমায় দেন নি। যে সোণার কাঠী দিয়ে তোমায় জাগাব ভেবেছিলাম, সে কাঠীর সন্ধান আর এ জীবনে পেলাম না। এখন এই পাক-চক্রের মধ্যে থেকে তোমাকে কেমন ক'রে বাঁচাব তাই ভাব্‌ছি।"

একটা ছোট হাত অরুণের হাতের উপর রেখে সুতারা বল্লে—"তুমি ভারী বোকা, কিছুই বোঝ না।" অধীর হয়ে অরুণ বল্লে—"স্পষ্ট করে বলতারা, আমি সত্যি কিছু বুঝ্‌তে পারছি না।"

"আমি ছোট বেলাতেই মাকে হারিয়েছিলাম বলে, সকলেই আমায় একটু অতিরিক্ত আদর দিত। ভালবাসায় অন্ধ হয়ে কিন্তু কেউ দেখ্‌লে না যে, আমি চিরকালই খুকী থাক্‌তে পারি না। এমন কি, তুমিও আমায় ক্ষুদ্র শিশুর মত দেখ্‌তে,—কখনও স্ত্রী বলে ভাবনি। প্রথম যৌবনে এই বাইরের চাপে আমি সত্যি ভাব্‌তুম—আমি আর সেই ছোট্টটি আছি। কিন্তু আমার অজ্ঞাতসারেই আমার সুপ্ত নারীত্ব জেগে উঠ্‌ল। তখন দেখি, তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছ। এক একবার ভাব্‌তুম, সব মান-অপমান ভাসিয়ে দিয়ে, নিজেই গিয়ে ধরা দিই। কিন্তু কোথা থেকে একটা গভীর অপমান এসে আমায় ঘিরে ফেলত। ঠিক করেছিলাম যে, যে আমায় চিন্‌তে না পারে, তাকে নিজে থেকে চেনাব না। তার পর অভিনয়ের পালা সুরু হ'ল। তুমি আমাকে যেমন ছোট মেয়ে মনে কর্‌তে, আমি সেই রকমই নিজেকে গড়ে তুল্‌ছিলাম। শেষে দেখলুম, বাস্তব নিয়ে এমন খেলা চলে না,—তাই সব ছেড়ে দিয়ে এখানে পালিয়ে এলাম—

সুতারার কথা আর শেষ হ'ল না,—সে তখন অরুণের দুই বাহুর মধ্যে আবদ্ধ।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯

আজিজ হাসি-মুখে উপস্থিত হয়ে—মানবের চোখমুখ দেখেই বলে উঠলো—"কেয়া দোস্ত্—তোমারা ক্যা হুয়া!" পরে গরুটির ওপর দৃষ্টি পড়ায়—"ইয়ে ক্যা হায়, শিং কোন্ তোড়া, মর্ গিয়া!"

এই সময় গরুটা আর একবার ওঠবার চেষ্টা করায়, সে বলে উঠলো—"সুকুর খোদা (ভগবানকে ধন্যবাদ) জিতা হায়।" মানব বললে—"হাঁ দোস্ত্ জিতা হায়, কিন্তু বড় কষ্ট পাতা হায়, উঠতে চাতা—উঠতে পারনে সেক্তা নেই। আমার বড় জোর্-বোখার হয়েছে ভাই, তাকত্ নেই যে খাড়া করকে দি। তাই বোসকে বোসকে ভাবতা থা, কালীমা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়া, একবার হাত লাগাও দোস্ত্। কিন্তু ছোড়কে মত্ দিও; কি জানি দাঁড়ানে

পারেগা কি না, বড় সাংঘাতিক চোট্ খেয়েছে ভেইয়া। বোলতে তো পারতা নেই"—বলতে বলতে মানবের গলা আবার ধরে এলো। সে মাথা নীচু করে গরুটির চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলো; লুকিয়ে নিজের চোখও মুছে ফেললে! সেটা আজিজের চোখ্ এড়ালো না।

আজিজ ঠাউরেছিল—মানব বোধ হয় কোন কারণে রাগের মাথায় হঠাৎ মেরে থাক্‌বে! এখন তার আর সে সন্দেহ রইল না; সে দ্রুত মানবের পাশে বসে পড়ে, তার পিঠে হাত দিয়েই চম্‌কে গেল! আজিজের মুখের গোলাপী আভা ফস্ করে ফ্যাঁকাসে হয়ে গেল; সে স্নেহমধুর আগ্রহে বললে—"চলো দোস্ত্ তুমকো পহলে ঘর্ পৌঁহাদে;—ইয়ে কাম্ হামারে উপর ছোড়ো।" মানব বললে—"আমি আচ্ছা আছি ভাই, তুমি ইস্‌কো ধীরে ধীরে একবার খাড়া কোর্‌কে দাও—আমি দেখি।"

আজিজ আর দ্বিরুক্তি না করে—ঝোলা ফেলে, আস্তিন গুটিয়ে, গরুটিকে কায়দা করে ধরতেই, মানব তার গলা তুলে ধরলে। আজিজ নিমেষ মধ্যে তাকে বেড়াল ছানাটির মত তুলতেই, মানব ব্যস্তভাবে বলে উঠলো,—"পাক্‌ড়ে থাক্‌না ভাই।" আজিজের মুখে একটু হাসি এলো, সে বললে—"ডরো মত্ ভাই, হাম্ ছোড়েঙ্গে নেই।"

দাঁড় করিয়ে দিতেই গরুটি একটা কাতরধ্বনি করলে, সঙ্গে সঙ্গে তার নাক দিয়ে আধপোর বেশী রক্ত সর্‌সর্ করে বেরিয়ে গেল। "সব মিথ্যে হ'ল, সাত্ত্বিক গোহন্তা অ্যাকেবারে মেরে ফেলেছে রে,—তুই দেখিস লোকেন, যে অজ্ঞান অসহায়কে এমন করে মারে, তার কখ্‌খনো ভাল হবে না!" আজিজ শুন্‌লে—বোধ হয় বুঝ্‌লে; সব চেয়ে বেশী বুঝ্‌লে তার দোস্ত্‌কে লোকটা কি বেদনা দিয়েছে; কিন্তু কথা কইলে না,—সেই ৩।৪ মোন জীবটিকে এক ভাবেই ধরে রইল। গরুটি কেবলই নিজের ভারটা চারটি পায়ে চারিয়ে দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা পাচ্ছিল। ওই রক্তটাই প্রাণপথ রোধ করে' তার যাতনার কারণ হয়েছিল। সেটা নিঃশেষে বেরিয়ে যেতেই সে ফোঁশ্ করে একটা জমাট্ নিশ্বেস ফেলে চার পায়ে ভর দিতে পারলে।

শিশু যখন প্রথম হাঁটবার আগ্রহ দেখায়, মা যেমন আনন্দ-গভীর অন্তরে—হাসিভরা চোখে, হাঁত ধরে ধরে তাকে অজানা জীবন-পথে যাত্রার প্রথম পা-ফেলাটি শেখান, আজিজও আজ গরুটিকে সেই ভাবে মিনিট দশেক মক্স করিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে। মানব বলতেই আমি তাড়াতাড়ি জল এনে গরুটাকে খাওয়ালুম। কি তেষ্টাই তার পেয়েছিল! সোঁ সোঁ করে তিন হাঁড়ি জল খেয়ে ফেললে। তার পর সে মাথা তুলে একবার আজিজকে, একবার আমাকে দেখে নিয়ে—চঞ্চল ভাবে ডান দিকে ফিরেই তখুনি বাঁ দিকে গ্রীবা বক্র করে স্থির হ'ল। মানব আর দাঁড়াতে পারছিল না, বেড়ায় ঠেশ দিয়ে বসে পড়েছিল! তাকে দেখতে পেয়েই গরুটা দু'পা ঘুরে তার দিকে এক দৃষ্টিতে অপলকনেত্রে চেয়ে রইল; তার চোখ দুটো আবার জলে ভরে উঠলো! মানব তাড়াতাড়ি উঠে এসে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। এই ভাবে দু'চার মিনিট কাটবার পর, মানব তাকে বললে—"যাও মা—এইবার বাড়ী যাও।" শুনেই সে ধীরে ধীরে পা ফেলতে ফেলতে গিয়ে অক্ষয় গুরুমশার পাঠশালায় আশ্রয় নিলে।

ব্যাপারটা দেখে আজিজ বলে উঠলো—"বাঃ খোদা! তুহি সবকুছ।" আমি অবাক হয়ে গেলুম। ঘটনাটা ভুলতে পারিনি। বহুদিন পরে কাশীতে একজন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি জিজ্ঞাসা করেন—"বেদান্ত পড়া হয়েছে?" আমি বলেছিলুম—"আজ্ঞে না পড়া হয় নি,—দেখা হয়েছে।"

মানব বললে—"লোকেন, ওকে আজ ফ্যান এনে খাওয়াস,—তাতে একটু নুন দিস ভাই; আমি আজ আর কিছু পারছি না। আর একটা কাজ করিস,—আমি পারলুম না, তোকেই করতে হবে ভাই। ঐ সাত্ত্বিক-খেগো খোক্কোসের লাউডগাগুলো একটাও যেন ওর সাত্ত্বিক গর্ভে না যায়,—সবগুলি কেটে গরুকে খাওয়াবি। আহা—মুখে মাত্র করেছিল,—পাষণ্ড খেতেও দেয়নি—ঐ পড়ে রয়েছে ছাখনা! আজ রাতেই খাওয়াতে হবে,—জড়টা আর মারিস নি। কেমন—পারবি তো?"

আমি একটা "কাজের-মত'-কাজ" পেয়ে খুব উৎসাহে ঘাড় নেড়ে একটা জোর্ "হুঁ" দিলুম। তার তরে তো বড় কাজ পাবার জো ছিল না—বেলদার হয়েই থাকতে

হত'। এতে এমন বুঝবেন না যে সেটা সে বাহাদুরী নেবার জন্যে কোরত; আমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলার জন্যেই কোরত',—আমার গায়ে না আঁচ লাগে। তেমন ভাল আর কে বাসবে,—সে ভালবাসা আর কারুর কাছে পাইনি!

আজিজ বাংলা কথা বুঝতে শিখেছিল; এতক্ষণ পরে বলে উঠলো—"আব্ কহোতো দোস্ত্ ইয়ে কোন্ কসাইকে কাম হায়?" মানব তাড়াতাড়ি বললে—"উস্‌কো তুমি নেহি জান্‌তা,—যানে দেও ভাই।" কিন্তু আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—"জান্‌তা বই কি, ঐ যে হরিসভামে সবসে বেশী কুদ্‌তা আর কাঁদতা!" আমি তখন লক্ষ্য করিনি যে এতক্ষণে আজিজের আফ্‌গান রক্ত চোখে মুখে ছুটে এসেছে; মানব সেটা লক্ষ্য করে তাকে থামাবার তরেই বলেছিল—"তুমি তাকে নেহি জানতা,—যানে দেও ভাই।" আজিজ আমার দিকে চেয়ে বললে—"ওহি সিদেষাঁড় ভুট্টাজি (সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচায্যি)? কাফর্, বেদরদ্ সয়তান, হামারা দোস্ত্‌কা দিল্ এতনা দুখায়া কে আঁশু (অশ্রু) দেখনে পড়া! উস্‌কো হাম্ জান্‌সে মার দেগা—আজ-ই!"

সন্ধ্যার ঠিক্ পূর্ব্বক্ষণেই মেঘটা সরে গিয়ে, একটু চাঁপা রংয়ের আলো দেখা দিছলো। আজিজের দিকে চেয়ে দেখি—

সর্ব্বনাশ! আমার বুক্ কেঁপে গেল! মানব আমার দিকে তিরস্কারপূর্ণ চোখে চেয়েই, ধীর পদে এগিয়ে—আজিজের হাত দুটি ধরে' তার বুকে মাথাটি রাখলে। মুহূর্ত্তেই আজিজের বুকটা স্ফীত হয়ে একটা তপ্ত শ্বাস বেরিয়ে গেল; তার তুলিদে-আঁকা চোখ দুটি নত হয়ে মানবের কাতর মুখটির ওপর স্থির হ'ল,—সে মানবের পিঠে সস্নেহে হাত বুলুতে লাগলো। মানব নিজের আবেদনপূর্ণ চোখ দুটি আজিজের চোখের উপর রেখে বললে—"ভাই, আমার দোস্ত্ কি কভি না-মরদ হতে সেক্তা, সে শিয়াল নেহি মারতা—শের্ (বাঘ) মারতা! সরম্ মত্ নিয়ো দোস্ত্ ওকে মাপ করো।" আজিজ আধমিনিট্‌টাক তাকে বুকে চেপে থেকে শেষ বলে উঠলো—"তুম হামারা সচ্চা বাহাদুর হায়,—আচ্ছা দোস্ত্,—আব্ চলো ঘর্ পৌছাদে।"

দোরগোড়ায় পৌছে মানব আজিজকে সেলাম করে, বালকের মত সরল কণ্ঠে বললে—"ফের্ কব্ আসবে?" আজিজ বললে—"সোচো মত্—হাম্ রোজ আওয়েগা দোস্ত্।" মানব তখন আমার দিকে ফিরে—"দাঁড়াতে পাচ্ছি না রে—সকালে আসিস ভাই," বলতে বলতে ভেতরে চলে গেল। আজিজ আর আমি তখনো সেইখানেই আছি, দেখি মানব ফিরে আসছে। আজিজ বলে উঠলো—"কেয়া দোস্ত—কোই বাত হায়?" মানব কেবল—"ভুল গিয়াথা" বলে, হাসিভরা চোখে আজিজকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে'ই জলভরা চোখে দ্রুত বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল! আজিজের মুখ থেকে রংটা সহসা সরে গেল, ঠোঁট দু'খানা ফাঁক হয়ে গেল, সচিন্ত-স্বরে তার মুখ থেকে বেরুলো "ইয়ে ক্যা"! আমি কথা কইতে পারলুম না। আজিজ যেন কেমন হয়ে গেল!

সে আমার হাত ধরে খানিকটে নিয়ে গিয়ে একটা পোলের ওপর বসিয়ে নিজেও বসলো; তার পর সেদিনকার সারাদিনের সব ঘটনা শুনতে চাইলে। আমি এক এক করে সব বলে গেলুম,—জ্বর গায়ে এক ঢিলে জলের মধ্যে ৭।৮ সের মাছ মারা,—সঙ্গে সঙ্গেই ডুব,—ঠিক্ই এক প্রকাণ্ড কেউটের সামনাসামনি,—সাক্ষাৎ-মৃত্যু সেই ভীষণ ক্রোধোন্মত্ত ক্রুর বিষধরকে নিমেষে মুঠোর মধ্যে ধরা, আর তাকে শেষ করে ফেলে দেওয়া; ভিজে কাপড়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় চলতে চলতে লাঠির শব্দ আর কাতরধ্বনি শুনে তীরবেগে ছুটে—গরুর শুশ্রূষা,—তার পর আজিজ নিজেই সব দেখেছিল।

আজিজ গর্ব্বোৎফুল্ল ভাবে বলে উঠলো—"হামারা দোস্ত্ পুরা "আলি" হায়,—তোমারা বাংলাকে শের্ হায়!" পরক্ষণেই তার ভাবান্তর দেখ্‌লুম; চিন্তিত ভাবে বললে—"বোথারকে উপর বহুত্ ধাক্কা লগা,—খুন্ শিরমে পৌছ গিয়া হোগা;—বোথার বিগড়্ যা সক্তা; আচ্ছা হাকিম্ বোলানে কহো। রূপেয়া কোই চিজ্ নেহি—হাম্ দেগা;—সম্‌ঝা বাহাদুর!" (আজিজ্ আমাকে বাহাদুর বোলতো।) এই বলে ছটা বেদানা আর একপোটি আঙ্গুর আমার হাতে দিয়ে বললে—"দোস্ত্‌কে ওয়াস্তে হায়,—দে-কে ঘর্ জানা। কহনা—হাম্ রোজ্ আয়গা।" আজিজ্ চলে গেল।

৩০

আমি মানবদের বাড়ী বেদানা আর আঙ্গুর দিয়ে ফিরলুম;—তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। মানবের হুকুম মনে পোড়ল,'—বাড়ী যাওয়া হল না। সোজা গিয়ে সিধু ভট্টচায্যির শজনে গাছে উঠলুম। ছুরি ট্যাঁকেই থাকতো, বার করে হাতে নিতেই—দোর খোলার শব্দ পেলুম। এক হাতে লাঠান, এক হাতে একটা হাঁড়ি নিয়ে—এদিক-ওদিক দেখে, গামছা-পরা সিধু ভট্টচায্যি বেরুলো। ভাবলুম—দেখতে পেলে না কি; লাউপাতার আড়ালে স্থির হয়ে রইলুম। দেখি—বকের মত' পা-ফেলে এসে, যেখানে গরুটা শুয়ে পড়েছিল—সেইখানে লাঠান্ নিয়ে—দু-পা ফাঁক করে—কখনো বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়ে,—একাগ্র দৃষ্টিতে কি দেখতে লাগলো। পরে লাঠান আর হাঁড়ি রেখে—আঁজ্‌লা আঁজ্‌লা মাটী তার ওপর চাপা দিতে লাগলো। বুঝলুম—গোরক্ত গোপন করা হচ্চে। তার পর পবিত্র ব্রাহ্মণের মশলা-গোলা হাঁড়ি নিয়ে, তার ওপর ছড়া দিয়ে, চোরের মত' চট্ গিয়ে দোরে খিল দিলে। হিন্দুধর্ম্ম রসেলেন কি কাঁদলেন বলতে পারি না।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চেপে—সাত্ত্বিক লাউ-ডগাগুলি নির্ব্বিঘ্নে সাফ্ করে নাবলুম; সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে গরুটির সামনে ধরে দিয়ে গর্ব্ব-মিশ্রিত আনন্দ নিয়ে বাড়ী গেলুম। ঘণ্টাখানেক পরে ফ্যান্ খাওয়াতে এসে দেখি—ডগাগুলি প্রায় সবই খেয়ে ফেলেছে,—সকাল না হতে বাকি ক'গাছার চিহ্নও থাকবে না,—সে সম্বন্ধে আর উদ্বেগ রইল না।

মাছ দেখে দিদি এত' সুখী ছিলেন যে ফ্যান্ কি নুন চাওয়ায়, সেদিন—"ক্যান্ র‍্যা" পর্য্যন্ত তাঁর মুখে আসেনি! যাক্, সেদিন একলা একটা কাজের মত কাজ করে'—মুখে আর বুকে আনন্দ আর গর্ব্ব ধরছিল না। মানব শুনে কি খুসীই হবে,—এই কথাটাই ছিল তার প্রধান আশ্রয়! যে কাজের বাহবা দেবার কেউ নেই—মানুষ সে কাজ স্বইচ্ছায় করে না,—সে কাজ যে প্রেমশূন্য! এখন কিন্তু বুঝেছি—মানুষ নানা কারণে নানা কাজ করে থাকে। বুঝে কিন্তু সুখ পাইনি,—না বুঝাই ছিল ভাল।

শরীর মন দুই-ই শ্রান্ত আর অবসন্ন ছিল;—ঘুম থেকে উঠে দেখি বেলা হয়ে গেছে। মানবের কাছে ছুটলুম। দেখি—গরুটা সামলে উঠেছে,—আমাদের পাড়ায় চরে বেড়াচ্চে। একটা ভাবনা গেল।

মানব জেগেই ছিল;—আমি ঘরে ঢুকতেই—"গরুটাকে দেখে এসেছিস তো,—বোস," বলেই আমার মুখের দিকে চেয়ে উঠে বোসলো। তার চোখ তখনো লাল হয়ে রয়েছে দেখে, খবরটা হেসে দিতে গিয়ে পারলুম না; সহজ ভাবেই বললুম—"সে আমাদের পাড়ায় চরে বেড়াচ্চে।" শুনে সে বললে—"হবে না—মা কালীকে জানিয়েছিলুম,—তবু ভাল করে বলতে পারিনি রে! মাথা যেন ফেটে যাচ্ছিলো,—দেখলি তো!" জিজ্ঞাসা করলুম—"এখন কেমন আছ?" "ততোটা নেই,—তবে আছে।"

গায়ে হাত দিয়ে দেখি—বেশ গরম! সে হেসে বললে—"ও কিছু নয়;—হ্যাঁ—সিধু ভট্টাচায্যির সাত্ত্বিক ডগাগুলোর কিছু করতে পারিসনি বোধ হয়,—ও কি তুই রাত্তিরে পারিস্!" আমি সগর্ব্বে বললুম—"কেন' পারব না,—তুমি ত আমাকে কিছু করতে দাও না—তাই! সে কাজ সেরে, গরুকে দিয়ে তবে বাড়ী গিছলুম, একটি ডগাও রাখিনি।" সে আনন্দে আমার হাত দুখানা নিজের হাত দুখানার মধ্যে চেপে ধরে—একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললে—"ইয়াঃ—এই তো চাই!" পরে হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—"আমি কি জানি না রে—তুই পারিস; কি কোরবো ভাই—যে কাজে একটুও বিপদের ভয় থাকতে পারে, সে কাজ যে তোকে একা করতে দিতে আমার মন সরে না,—তোর যে মা নেই, তোকে সামলাবে কে ভাই! কিছু হলে—তোকে উঠ্‌তে বস্‌তে হাজারো কথা শোনাবে, পাঁচ দিন উপোসী থাকলে ডেকেও কেউ খাওয়াবে না, তখন অন্যের দোষগুলোও তোর ওপরেই চাপাবে;—দিদি কথা কইতে পারবেন না; লুকিয়ে কেবল কাঁদবেন। ওরে, যার মা নেই রে—উঃ!" এই পর্য্যন্ত বলেই হঠাৎ সে থেমে গেল, তার গলাও ভার হয়ে এসেছিল। আমার চোখে জল দেখে—আমার পিঠে হাত দিয়ে,—জোর করে চোখের কোণে একটু হাসি টেনে, বললে—"ওসব বলতে হয় তাই বলা,—ভয় কিরে—বড়-মা তো মরে না, মা কালী আছেন—আমাদের আবার ভাবনা কি, সেই তো আসোল মা রে! এইবার থেকে সব কাজ তুই-ই করিস; আপনাকে বাঁচাবার জন্যে মিছে কথা কইতে পারিনি

কিন্তু। যা কিছু করা সবই তো দুঃখী আর দুর্ব্বলের তরে, তাতে আবার ভয়টা কি? কেমন, পারবি তো?" তার কথাগুলো এমন একটা উৎসাহ আর স্নেহ মেখে বেরিয়ে আসতো—তাতে সব ভুলে যেতুম। প্রাণটা নেচে উঠলো, বললুম—"কেন পারব না,—তুমি বললেই পারবো।"

মানবের মা দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সে তা দেখতে পায়নি। যখন সে বলেছিল—"ওরে যার মা নেইরে—উঃ—!" তিনি আর দাঁড়াতে পারেননি, চোখে আঁচল চেপে নিঃশব্দে সরে যান।

আমি তার কোন কথাই আজ পর্য্যন্ত ভুলতে পারিনি। অনেক দিন সেই সবই ছিল আমার ধ্যান। কিছু দিন পরে বুঝেছিলুম—"যার মা নেই রে—উঃ" উচ্চারণ করেই, সে বুঝেছিল—এ কথাটা আমার কতদূর ভেদ করবে; বোলে ফেলে নিজেও সে খুব ব্যথিত হয়েছিল, তাই পরক্ষণেই আমার মনটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেবার জন্যেই অতগুলো উৎসাহের কথার অবতারণা করেছিল,—তার মধ্যেও অসত্যের আশ্রয় সে এতটুকু নেয়নি। অমন ব্যথার ব্যথাও আর দেখলুম না!

আমি যখন—লাণ্ঠান হাতে সিধু ভট্‌চায্যির প্রবেশ,—চারিদিক চেয়ে গো-রক্তের গোর্ দেওয়া, আর তার ওপর গোবোর জল ছড়া দিয়ে স্থান শুদ্ধি করণ, শেষ চোরের মত অন্তর্ধানের কথা বললুম, শুনে মানব হেসে বলেছিল—"মিথ্যেটাকেই লোক মিথ্যে দিয়ে ঢাকতে যায়, আর ঢাকতে চায়! এই চাপা ঢাকাই আমাদের সত্য ধর্ম্মটাকে গলা টিপে মারলে রে! বুঝতে পারি না—এরা ঐ সঙ্গে নিজের মনটাকে চাপাচুপি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে কি করে!" এখন ভাবি—জ্বর অবস্থায় সে যেসব কথা বলেছিল, সেসব যেন—আমার গর্ব্বের সাথী—আমার খেলার সঙ্গী মানবের কথা নয়।

* * * *

তার পর জ্বর কমে বাড়ে,—ছাড়ে না। গ্রামের ডাক্তার আসেন যান; ওষুধ দেন—আশ্বাসও দেন। আমি সর্ব্বক্ষণই কাছে থাকি। আজিজ রোজই আসে;—এসে প্রথমেই বেদানা আর আঙ্গুর পাঠিয়ে দেয়। কে অত' খাবে—পাঁচ ভূতে খায়। তার পর সে সারাদিন উদাস দৃষ্টিতে বাইরে বোসে থাকে। বাড়ী থেকে যে বেরোয় তাকেই জিজ্ঞাসা করে—"দোস্ত্‌কে কেমন দেখলে, কোনো ভয় নেই তো!" তা ছাড়া আমাকে দশবার ডেকে পাঠায়, কত প্রশ্নই করে,—"দোস্ত্ এখন কি করছে" ইত্যাদি। ফিবারেই সেই একই সব প্রশ্ন! হঠাৎ যেন চট্‌কা ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি নিজেই বলে "তুমি দেরি কোরো না দোস্তের কাছে যাও!" সন্ধ্যে হয়ে গেলে—বিমনার মত' ধীরে ধীরে চলে যায়।

ন'দিনের দিন বিকার দেখা দিলে, গ্রামের ডাক্তার বললেন—"ভয় নেই।" আজিজ শুনেই বসে পোড়ল। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ রেগে বলে উঠলো—"তোমরা দোস্ত্‌কে মেরে ফেলবে,—আমি বরাবর বলছি ভালো ডাক্তার ডাকো—টাকার জন্যে চিন্তা নেই,—তোমরা যে কেন শুনচো না জানি না! আজ আমি দোস্ত্‌কে একবার দেখবই, কারুর মানা শুনবো না,—কোন 'বাধা' মানবো না।" তার মুখের ভাব দেখে সকলেই ভয় পেলে।

৩১

আজিজকে দেখবার জন্যে মানব রোজই অধীর হত,' আজিজও তার জ্যাঠামশাই তারিণী বাঁড়ুয্যের কাছে নিত্য হাত জোড় করে দেখবার অনুমতি চাইত; কিন্তু কোন ফল হত না,—ধর্ম্ম না কি পথ জুড়ে ছিল! মানব যে ঘরে ছিল, সে ঘরে যেতে হলে—ঠাকুর ঘর পেরিয়ে (অর্থাৎ তার পাশ দিয়ে) যেতে হয়!

এই বিচ্ছেদ মানবকেও যত কাঁদিয়েছে, আজিজের বুকেও ততোধিক বেদনা দিয়েছে। শেষ—মানবের জাটতুতো ভাই রজনী, বাপকে বললে—"বেশ ত ঠাকুরকে পঞ্চগব্য দিয়ে নাইয়ে নিলেই ত হবে—সে আর শক্তটা কি! না হয় ঠাকুরকে অন্য ঘরে নিয়ে রাখুন না! রাজমিস্ত্রীরা ঘর ম্যারামত্ করতে এলে তো তাই করা হয়। না হয় গোপনে আমি ওদের দেখা করিয়ে দেব। তা না হলে—সে যে ধাতের ছেলে—ভারী অভিমান আর অপমান বোধ করবে;—এত বড় অসুখের ওপর সে আঘাতে মানব মারা যাবে—দেখবেন!" বাপ বললেন—"খবরদার—লুকিয়ে যেন কিছু করা না হয়,—সে কথা চাপা থাকবে না,—ধর্ম্মের ঢাক্ বাতাসে বাজে! আচ্ছা—আগে আমি পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি—তার পর বোলবো।" ইত্যাদি।

গ্রামের বড় বড় নামজাদা অর্থাৎ জোঁদা মাতব্বরদের পাশা খেলার আড্ডা ছিল—তারিণী বাঁড়ুয্যের বাড়ী। সন্ধ্যার পর—খড়ম পায়—হুঁকো হাতে, অনেকেই হাজির হতেন। সে দিনও—রাখাল রায়, দিন গাঙ্গুলী, সিধু ভট্টচায্যি, হর মুকুর্য্যে উপস্থিত হলেন। পাঁচজনে মিলে—রজনীর উথাপিত প্রস্তাব ধরে—পরামর্শ সভা বোসলো। কিন্তু মঞ্জুরী পাওয়া গেল না! সাব্যস্ত হল'—আজিজ শুধু মোছলমান নয়,—সুয্যি মামার দেশের লোক—ওরা মগ,—আবার "দোম্বা" খায়—যার কুকুদটা হয় পশ্চাতে! সুতরাং সব ফেঁশে গেল। এটা ছিল—জ্বরের সপ্তম দিনের কথা।

* * * *

অনেক করে' আজিজকে নিরস্ত করলুম,—বললুম—মানবের বাপ নেই, জ্যেঠাই অভিভাবক, তুমি ও কাজ করলে, এরা আর মানবকে দেখবে না,—সে অযত্নে মারা যাবে। আজিজ বুঝলে, একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—"হামারা দোস্ত্‌কে মাফিক্ দর্‌দী হাম নেহি দেখা,—ইয়ে লোগ্ কৈসে অ্যায়সা বেদরদ্ হায়!" এই কটি কথা বল্‌তে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো; সে চুপ করে রইল। পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—"হাম্ মাহিন্দর বাবুকো লানে চলা—উও বড়া ডাক্তার হায়; রূপেয়া হাম্ দেগা।"

বরানগরের মহেন্দ্র বাবু সত্যিই বড় ডাক্তার ছিলেন; বাগবাজারের পোলের উত্তরে পাঁচ ছ' কোশের মধ্যে অতবড় ডাক্তার আর কেউ ছিলেন না। মানবের অসুখ ছিল আজিজের দিন রাতের দুর্ভাবনা,—সে তাই বড় ডাক্তারের নাম ধাম সংগ্রহ করেছিল!

আজিজের সঙ্কল্প শুনে রজনী ব্যগ্রভাবে বললে—"আগা সাহেব দাঁড়াও, আমি বাবাকে একবার জানিয়ে, তোমার সঙ্গেই যাচ্চি;—বাবাই টাকা দেবেন।"

সে অনেক বুঝিয়ে বাপকে রাজি করে এসে আজিজকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। রজনী ছিল মানবের চেয়ে অনেক বড়; কিন্তু মানবের ওপর তার একটা টান কখনও দেখিনি,—এটা হঠাৎ দেখা দিছল;—বোধ হয় আজিজের ব্যবহার দেখে। একজন বিদেশী বিধর্ম্মীর কাছে ছোট না হতে হয়!

মহেন্দ্র ডাক্তার তিন দিন এলেন। আজিজ আসবার সময় গাড়ীভাড়া করে তাঁকে নিয়ে আসতো। গাড়োয়ানকে নিজেই যাতায়াতের ভাড়া আগাম দিয়ে রাখতো।

মহেন্দ্রবাবুর আসবার চারদিনের দিন সকালে শুনতে পেলুম,—তারিণী জ্যোঠামশাই রুক্ষকণ্ঠে রজনীকে বলচেন,—"মহেন্দ্র ডাক্তারের রোজ আসবার দরকারটা কি? কি হয়েছে কি, জ্বর বইতো নয়। বেটা মগ্ ভারি মজা পেয়েছে! তার ইচ্ছে মত চলতে হবে না কি! বেটা আমার ভিটেয় বসে' নেমাজ্ পড়ে—তাও সয়ে যাচ্চি, কিন্তু আর সইব না। শুনলে না কাল সিধু ভট্‌চায্যি টুকে গেল! যাবেনা,—সৎ ব্রাহ্মণে সইতে পারে কি,—হিদুঁর পাড়া! ডাক্তারকে আজ বলে দিও—তিনচার দিন অন্তর এলেই হবে। ওরা নামেই বড় ডাক্তার,—উপকারটা কি হচ্ছে! গোবিন্দ নাপতের পিল্ খেলে জ্বর এদ্দিন বাপ্ বাপ্ করে পালাতে পথ পেতো না। লেখাপড়া নাইবা জানলে—লোকটা ধন্বন্তরী;—আট আনা দাও তাতেই খুসী। কেবল তোমার আবদারে"—ইত্যাদি। ছেলের সঙ্গে একটু বচসাও হয়ে গেল।

আজিজের ব্যাকুলতা নিত্যই বেড়ে চলেছিল। কাজ কর্ম্ম তো ছেড়েই দিছলো,—তারিণী জ্যাঠার সদরে সারা-দিন উদাস বসে' থাকত'। এখন আর সে এক স্থানে স্থির থাকতে পারছিল না,—ছট্‌ফট্ করে' বেড়াতো! ডাক্তার মানবকে দেখে নীচে এলে,—তাঁর কাছে খবর নিয়ে, আর সেখানে দাঁড়াতোনা। ম্লান মুখে চলে এসে আমাদের কাঁটাল তলায়, ঘাসের উপর উপুড় হয়ে পড়ে থাকতো। সব দিন তার নাওয়া খাওয়া ছিল বলে' বোধ হয় না। দুর্ব্বল হয়ে আসছিল, তাতেও কিন্তু ডাক্তারের কাছে ছুটোছুটির তার কমি ছিল না,—মাঝে মাঝে হঠাৎ উঠেই বেরিয়ে যেতো।

সেদিন সকালে গিয়ে সে মহেন্দ্র ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে আর বলেছে—"হামারা দোস্ত্‌কো আচ্ছা করদো বাবুজি,—পরদেশী'পর মেহেরবাণী করো! হা'ম গরীব হায়—যো কুছ্ হায়—ইয়েহি হায়,—ইয়ে গেয়ারা শো রূপেয়া তুম্ লো, ভাইকো আচ্ছা করদো, খোদা তোমারা আচ্ছা করেগা, তুম্‌কো সব কুছ দেগা।" এই বলে' তার চামড়ার ব্যাগ্‌টি তাঁর পায়ে রেখে দিয়েছিল!

মহেন্দ্রবাবু ভাবতেন—রোগীর বাড়ীর সঙ্গে লোকটার

মেওয়া বিক্রী সূত্রে পরিচয় আছে; আর এই অঞ্চলেই থাকে—তাই সে-ই তাঁকে নিতে আসে,—এতটা পথ গাড়ীতেও তার যাওয়া হয়। কত ক্ষুদ্র আমাদের হিসাব আর অনুমান গুলো।

সেদিন তিনি তাই আশ্চর্য্য হয়ে বোকার মত চেয়ে রইলেন। এই পাঠানের পাষাণের মত বুকটা ঢাকা এমন স্নিগ্ধ-কোমল জিনিসও থাকতে পারে! ডাক্তার নিজে ছিলেন শোক-সন্তপ্ত লোক,—ভিজে চোখে ভারী গলায় বললেন—"আগা সাহেব, এ টাকা তোমার কাছেই থাক, আমি তোমার দোস্তকে আরাম করতে প্রাণপণ চেষ্টা পাব', যতবার যাবার দরকার বুঝবো নিজেই যাব'। খোদা যদি কৃপা করেন, তুমি বাইশ দিনের দিন আমাকে যা দেবে আমি তাই লাকো টাকা ভেবে নেব'। এখন নিজের কাছে রাখো। খোদা ভালই করবেন,—চলো তোমার দোস্তকে দেখে আসি।"

সেদিন ডাক্তার অনেক করে' আজিজুকে টাকা তুলে রাখতে রাজি করে' আসেন। রোগীর এক ভাবই চলছিল। দেখার পর ডাক্তার বাড়ীর কর্ত্তাকে বললেন—"আমাকে ভিজিটের টাকা আর দিতে হবে না, আমি যতবার আসা দরকার বোধ কোরবো, নিজেই এসে দেখে যাব'। এ নটা দিন বোধ হয় এই ভাবেই চলবে,—এ জ্বর তাড়াহুড়ো করে' তাড়ানো যায় না।" আজিজও কি জানি কি বুঝে আমাদের কাঁটালতলাতেই আস্তানা নিলে,—সেইখানেই নেমাজ পোড়তো—সময় অসময় ছিল না। তারিণী জ্যেঠামশাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। রজনীকে বললেন—"দেখলি—নারায়ণের কাছে সৎ-ব্রাহ্মণের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় না,—এখনো সে-তেজ রাখি।" রজনী কেবল বললে—"মানবের জন্যেও একটু জানাবেন বাবা।"

৫২

ঊনিশ দিনের শেষ রাত্রে মানব সহসা "মা" বলে' ডাকলে। মা সেই ঘরের মেঝেতেই পড়ে ছিলেন। আজ দশ দিনের পর মায়ের চিরকাম্য প্রাণ-জুড়ানো দুর্ল্লভ শব্দটি কাণে যেতেই,—"কেন বাবা—এই যে আমি" বলেই তিনি পাগলিনীর মত এসে, তার বুকে হাত দিয়ে বোসে বললেন, "কি বাবা মানু,—কেমন আছ বাবা!"

"কাদচো কেন'—বেশ আছি ত' মা! তুমি পায়ের ধুলো দাও" বলে' নিজেই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় মুখে দিলে, আর বললে—"ঠাকুরদের চরণামৃত একটু দাও না মা"। মা তাতাতাড়ি কাপড় ছেড়ে চরণামৃত এনে তার চোখে মুখে দিলেন। "আর ভয় কি মা" বলে—মার হাতটা নিয়ে নিজের মাথায় দিলে। মা ধীরে ধীরে তার এলোমেলো চুলগুলি সরিয়ে সরিয়ে যথাস্থানে দিতে লাগলেন।

আমি তার বাঁ-দিকে একখানি চেয়ারে বসে থাকতুম, সময় মত' ওষুধ খাওয়াতুম, বেদানার রস দিতুম, 'টেম্পারেচার' নিয়ে লিখে রাখতুম। আজিজের ছোঁয়া জল অচল বলে, তার আনা বরফ ব্যবহার করতে মানা হয়ে গিছলো, কাজেই সব দিন জুট্‌তো না! মানব জিজ্ঞাসা করলে—"মা, লোকেন কেমন আছে?" মা বললেন—"সে-ই ত' দিন রাত তোমার কাছে রয়েছে বাবা!" "এই যে আমি ভাই" বলে' কাছে যেতেই, একগাল হেসে সে আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরলে। বললে—"আমি তোর তরে মনে মনে ছট্‌ফট্ করছিলুম রে; দোস্ত কেমন আছে ভাই!"—"সে সারাদিন এইখানেই থাকে" এইটুকু মাত্র বললুম। "আচ্ছা শোন্—একটা কথা আগে বলি—আবার ভুলে যাব;—দোস্তকে তো ভোলবার ভয় নেই!"

তার শেষ কথাটা খুবই ঠিক্। বিকারে কেবল দোস্তের কথাই কয়েছে, মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথাও ছিল, আর মা কালী আর ছিরু দুলে। কিন্তু এত অসম্বন্ধ যে ভাল বুঝতে পারতুম না।

বললে—"ভাল করে' শোন্। আমার সেই র‍্যাপারখানা শিবুর কাছে রেখে, তিনটাকা এনে ঐ ব্রাকেটটার ওপর রেখেছি—একদম্ ডালের গা ঘেঁশে। টাকাকটা ভাই ছিরুকে আজই দিয়ে আয়, গরীব বড় বিপদে পড়েছে। মজুরী কোরে রোজ দশটি পয়সা পায়—পাঁচটি লোক খেতে। চালে খড় নেই—দুআনার বিচুলি কিন্‌তে পারে না—সবাই বসে বসে' ভেজে। আজই দিস ভাই—তা না ত' কসাই ছাড়বে না। আজ কি বার্ র‍্যা!"

বললুম—"বুধবার"। বললে—"শুক্কুরবার তার ঘটি-বাটী টেনে নে যাবে বলেছে! আর মা বলেছে—যাক্!" ইতিমধ্যে যে দু শুক্কুরবার চলে গেছে, সেটা মানবের

খবর নেই! ভাবলুম—বিকার অবস্থার খেয়াল—এখনো সে-ঝোঁক্ পুরো কাটেনি। বললুম—"কে টেনে নে যাবে, স্বপ্ন দেখলে না কি!"

"ওরে না না—তোকে বলা হয় নি বুঝি,—শোন্। দু'মাস আগে—ছিরু রাখাল রায়ের কাছে আটআনা ধার করেছিল,—দু'মাসে তার সুদ্ চাই দু'টাকা! দেখি রায় মশাই একদম তার দাওয়ায়,—আর ছিরু হাত জোড় কোরে অবস্থা জানিয়ে কাঁদচে,—"একটু সবুর করতে হবে ঠাকুর মশাই—হরি জানেন সবাই আজ পাঁচ দিন মুড়ি আর জল খেয়ে কাটাচ্চি,—কাজ মিলচে না," ইত্যাদি। গাধও তার বিধবা মেয়েকে দেখিয়ে এমন একটা খারাপ্ কথা বললে, ইচ্ছে হ'ল এক চড়ে তার মুখটা ভেঙ্গে দি! ছিরু নিজের কাণদুটো দু'হাতে চেপে কাঁদতে লাগলো। "হুঁ—তোদের ঘরে আবার অ্যাতো! আচ্ছা—শুক্কুরবার টাকা না পেলে কি হাল্ করি তা দেখবি,—ওর কাপড় টেনে,"—বলেই আমাকে দেখতে পেয়ে, চট্ নেবেই সরে' গেল। রজনীদার সখের টেবিল্ হারমোনিয়মটা আমার মাথায় ছিল, আকড়া থেকে বাড়ী আনতে বলে-ছিলেন। বেকায়দায় তাড়াতাড়ি নাবানোও যায় না,—জানিস তো কি রকম লোক—মাথাটা জ্বলে উঠলো,—চুপ করে চলে আসতে হল—পাপ হল' কিন্তু। উঃ—আবার মাথাটা কেমন করে' উঠছে রে!"

বললুম—"থাক্—আর কথা কয়ে কাজ নেই,—আমি ছিরুকে দিয়ে আসবো অখন।"

"আর কেবল একটা কথা—দোস্তকে একবার দেখাতে পারলিনি ভাই,—তাকে পেলে আমি সেরে উঠতুম!" এই কথা কটি এমন উদাস আর কাতরকণ্ঠে বলে একটা নিশ্বাস ফেললে,—আমার মর্ম্মটা যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে দিলে! পীড়িত পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ যেন আজ শৃগালের কাছে ভিক্ষার আবেদন পাঠালে! বুকটা ফেটে গেল, ইচ্ছা হ'ল ছুটে গিয়ে আজিজকে ডেকে আনি। হায়—কতটুকু দুর্ব্বলতায় মানুষের ক্ষমতা, মানুষের স্বাধীনতা আটকে থাকে! কেঁদে ফেললুম, বললুম—"কি করে' তা হবে ভাই, ওঁরা বলেন—হিঁদুর বাড়ী,—ঠাকুর রয়েছেন!"

মানব একটু ম্লান-হাসি মুখে এনে হতাশ ভাবে বল্লে—"ঠাকুরই আমার বাধা হলেন! ছিঃ, ঠাকুরের নামে এমন বদনাম্ কখনো করিসনি ভাই।" এই বলে ঠাকুরের উদ্দেশে দু'হাত এক করে মাথায় ঠ্যাকালে। তার পর সে যেন ভাবনা-চিন্তার পরপারে দাঁড়িয়ে মুক্ত পুরুষের মত বললে—"দোস্তকে আমার সেলাম্ জানাস্—মাপ্ করতে বলিস। আর ভাখ লোকেন—হিঁদু হোস্‌নি ভাই,—মানুষ হোস্। একটু জল"—জল খেয়ে সে পাশ ফিরে শুলো। বাইরে তখন আলো দেখা দিয়েছে।

আজ বিশ দিন। বেলা সাড়ে আটটার সময় ডাক্তার এলেন, সব শুনলেন;—দেখলেন কিন্তু নিত্য যা দেখেন,—সেই পূর্ব্বভাব। ওষুধ লিখে কতকগুলি উপদেশ দিয়ে গেলেন।

আমরা ভেবেছিলুম বিকার কেটে গেছে। মা-ও তাই আজ অনেক দিন পরে গঙ্গাস্নান করে' মা মুক্তকেশীর পূজা দিতে গিছলেন।

ক'দিন পরে আজিজ আজ কাণ প্রাণ সজাগ করে' আমার কাছে সব শুনলে। "দোস্তকে পেলে আমি সেরে উঠতুম,—দোস্তকে আমার সেলাম জানাস্ আমাকে মাপ্ করতে বলিস্"—মানবের এই কথা কয়টি, সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চার পাঁচবার আমাকে বলালে আর নিজে শুনলে। তার পর ঝড়ের মত একটা নিশ্বাস ফেলে,—সামর্থ্য সত্ত্বে উপায়হীনের মত' বলে' উঠলো—"হাম্ তোমারে ওয়াস্তে জান্ দে সক্তা দোস্ত্, লেকিন তোমারে পাশ নেহি পৌছ সেকা! হিন্দু তোম্‌কো মার্ ডালা—আউর হাম্‌কো আউরাৎ বানা দিয়া! দোস্ত্ হাম ক্যা করে—হুম্ ক্যা করে—হাম্ ক্যা করে!!" নিরুপায়ের এই শেষের তিনটি মর্ম্মছেঁড়া উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সে এমন জোরে মাথা নেড়েছিল—আর তার লম্বা লম্বা রেশমগুচ্ছের মত চুলগুলি শূন্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে এমন সবেগে ইতস্ততঃ ছড়াচ্ছিল, দেখে আমার ভয় হ'ল—নিদারুণ হতাশায় তার প্রাণটা বুঝি ঐ সঙ্গে বেরিয়ে যায়,—না হয় সে পাগল হ'য়ে গেল!

একটু পরে আমার দিকে চেয়ে বিরক্তিমাখা হুকুমের সুরে বল্‌লে—"যা-ও"। ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠলো,—আমি তাড়াতাড়ি সরে এলুম। আড়াল থেকে দেখি, সে ঘাসের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে ছেলেদের মত ফুলে ফুলে কাঁদছে, তার সর্ব্বাঙ্গ নড়ে নড়ে উঠছে! আমিও না কেঁদে থাকতে পারলুম না,—আড়ালে খানিকক্ষণ কেঁদে

নিলুম। মানবের ঘরেই দিনরাত কাটাই,—সেখানে পাষাণের মত থাকতে হয়।

অন্য দিনের মত' সেদিন আর আজিজের কাছে যেতে সাহস হয়নি। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল—তাই যাবার আগে ডেকে পাঠায়। আমি যেতেই সে আমার মাথায় পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে বললে—"হাম্ আজ তুমকো বড়া দুখ দিয়া, মাপ করো বাহাদুর; হামারা মগজ্ ঠিকানামে নেহি ভাই।" আমি কেঁদে ফেললুম। সে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে আমার চোখ মোচাতে মোচাতে—দশবার নিজের চোখও মুছলে। সে স্নেহের তুলনা নেই! মানবের তরে আমাদের উভয়ের চোখই অশ্রুতে উব্‌চে থাকতো,—যে কোনও উপলক্ষ্য ধোরে সে বেরিয়ে আসতো!

তার পর আজিজ বেশ স্পষ্ট আর দৃঢ় কণ্ঠে বললে,—"বাহাদুর, কাল্ হাম দোস্ত্‌কো দেখেগা। হাম গঙ্গাজিমে নাহাকে কাপড়া বদল্‌কে আওয়েগা। কাল্ হামকো কোই নেহি রোক্ সেকেগা।" এই বলেই সে—দ্রুত চলে গেল।

উদ্বোধন

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায় এম-এ

সাঁজ সকালে রক্ত রবি
রঙীন আলোর আল্পনা,
বিজন রাতে চন্দ্র তারা
জানায় যাঁহার কল্পনা;

তপোবনের যজ্ঞধূমে
যাঁহার চরণ যায় গো চুমে,
বিভূতি যাঁর নবীন রাগে
জাগায় প্রাণে বন্দনা।

সাগরে যাঁর ছড়িয়ে আছে
নীলবরণা উত্তরী,
বসন্ত যার কর্ণভূষা
পরায় মুকুল মঞ্জরী,

বিদ্যুতে যাঁর নিশান উড়ে—
দিগ্‌গজেরা আকাশ যুড়ে
মেঘের মেঘে জয়ধ্বনি
ধরার বুকে দেয় ভরি।

পরশে তাঁর মনের বনে
জাগল হাওয়া হিল্লোলি,
তুষার গলা প্রাণের ধারা
উঠ্‌ল আবার কল্লোলি,

অরুণ কিরণ আঁখির পাতে
ফুট্‌ল নব সুপ্রভাতে
থর-বিথরে মানস সরে
শতদলের সব কলি।

হে অপরূপ, নিত্যস্বরূপ,
বিরাট, বিভু, নিরঞ্জন!
বক্ষে তব স্পর্শ হান,
চক্ষে বুলাও জ্ঞানাঞ্জন!

অভয় তব মা ভৈঃ বাণী
দুর্ব্বলেরে তুলুক টানি,
ফুটিয়ে তোল দৈন্য মাঝে
রাজার ছবি শ্রীলাঞ্জন।

বেলজিয়ম

শ্রীনরেন্দ্র দেব

য়ুরোপ-যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা বেলজিয়ম ঘুরে এসেছেন, তাঁরা কেউ এসে আষ্টেণ্ডের প্রশংসা করেন। কেউ বলেন রুবেঁর

লেস বোনার কৌশল!

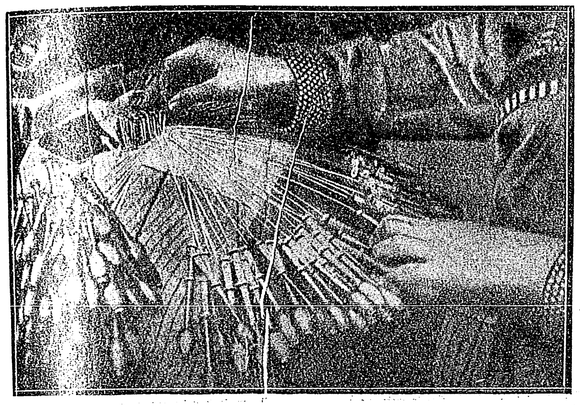

মত চমৎকার সহর বেলজিয়মে নেই। আবার কারুর মুখে রেম্ব্রাণ্টের সুখ্যাতি আর ধরে না! কেউ কেউ আবার ব্রাশেলস্ সহরের বড় বড় আদালত বাড়ীগুলোর খুবই তারিফ করেন। সুতরাং এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, বেলজিয়ম দেশটা দেখবার মতো। তবে বেলজিয়ানরা কি রকম লোক, এ প্রশ্ন করলে, কেউ বেশ সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। তার কারণ আর কিছুই নয়, বেলজিয়ানরা এমন চাপা লোক যে, অল্প দিনের পরিচয়ে তাদের ঠিক চেনা যায় না।

বেলজিয়ানরা সবাই এক জাত নয়। তাদের মধ্যে ফ্লেমিশ আর ওয়ালুন্ এই দুটী সম্পূর্ণ পৃথক জাতের লোক দেখতে পাওয়া যায়। ফ্লেমিশরা অনেকটা ওলান্দাজদের জ্ঞাতি। এরাও অ্যাংলো-স্যাক্সনদের মতো সেই একই টিউটন বংশের সন্তান। ওয়ালুন্‌রা প্রায় ফরাসীদেরই খুড়তুতো ভাই! ফ্লেমিশরা গৌর বর্ণ, এবং ঠিক খর্ব্বকায় না হলেও অনেকটা খর্ব্বাকৃতি বটে; কিন্তু ওয়ালুন্‌রা পাণ্ডুর শ্যাম বর্ণের লোক এবং তাদের আকৃতিও ফ্লেমিশদের চেয়ে অনেক বড়। ফ্লেমিশরা কিন্তু ওয়ালুন্‌দের চেয়ে ঢের বেশী পরিশ্রমী। আবার ওয়ালুন্‌রা ওদের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। ওয়ালুন্ মেয়েরা কিন্তু খুব কাজের লোক। তারা খুব ভাল রান্না করতে পারে। গৃহকর্ত্রীর কাজেও তারা বেশ চৌকস্ এবং সৌখীন; পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ফ্লেমিশ্ মেয়েদের চেয়ে তাদের নজর ও পছন্দ অনেক ভাল।

চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে ততটা পার্থক্য নেই, যতটা তাদের বাহ্য রূপের দিক দিয়ে সৌসাদৃশ্যের অভাব দেখে মনে হয়। প্রায় পাঁচ শতাব্দীর উপর এই দুটি পৃথক জাতি একই রাজার অধীনে বরাবর একত্র

জেলেনী

বাস করছে। এ পর্য্যন্ত কোনও দিন তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ বিবাদ করেনি। তারা উভয় জাতিই সেই একই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বলে, আর ফ্লেমিশরা তাদের সেই আদিম কালের ফ্লেমিশ ভাষাই বলছে। এ পর্য্যন্ত এই উভয় জাতকে একটি মাতৃভাষায় কথা বলাবার কোনও চেষ্টাও হয়নি। তবে

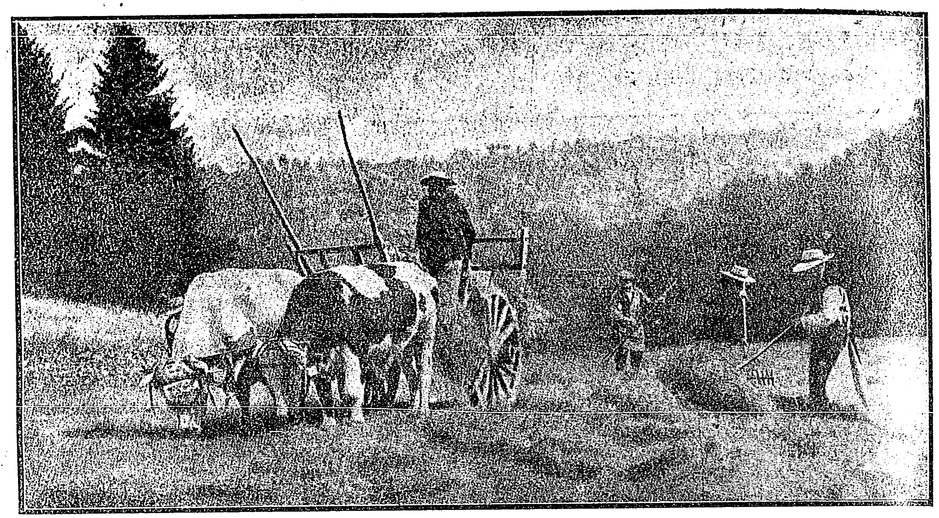

চাষারা ক্ষেতে কাজ করছে

মিছিলের অপর অংশ। (দেবদূতেরা গান গাহিতে গাহিতে যাচ্ছেন)

তারা এ পর্য্যন্ত বরাবর দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষায় কথা কয়ে আসছে! ওয়ালুনরা এখনও সেই ফরাসী ভাষাতেই কথা আজ-কাল ফ্লেমিশরা ওয়ালুনদের ফরাসী ভাষায় কথা বলা সম্বন্ধে আপত্তি জানাচ্ছে।

ওয়ালুনরা ওদের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিত, সভ্য ও ভদ্র বটে, কিন্তু ফ্লেমিশদের যে একটা চরিত্রবল আছে, সেটার একান্ত অভাব ওই ওয়ালুনদের। তবে একটা গুণ তাদের উভয় জাতিরই আছে সেটা হচ্ছে—আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভাবাদর্শের ভণ্ডামী অস্বীকার করে' তারা দুটি জাতই এক সঙ্গে ইহকালের উন্নতির প্রতিই বিশেষ মনোযোগী। এই জিনিসটা আছে বলেই তারা পরস্পরে নির্ব্বিবাদে একই দেশে একই রাজার অধীনে এতকাল কাটাতে পেরেছে। নইলে আমাদের মত আধ্যাত্মিক ভাবে ভাবিত হলে, ক্ষুদ্র বেলজিয়মের স্বাধীনতা বহু পূর্ব্বে লোপ পেয়ে যেতো।

দ্বিতীয় লিওপোল্ডের মতো রাজাকেও বেলজিয়ম শুধু সহ্য করা নয় শ্রদ্ধা করেছে, ভালবেসেছে! অথচ এই বেলজিয়ম পতি দ্বিতীয় লিওপোল্ডকে পৃথিবীর অন্য সব জাতিই ঘৃণার চক্ষে দেখে; কারণ, তিনি নাকি উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক ছিলেন। ব্যভিচার তাঁর জীবনের প্রধান কলঙ্ক। তিনি না কি এমন সব কুৎসিত কাজও ক'রেছেন,

ফ্লেমিশ গোয়ালিনী। (সুরূপা ও সুসজ্জিতা)

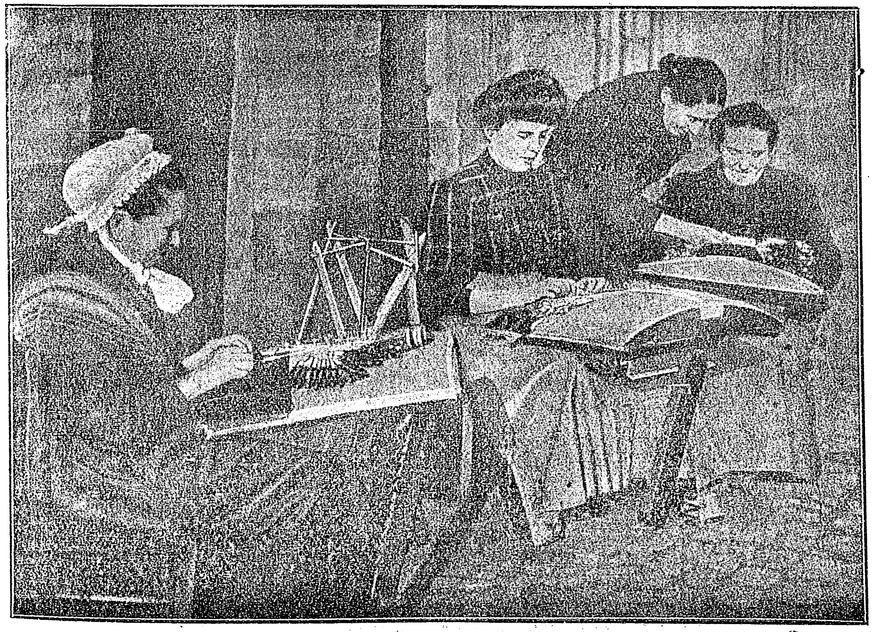

লেস্ বোনা। (অবসর কালে মেয়েরা বাড়ীতে বসে লেস্ বোনে)

যাতে রাজ-পদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু বেলজিয়ানরা বলে—ব্যক্তিগত জীবন তাঁর যেমনই হোক্ না কেন, রাজা হিসাবে তিনি বেলজিয়মের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছেন। তিনি তাঁর রাজকোষে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ জাতীয় উন্নতি কল্পে ব্যয় করেছেন। ব্রাশেলস্ পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র প্রাদে-

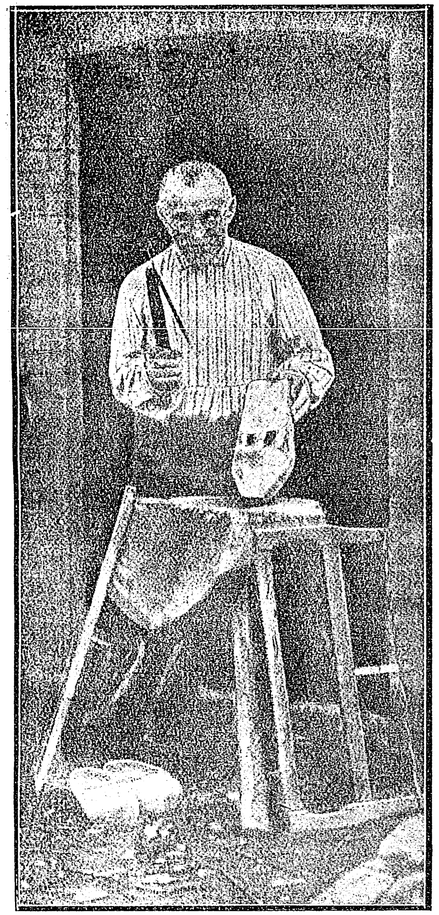

মুচী (কাঠের জুতো (সাবট্) তৈরী করছে।)

শিক সহর ছিল মাত্র! কিন্তু এই দ্বিতীয় লিওপোল্ডের আজীবনের যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রমে ব্রাশেলস্ আজ যে কোনও দেশের রাজধানীর সমকক্ষ হয়ে উঠেছে।

পরের অধীনতা ও অনন্ত দুঃখদরিদ্রতা থেকে মুক্তি পেয়ে এত শীঘ্র স্বায়ত্ত-শাসন ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনও দেশই খুঁজে পাওয়া যায় না। অষ্ট্রিয়ানদের শাসনপাশ থেকে মুক্তি পাবামাত্র বেলজিয়মের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই নানা দিকে কাজ করবার একটা প্রবল উৎসাহ ও উদ্যম দেখা দিয়েছিল। যাদের মাথায় সব বিরাট মতলব ছিল, তারা সকলেই বড় বড়

ওয়ালুন্ রমণী। (এরা একটা বেতের ঝুড়ীতে ছেলেকে শুইয়ে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়ায়।)

কাজে লেগে গেল। নিজের একখানি বাড়ী করবো, চাষ বাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন কোরবো এবং শেষ বয়সের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রেখে যাবো—এমনিই সব সৎবুদ্ধি ও সৎযুক্তি দেশের রাজা শ্যামাদের মাথায় পর্য্যন্ত খেল্‌তে লাগল। দেশের লোকের এই নবীন উদ্যম ও নবপ্রচেষ্টাকে দেশের রাজসরকার থেকে

প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হ'তে লাগল। ফলে তারা অতি শীঘ্রই মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠ্‌ল।

যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে বেলজিয়ম এত শীঘ্র মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলে, তার ষোলআনা কৃতিত্ব বেলজিয়মের বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা-প্রণালীর প্রাপ্য। সে শিক্ষা যেমনিই সহজসাধ্য, তেমনিই ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী। জনকয়েকের উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যস্ত না হয়ে, যাতে সকলেই আবশ্যকমত অল্পসল্প লিখ্‌তে পড়তে এবং

মন্দিরে উপাসনা (ফ্লেমিশ মেয়েরা অত্যন্ত ধর্ম্ম-প্রাণ, তাঁরা নিয়মিত ভাবে দেবমন্দিরে এসে ভক্তিভরে উপাসনা করেন।)

হিসাব রাখতে শেখে, সেই দিকেই তারা বেশী লক্ষ্য রেখেছিল। ছেলেদের জন্য কৃষি-শিল্প প্রভৃতি ব্যবহারিক শিক্ষা, ও মেয়েদের জন্য বোনা, সেলাই, রন্ধন প্রভৃতি শেখাবারও ব্যবস্থা হয়েছিল।

বেলজিয়ানরা বেশ স্বল্পে সন্তুষ্ট জাতি। অন্যান্য দেশের তুলনায় তাদের দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয় যদিও খুব অল্প, এবং তাদের দেশের কুলি-মজুরদের পারিশ্রমিকও

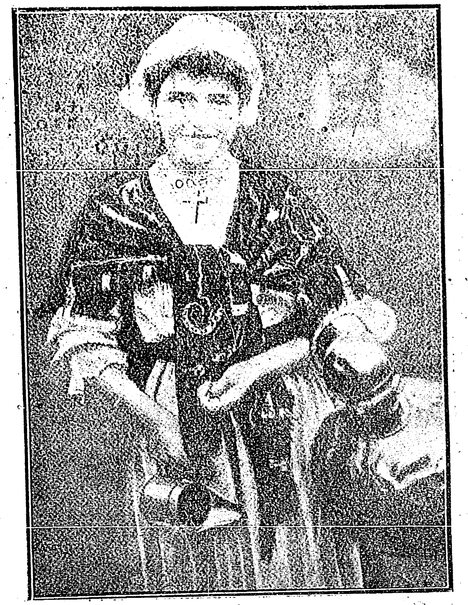

গোয়ালার মেয়ে
(এদেশের গোয়ালার মেয়েরাও সুন্দরী ও সুবেশা!)

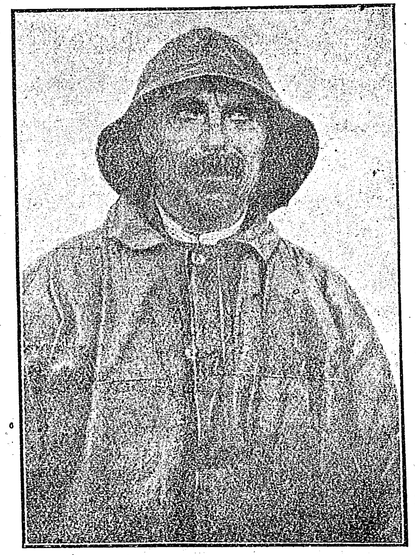

ফ্লেমিশ জেলে

বালক-উপাসকদ্বয়

(শৈশব থেকেই বেলজিয়ানদের ধর্ম্ম-শিক্ষা আরম্ভ হয়।)

এ কথা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে যে, ইহজীবনের দুঃখ-কষ্ট যা কিছু সব পরজন্মে দূর হয়ে যাবে।

বেলজিয়ানদের আহারও অতি অল্প এবং নিতান্ত সাদাসিধে ধরণের। সকালে উঠে তারা কফি আর

বেলজিয়মের চরকা (সেখানে প্রত্যেক চাষার বাড়ীতে চরকা আছে এবং মেয়েরা চরকায় সুতো কেটে সেই সুতো নিজেরা তাঁতে বুনে নিজেদের কাপড় তৈরি করে নেয়।)

যৎসামান্য বটে, তথাপি তারা বেশ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রছে। য়ুরোপের অন্যান্য দেশের ঐশ্বর্য্যের তুলনায় বেলজিয়মকে অত্যন্ত দরিদ্র বলা চলে; কিন্তু তথাপি তাদের মধ্যে দারিদ্র্যের হীনতা নেই। বেলজিয়ানরা ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ও সরল প্রকৃতির লোক। তারা

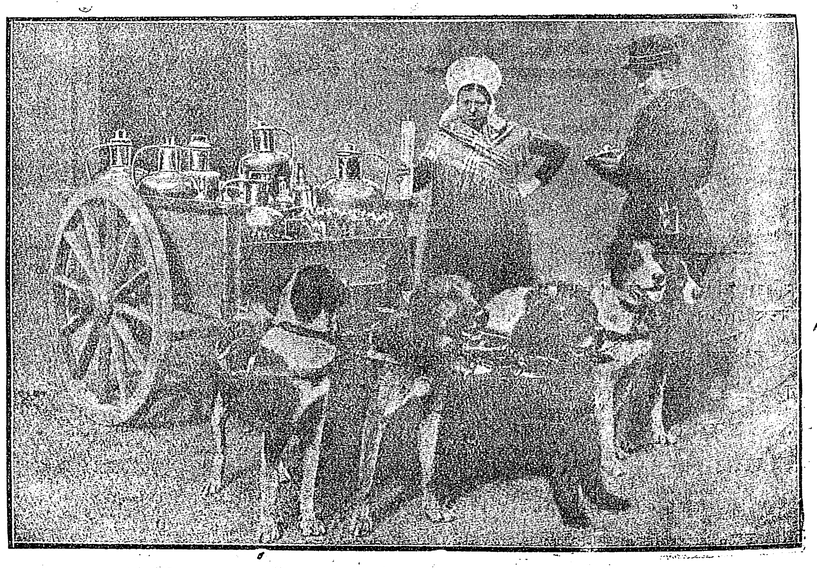

দুগ্ধ পরীক্ষা (সরকারের পরিদর্শকেরা পথে দুধের গাড়ী ধরে দুগ্ধ পরীক্ষা করছেন।)

পাউরুটি খায়। বেলা দশটার সময় একটুক্‌রো রুটি আর একটু মাখন কিম্বা পণীর। মধ্যাহ্নে একটু শূকর মাংস কিম্বা দু'একটা ছোট মাছ। বিকেলে আবার একপাত্র কফি এবং সন্ধ্যের পর রুটী আর সুপ—এই হচ্ছে তাদের সারাদিনের খোরাক। এই খেয়েই তারা বেশ সুস্থ শরীরে সরল দেহে দিবারাত্রি পরিশ্রম করতে পারে।

বেলজিয়ান কৃষকেরা অসুখ কাকে বলে জানে না এবং তারা বেশ দীর্ঘজীবী। বাইরের লোকে তাদের দেখে মনে করে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত যারা এমন গাধার মতো খাটে, তারা নিশ্চয়ই জীবনে আমোদ প্রমোদ কাকে বলে কখন জানতে পারে না। কিন্তু তাদের এ ধারণা ভুল। প্রতি রবিবার

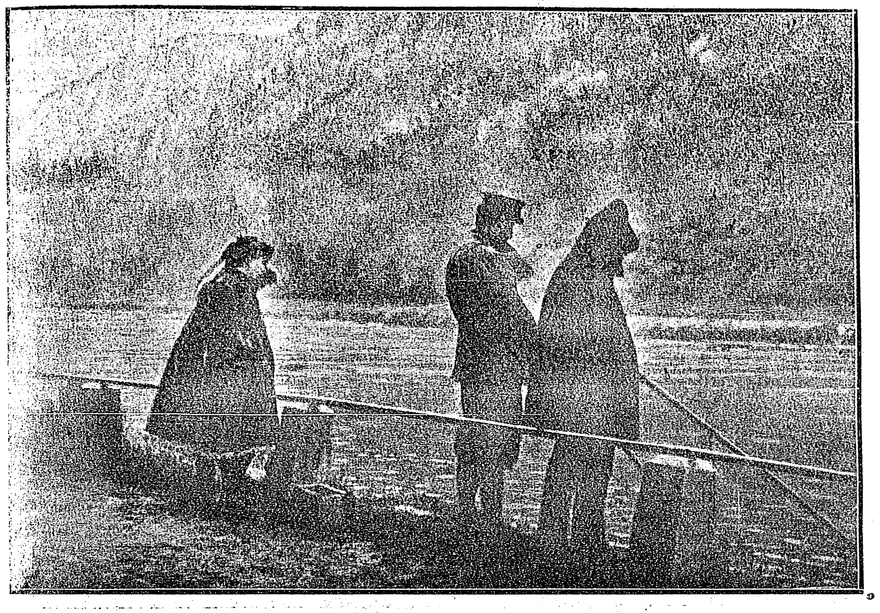

মিউজ নদীতে মাছ ধরা

কয়লার খনির মেয়ে মজুরণীরা

ছুটীর দিনে তারা উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে শূকর বা শশকের মাংস কিম্বা মাছ যথেষ্ট পরিমাণ শাক-সব্জীর সঙ্গে

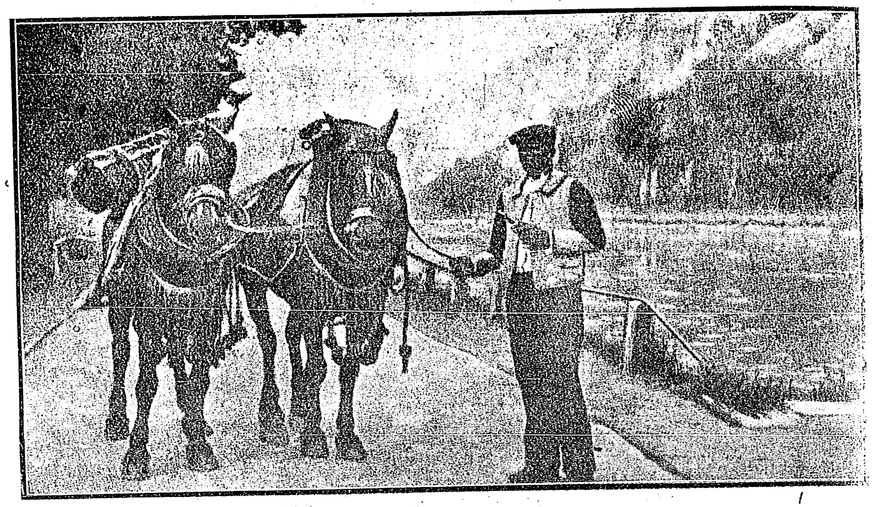

বেলজিয়ান গাড়োয়ান

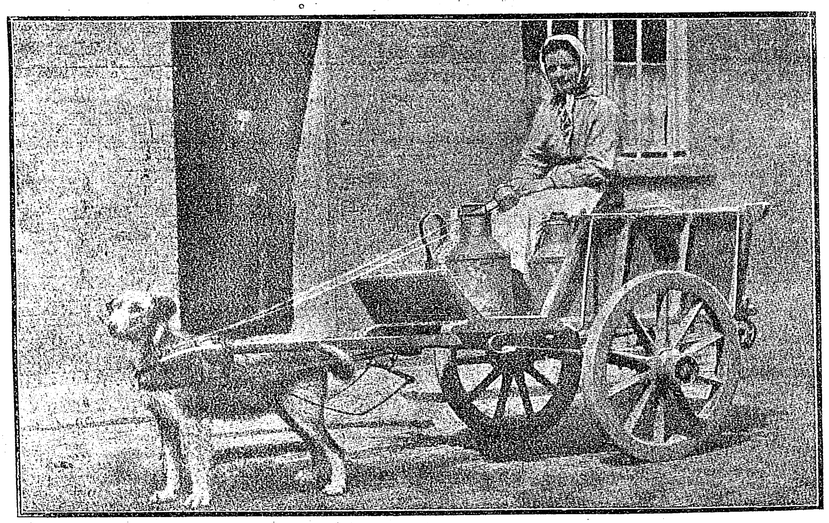

কুকুরের গাড়ী (ছোট ছোট কুকুরের গাড়ী চড়ে মফঃস্বলের গোয়ালিনীরা দুধ বিলি করে বেড়ায়। ফেরিওয়ালারাও অনেকে কুকুরের গাড়ী ব্যবহার করে।)

ভোজন ক'রে, যখন কোনও সাধারণ প্রমোদ-উদ্যানে বা বিশ্রামাগারে গিয়ে বাজ্‌না শুনতে বসে, তখন তাদের

দেখ্‌লে বুঝতে পারা যায় যে, এরা আমোদ প্রমোদও যথেষ্ট করে থাকে।

এই বিশ্রামাগার ও সাধারণের প্রমোদ-উদ্যান বেলজিয়ানদের জীবনের একটা প্রধান আবশ্যক বস্তু হয়ে

দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক গণ্ডগ্রামখানিতে পর্য্যন্ত গ্রামবাসীদের এক একটা নিজস্ব বাজনার দল আছে। এই বাজনার দলের উৎকর্ষতা নিয়ে প্রত্যেক ইস্কুল কলেজে ও গ্রামে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলে।

তীর ধনুক নিয়ে খেলা করা মানুষের একটা প্রাচীন আমোদ,—বেলজিয়ানরা এখনও এ আমোদটাকে লোপ করে দেয়নি। ফ্লেমিশরা এই তীর ধনুক ছোঁড়্‌বার কায়দায় একেবারে সিদ্ধ-হস্ত! বেলজিয়ানদের আর একটা প্রধান আমোদ হচ্ছে, 'কারমেশ' বা বার্ষিক মেলা! এই মেলা কিছুদিন বেশ জোর চলে; তার পর ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। আগে এই মেলা ছিল প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক; আজকাল কিন্তু সকলের কাছেই ধর্ম্মের চেয়ে আমোদটাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

ওয়ালুন্‌রাও এসব আমোদ-প্রমোদে খুব যোগ দেয় বটে, কিন্তু তাদের অনেকেরই মরিয়া ভাবটা,—চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা এত প্রচণ্ড যে, মনে হয় তারা ভগবানকে ডেকে যেন বলছে —কুচপরোয়া নেই, চালাও।

একটা গল্প আছে যে, একবার একজন ওয়ালুন্ সর্দ্দার, পথের ধারে এক কুয়োর পাড়ে বসে একটি সুন্দরী যুবতীকে কাঁদতে দেখে, তাকে আদর-যত্ন করে তুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে

মিছিলের একঅংশ (জোসেফ্ ও মাতা মেরী শিশু যীশুকে নিয়ে দেবালয়ে পূজা দিতে যাচ্ছেন।)

পাঁজ তৈরি করা (চরকায় সুতো কাটবার জন্য এরা গাছের আশ আঁচড়ে পাঁজতৈরী করছে।)

তুলে নিয়ে নিজের বাড়ীতে এনে রাখে। সারারাত মেয়েটি সর্দ্দারের বাড়ীতেই রইল; সকালে উঠে তাকে দেখতে গিয়ে সর্দ্দার দেখলে যে, সে তরুণী সুন্দরীর পরিবর্ত্তে এক

বিকটাকার যমদূত সেখানে উপস্থিত! মর্দ্দার তাতে কিছু-মাত্র না দমে, সহাস্য মুখে যমদূতের সঙ্গে করমর্দ্দন করে ব'ললে, "সুপ্রভাত! নরকে ফিরে গিয়ে বলবেন যে, আমার এখানে আপনার একরাত্রি মন্দ কাটেনি; কেমন?"

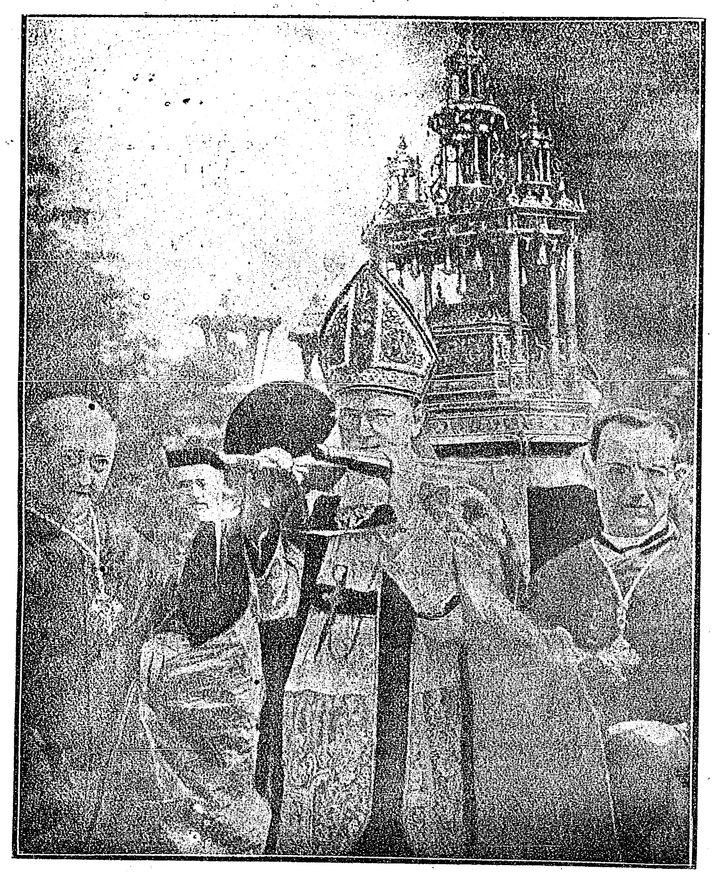

পুণ্য শোণিতোৎসব। (১১৫০ সালে ফ্লাণ্ডার্সের কাউণ্ট থিওডোরিক পুণ্য-ভূমি প্যালেষ্টাইন থেকে প্রভু খৃষ্টের পুণ্য-শোণিত-বিন্দু সংগ্রহ করে এনেছিল। ব্রুজেসের এক মন্দিরে উহা সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রতি বৎসর ঐ দিনটির স্মরণে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়। সেদিন লর্ড বিশপ স্বয়ং সেই পুণ্য-শোণিতাধার স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক রাজপথ দিয়ে মিছিল করে ঘুরে আসেন। এই মিছিলে প্রভু যীশুখৃষ্টের জীবনের যাবতীয় ঘটনা পরের পর দেখানো হয়। ভক্তেরা স্বয়ং সেজে সেই সব ব্যাপারের অভিনয় করেন।)

বেলজিয়মের যে অঞ্চলে এই ওয়ালুনরা থাকে, সেই-খানেই বেলজিয়মের যত কয়লার খনি! কয়লা বেল-জিয়মের অর্থাগমের একটা প্রধান পণ্য! অধিকাংশ ব্যবসা তারা সমবায় সমিতি গঠন করে চালাচ্ছে। বেলজিয়ম এই সমবায় সমিতিতে একেবারে ভরে গেছে। সেখানকার থিয়েটার, বায়োস্কোপ, পাঠশালা ও পানভবন পর্য্যন্ত এই সমবায়-সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত।

বেলজিয়মের ধর্ম্ম-যাজক সম্প্রদায়ের সেখানে খুব প্রতি-পত্তি। তারা সাধারণতঃ একটু উচ্চ-শিক্ষিত লোক; কিন্তু পৌরোহিত্য পেশা বলে' বিদ্যার আভিজাত্যটা তাদের মধ্যে নেই। তারা মোটা চাল বাস করে এবং নানা লোক-হিতকর অনুষ্ঠান নিয়ে দিন কাটায়। দেশের শিক্ষা কার্য্যে তারাই হচ্ছে প্রধান ব্রতী। তাদের তত্ত্বাবধানে নানা রকমের সব সাহায্য-সমিতি পরিচালিত হয় বলে' রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের একটা খুব উচ্চ স্থান হয়ে গেছে! শাসন পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনের সময় ভোটের জন্য অধিকাংশ লোককেই এদের শরণাপন্ন হতে হয়। কারণ, সাধারণের উপর এদের প্রভাব এতট বেশী যে, এরা যাকে ইচ্ছা করবে তাকেই নির্ব্বাচিত করে দিতে পারবে।

কৃষি-জীবীরাই হ'চ্ছে বেল জিয়মের প্রধান অধিবাসী। তারাই দলে ভারি বলে' ভোটের ব্যাপারে তাদের মতটার খুব জোর আছে। আবার এরাই হচ্ছে বেলজিয়মের সব চেয়ে ধর্ম্ম-ভীরু লোক। কাজে কাজেই ধর্ম্ম-যাজক সম্প্রদায়ের খাতিরটাও এদের কাছেই সকলের চেয়ে বেশী। সুতরাং নির্ব্বাচন ব্যাপারে

পুরোহিত মণ্ডলীর হাতই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

ফ্লেমিশরা বেশ আমোদ-প্রিয় লোক; কিন্তু বিদেশী বা অপরিচিতদের তারা বড় সন্দেহের চক্ষে দেখে। যতক্ষণ না তাদের স্থির বিশ্বাস হচ্ছে যে, এর দ্বারা আমাদের কোনও অনিষ্ট হবে না, ততক্ষণ তারা প্রাণ খুলে অপরিচিত বিদেশী-দের সঙ্গে মেশে না! কিন্তু ওয়ালুনরা দিলদরিয়া লোক, সকলের সঙ্গেই নির্ভয়ে প্রাণ খুলে মেশে। ফ্লেমিশরা সবাই সঞ্চয়ী লোক! এদের মতো মিতব্যয়ী গৃহস্থ প্রায় অন্য কোনও দেশে দেখতে পাওয়া যায় না। এরা অধিকাংশ লোক স্বকৃত উপার্জ্জনে নিজেদের বাড়ী তৈরি করে নিতে পেরেছে! বেলজিয়মের লোক সংখ্যার অন্ততঃ এক-দশমাংশের নিজেদের বাসবাস বা বাগানের জন্য জমি আছে। কিন্তু বড় বড় জমিদারের সংখ্যা সেখানে খুবই কম।

বেলজিয়ান জাতটা স্বাধীন-চেতা, কষ্ট-সহিষ্ণু এবং নির্ভীক। নিজেদের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে তারা ভারি হুঁসিয়ার। তারা যে মিতব্যয়ী, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি; এবং এর ফলে তারা সঞ্চয়ী হ'য়ে উঠেছে। অল্প খরচে বেশী পাওয়া যায় যাতে, সেই দিকে এদের খুব দৃষ্টি! বেলজিয়মের যারা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক, তারাও নিতান্ত মোটা চালে বাস করে। তাদের সামাজিক আচার ব্যবহারেও ব্যয়-বাহুল্যের স্থান নেই। কোনও পর্ব্ব বা উৎসব উপলক্ষে পরস্পরের বাড়ী উপঢৌকন বা ভেট পাঠাবার রেওয়াজ এদের মধ্যে নেই। খৃষ্টের জন্মদিনের স্মরণে এরা পরস্পরের বাড়ীতে কেবলমাত্র 'কার্ড' পাঠিয়েই খালাস,—উপহার দেওয়া ও ভোজের আয়োজন করা এসব হাঙ্গামা তাদের নেই।

রাজ-কর্ম্মচারীদের সম্মান ও খাতির বেলজিয়মে সকলের চেয়ে বেশী। সেই জন্য বেলজিয়ান পিতামাতারা

চাষী বউ সব্জী বেচ্‌ছে!

তাদের সন্তানের রাজ-সরকারে একটা চাকরী হয়েছে শুনলে সব চেয়ে খুশী হন। ব্রাশেলসের হালচাল এই রকম বটে, কিন্তু এণ্টোয়ার্পে ঠিক এর উল্টো! এণ্টোয়ার্প ব্যবসা-বাণিজ্য-প্রধান সহর। এখানে যে ছেলে

ক্রীড়ারত বালক-বালিকারা

ব্রাশেলসের লোক অতিথি সৎকার পর্য্যন্ত করতে চায় না, কিন্তু এণ্টোয়ার্পে ঠিক এর বিপরীত। এণ্টোয়ার্পের লোকেরা অতিথি-সৎকার করবার জন্য সতত প্রস্তুত। এণ্টোয়ার্পের আর একটা বিশেষত্ব হ'চ্ছে, সেখানকার উদার সমাজ। এ সমাজে উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধনের কোনও প্রভেদ নেই; কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই পিতামাতার নয়নানন্দদায়ক। আর যে চাকরী করতে যায়, তাকে এণ্টোয়ার্পের লোকেরা ঘৃণা করে। নেপোলিয়ান যখন বেলজিয়ম জয় করেছিলেন, তখন তিনিই প্রথম এই এণ্টোয়ার্প বন্দর তৈরী করেছিলেন। আজ এণ্টোয়ার্প পৃথিবীর একটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। ব্রাশেলসের অধিবাসীরা সহজে কাউকে নিমন্ত্রণ করে না। নিতান্ত জানা শুনা না থাকলে

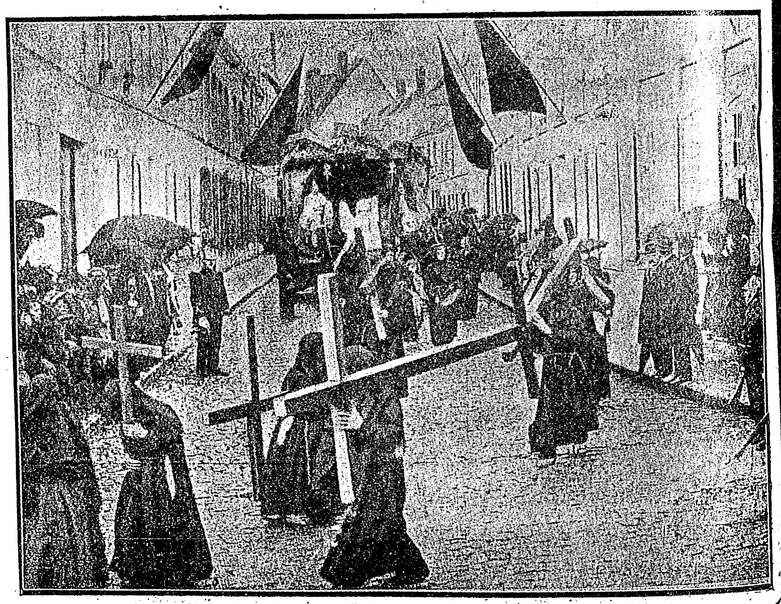

ক্রশ বাহকের দল

লেশ-প্রস্তুতকারিণীগণ

ব্রাশেলসে এটি হবার জো নেই; সেখানে কেবলমাত্র সমান সমান লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা চলে। সেইজন্য সেখানকার সমাজে দলাদলিটা খুবই বেশী। ডাক্তার ডাক্তারের সঙ্গে, উকীল উকীলের সঙ্গে, রাজ-কর্ম্ম-চারী রাজ-কর্ম্ম-চারীদের সঙ্গে, কেরাণী কেরাণীর সঙ্গে ছাড়া মেলা-মেশা করবার

মাঠে শন শুকানো হইতেছে

সুযোগ পায় না। ব্রাশেলস রাজধানী হলেও কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা এণ্টোয়ার্পের অধিবাসীদের চেয়ে বোকা। ঘেণ্ট, লীজ ও নামুর প্রভৃতি প্রাদেশিক সহরেও ভাল ভাল উচ্চশিক্ষিত লোক ও বিদুষী মহিলা একাধিক দেখতে পাওয়া যায়। মিউজের বিখ্যাত লোহার কারখানা লীজ সহরের একটা প্রধান দ্রষ্টব্য ব্যাপার। ঘেণ্ট্ লেশ্ ও চিকণের শিল্প কার্য্যের জন্যই বিখ্যাত; কিন্তু আজকাল যত রকম কলকব্জা মায় এঞ্জিন পর্য্যন্ত এখানে তৈরি হচ্ছে বলে, এ সহরটিও খুব জাঁকিয়ে উঠেছে! ব্রুজেস্ ও জীব্রাগ্ সহরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সহরের প্রত্যেক বাড়ীতেই একখানি ক'রে ঘর বহুমূল্য আস্‌বাব পত্রে সুসজ্জিত করে রাখা হয়। এ ঘরখানি হচ্ছে বৈঠকখানা। বাড়ীর লোকেরা কেউ এ ঘরখানি ব্যবহার করতে পায় না। এঘর কেবলমাত্র অতিথি অভ্যাগত এলে তাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। যাদের বাড়ীতে এই রকম একটি বৈঠকখানা নেই, তারা সম্ভ্রান্ত লোক বলে পরিগণিত হতে পারে না।

সহরবাসী ছাড়া বেলজিয়মের অনেক লোক খালে ও

নদীতে নৌকো বা বজরার উপর বাস করে। বজরাখানিকে এরা ঠিক বাড়ীর মতো করেই সাজিয়ে রাখে। মধ্যাহ্ন ভোজটাই হচ্ছে বেলজিয়ানদের প্রধান আহার। কাজ-কর্ম্ম বেশীর ভাগ তারা সকালের মধ্যেই সেরে ফেলতে চেষ্টা

ব্রুজেস্ সহরের পোল

(ব্রুজেস্ সহরের চারিদিকের খাল পার হবার জন্য অনেকগুলি পোল বা Bridge আছে বলেই এই সহরের নাম হয়েছে ব্রুজেস্!)

করে। বারোটা থেকে ছুটো পর্য্যন্ত এই ছু'ঘণ্টা তারা কোনও কাজ করে না। এই সময়টা তারা মধ্যাহ্ন ভোজনে লিপ্ত থাকে। মধ্যাহ্ন ভোজনের সঙ্গে তারা পানীয় হিসাবে বিয়ার খায়, বিকেলা কফি খায় ও রাত্রে অল্পসল্প মদ্যপান করে। রাত্রের আহার তাদের প্রায় আটটার মধ্যেই চুকে যায়। রাত্রে তারা খুব সকালেই শুয়ে পড়ে এবং ওদিকে খুব ভোরে উঠেই কাজ করতে লেগে যায়। সুতরাং পড়াশুনো করবার তাদের বড় একটা সময় নেই এবং জাতটাও তেমন অধ্যয়নশীল নয়। কিন্তু তাদের যে সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়, তা এতো শ্রেষ্ঠ ধরণের, যে, সকল রকম লোকই সাগ্রহে তা পাঠ করে। বেলজিয়মে ফরাসী আর ফ্লেমিশ এই ছু'রকম ভাষায় সংবাদপত্র ছাপা হয়।

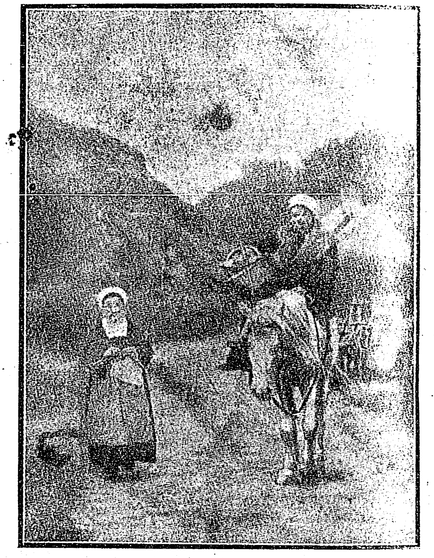

হাটের পথে (বেলজিয়ান কৃষকপত্নীরা ঘোড়ায় চড়ে বাজারে চলেছে)

সাহিত্য-চর্চ্চা সে দেশের অতি অল্প লোকেই করে। তারা নিজের দেশেরই বড় সাহিতিকের সংবাদ রাখে না; সুতরাং বিশ্ব সাহিত্য তাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাদের প্রতিভাশালী বিশ্ববরেণ্য কবি ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত মরিস মেটারলিঙ্ক্‌কে বাইরের লোকে যত জানে, তাঁর দেশের লোকে তাঁকে তত জানে না!

মেটারলিঙ্কের বিষয় একটু না বলে' বেলজিয়মের কথা শেষ করা যায় না। মেটারলিঙ্কের সাহিত্য-জীবনের প্রথম উদ্বোধন প্যারি সহরেই হয়েছিল। তিনি এখন নর্ম্মাণ্ডিতে বাস করেন এবং ফরাসী ভাষায় তাঁর গ্রন্থাবলী

রচনা করেন বটে, কিন্তু তিনি একজন ফ্লেমিশ বেলজিয়ান। তাঁর নাটক তাঁর নিজের দেশে অভিনীত হবার বহুপূর্ব্বে ফ্রান্স্, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় অভিনয় হয়ে গেছে। তবে এজন্য মেটারলিঙ্ক মোটেই ছঃখিত নন। তিনি বলেন, পার্থিব সুখের প্রতিষ্ঠায় আমার দেশের লোক এখনও

বেলজিয়মের মানচিত্র।

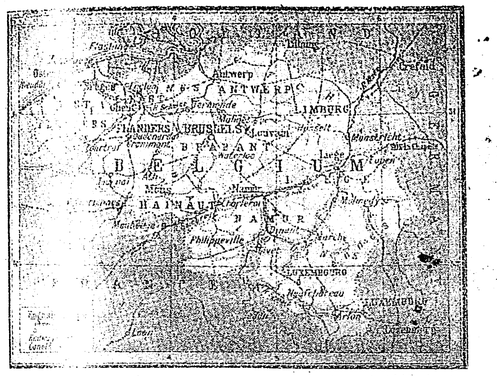

এত ব্যস্ত যে, শিল্প ও সাহিত্য সম্ভোগের উপযুক্ত অবসর তাদের এখনও আসেনি! মেটারলিঙ্কের মতো বেল-জিয়মের অন্যান্য বড় বড় লেখকেরাও ফরাসী ভাষাতেই তাদের গ্রন্থ রচনা করেছেন; কিন্তু বেলজিয়ানরা ফরাসী ভাষাকে আর এতটা আমোল দিতে চাচ্ছে না! তারা এইবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্লেমিশ ভাষাকেই প্রধান স্থান দিয়েছে, এবং লেখকদের সকলকে ফ্লেমিশ ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করতে উৎসাহ দিচ্ছে। এর ফলে বেলজিয়ান ও ডচ্ ফ্লেমিশদের মধ্যে একটা সহানুভূতির সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হবার সূত্রপাত হয়েছে। তবে বেলজিয়মের উচ্চ শিক্ষিত একটা দলের মধ্যে ফরাসী ভাষার আদর ও প্রতিপত্তি এখনও সমান ভাবেই আছে। এই দলটিকে দেশের সবাই খাতির করে। শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে এদের অভিমত ও নির্ব্বাচন সবাই নতশিরে মেনে নেয়। কলা-ক্ষেত্রে বেলজিয়মে একদল তরুণ-পন্থী শিল্পীর অভ্যুদয় হয়েছে। এরা এক দিক দিয়ে দেশের প্রাচীন শিল্প-কলাকে রক্ষা করবার জন্য যেমন যত্নবান, অন্য দিকে দেশে নব নব ভাবে শিল্পের গতি ও উন্নতি সাধন তাদের প্রধান লক্ষ্য।

বেলজিয়মের ইতিহাস এক সুদীর্ঘ যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী। খৃঃ পূর্ব্ব ৫৭ অব্দে যখন বিশ্ব-বিশ্রুত রোমান বীর জুলিয়াস্ সীজার বেলজিয়ম আক্রমণ করে' বিজয়-গর্ব্বে তাকে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন, তখন থেকে সুরু করে ফরাসীর আক্রমণ, জার্ম্মাণীর আক্রমণ, অষ্ট্রিয়ার আক্রমণ, স্পেনের আক্রমণ ধারাবাহিক রূপে বেলজিয়মের উপর দিয়ে ঝড়ের মতো বয়ে গেছে। আমরা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সব ঐতিহাসিক কাহিনীর আর উল্লেখ না ক'রে, এইখানেই বেলজিয়মের কথা শেষ করলাম।

মেঠো হাকিমের কড়চা

শ্রীমুহ্‌তামিম্ বন্দোবস্ত্

বাভনের ইমান্দারী

এক

আমার জরীপের হাতে-খড়ি হইল হাজারিবাগ জিলার উত্তরে। নূতন কার্য্যের আবেগময় উদ্যমের দিনে, প্রকৃতির প্রিয়-লীলাভূমি ঐ প্রদেশ স্বপ্নপুরী বলিয়া মনে হইয়াছিল। কত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ স্রোতস্বিনী, ঐ প্রদেশে জন্মলাভ করিয়া হাসিতে ও নাচিতে শিখিয়াছে! উচ্চ-শির গিরি-শ্রেণী স্তরের পর স্তরে উঠিয়া, গম্ভীর অথচ শান্ত শোভায় দর্শককে তৃপ্ত করে। আবার সুগভীর অরণ্যের স্নিগ্ধ ঘনচ্ছায়ায় চিত্ত সংযত ও কোমল হয়। সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম এই প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দ। স্বচ্ছ-সলিলা, স্বল্পতোয়া স্রোত-স্বতীর ন্যায় তাহারা সরল ও কোমল-হৃদয়; আবার

নিরতিশয় ক্ষুব্ধ থাকিত। তবে সে আশা করিতে ছাড়িত না যে, বয়স হইলে আস্‌রফী নিজের হিসাব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারিবে। বিষয়কর্ম্মে এই অবহেলার জন্য আস্‌রফীকে সে তিরস্কার করিতে চাহিত বটে, কিন্তু পারিত না। সে যে তাহার একমাত্র পুত্রসন্তান,—বংশের বাতি! ব্রহ্মদেও বলিত, সে আস্‌রফীরই সুখের জন্য সদা সর্ব্বদা সচেষ্ট; আস্‌রফী সে কথা বুঝিলে তাহারই ভাল। ধন-দৌলত রাখিতে পারে, সুখে থাকিবে সে-ই; না রাখিতে পারে, কষ্ট হইবে তাহারই। সময়ে সময়ে ব্রহ্মদেও প্রার্থনা করিত, ভগবান যেন তাহার আস্‌রফীকে কষ্ট না দেন; অন্ততঃ তাহার কষ্ট যেন তাহাকে দেখিতে না হয়। তাহার এই প্রার্থনায় বিধি হাসিতেন কি না, জানিবার উপায় নাই; তবে অলক্ষ্যে গ্রামের সকলেই হাসিত।

এ হেন আস্‌রফীকে আমার নিকট কয়েক দিন, রাখিবার প্রস্তাব করিলে, ব্রহ্মদেও রাজী হইবে কি না, সন্দেহ ছিল। তবুও ফিরিবার পথে, চন্দ্‌রখা হইয়া আসিলাম। ব্রহ্মদেওএর সহিত দেখা করিয়া বলিলাম, 'তোমার ছেলেটি বড় ভাল। আমার ইচ্ছা, যে ক'দিন আমি তিসরিতে থাকি, তাহাকে কাছে রাখি। তোমার কি অমত আছে?' ব্রহ্মদেও ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আস্‌রফী ছেলেমানুষ, সে কি আপনার কাছে থাক্‌তে পারবে?'

'খুব্ পার্ব্বে—এখন তুমি ছেড়ে দিলেই হয়।'

'আপনার মেহেরবাণী। তবে তার মাকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।'—ব্রহ্মদেও নূতন আপত্তি উত্থাপন করিল।

'হাঁ, তা জিজ্ঞাসা কর না, এখুনি কর' আমি বলিলাম।

'আপনার নেক্‌নজর্—তা, কাল আমি তিসরি গিয়ে আপনাকে সংবাদ দিয়ে আস্‌ব'—ব্রহ্মদেও বিনীতভাবে নিবেদন করিল। বেশী পীড়াপীড়ি করিলে পাছে ব্রহ্মদেও একেবারে 'না' বলিয়া বসে, এই ভাবিয়া নিরস্ত হইলাম। যাইবার সময় বলিলাম, 'তাকে নিয়ে এসো ঠিক্—আস্‌রফীর থাকবার ইচ্ছা খুব, আমার কাছে। আজ আমাদের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেছে।'

আমার এই আচম্‌কা অভিনব প্রস্তাবে ব্রহ্মদেও নারায়ণের মনে একটি ছোটখাটো আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। জরীপের হাকিম তাহার ছেলেকে কাছে রাখিতে চায় কেন? হাকিমি খেয়াল, না কিছু মতলব আছে? জরীপের অজুহাতে এ অঞ্চলের অনেক লোক ত তাহার সহিত বিবাদ করিবেই। সে শুনিতে পাইয়াছে যে, এ হাকিম সাঁওতাল কোলেদের অতিশয় প্রিয়। যে সব জমী থেকে মহাজনেরা তাদের বেদখল করিয়াছে,—যে উপায়েই হোক সে সব জমী তাহাদের ফিরাইয়া দেওয়াই তাহার ইচ্ছা। ব্রহ্মদেও নালিশ করিয়া, ডিক্রী করিয়া, জোরজবরদস্তী করিয়া, অনেকেরই জোতজমী, বাস্তুভিটা গ্রাস করিয়াছে। তাহার ছেলেকে হাত করিয়া, এ সবের উদ্ধার করিয়া, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবার ফন্দী কি হাকিম করিয়াছে? এদিকে, হাকিমের কাছে তাহার অনেক কাজ। ইচ্ছা করিলে, নানা উপায়ে, তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে এ হাকিম। আস্‌রফীকে পাঠাইয়া হাকিমকে তুষ্ট করিলে, তাহার কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। তাহার অনিষ্ট আর কি করিতে পারে? আইন আছে, আদালত আছে, উকীল মোক্তার আছে, পয়সাও যথেষ্ট আছে। হাকিম যদি বেইন্‌সাফ্ কিছু করে,—কিছু অর্থব্যয় করিলেই, ব্রহ্মদেও তাহা শোধরাইয়া লইতে পারিবে, জরীপ উঠিয়া গেলে। ওদিকে, হাকিমকে হাত করিতে পারিলে, তাহাকে কোনো বেগ পাইতে হয় না; হয়রাণি ও পয়সা খরচ হইতে সে বাঁচিয়া যায়। ব্রহ্মদেওএর মনে এইরূপ নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। সে রাত্রি এই চিন্তাতেই কাটিয়া গেল।

চার

পর দিন বৈকালে আস্‌রফীকে লইয়া ব্রহ্মদেও তাম্বুতে উপস্থিত হইল। বলিল, 'অনেক বুঝিয়ে বলায়, আস্‌রফীকে আপনার কাছে আট দশ দিন রাখতে রাজী হ'য়েছে তার মা। আপনি মেহেরবাণী করে' দেখবেন, সে বড় আবদারী ছেলে।'

'তার জন্যে তোমাদের ভাব্‌তে হবে না,—তুমি রোজ এসে একবার করে দেখে যেও'—আমি ভরসা দিলাম।

'আপনার কাছে থাক্‌বে, তাতে আমাদের আর ভাবনা কি? কষ্ট তার কিছুই হবে না তা জানি। তবে বাপ-মার মন মানে না। তাকে ছেড়ে আমরা কখনো থাকিনি যে'—ব্রহ্মদেও বলিল।

অর্ঘ্য

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

'আস্‌রফী না হয় এক দিন অন্তর তার মাকে দেখে আসবে, কেমন ?'

'তা হলে বড়ই ভাল হয়,' ব্রহ্মদেও নিবেদন করিল। তাহার সম্বন্ধে হাকিমের কি ধারণা, তাহা সঠিক জানিয়া লইবার এই সুযোগ পাওয়াতে ব্রহ্মদেও খুসী হইল। তাহার পর, আস্‌রফীর দুষ্টামির কথা, আহার বিষয়ে তার পছন্দ-অপছন্দর কথা, আরও অনেক খুঁটিনাটি কথা বলিয়া ব্রহ্মদেও বিদায় লইল।

তাহার অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাহিরের একজন নূতন লোকের নিকট থাকিবার প্রস্তাবের নূতনত্বই আসরফীকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। সঙ্কোচ ভাঙ্গিতে বেশী দেরী হইল না। সঙ্কোচ যখন ভাঙ্গিল, তখন নানা প্রশ্নে সে আমাদের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ট করিয়া লইল। এক দিন দু'দিন কাটিতেই, সে যেন আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ জনের মত হইয়া গেল। এক দিন অন্তর তাহার মাকে দেখিয়া আসিবার কথাও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইত। প্রাতে যখন আমি তদারকে বাহির হইতাম, তখন আস্‌রফী, মুনসরিম আমলা-দের কাছে গিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিত; আর প্রজারা আসিয়া, পর্‌চা লইয়া তাহাদের জমীজমা কেমন করিয়া 'বুঝারত' করে তাই শুনিত। যদি বুঝিত যে, বাভন ছোকরাকে দেখিয়া কোনো রাইয়ত তার সব কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছে, তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, তাম্বুর পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। দ্বিপ্রহরের পর আমি ফিরিলে এক সঙ্গে আহার করিত। আহারের সময়, তাহার সকালবেলাকার দেখা ও শুনা সব ঘটনা ও কথা আমাকে বলিত। বৈকালে যখন আমার মেঠো এজলাস বসিত, সে আমার পাশে বসিয়া সব শুনিত, আর মাঝে মাঝে আমার কাণে কাণে মন্তব্য প্রকাশ করিত। সন্ধ্যার পর সঙ্গীত, আর শয়নের পূর্ব্বে সে অঞ্চলের সমস্ত কাহিনী, উপকথা আমাকে শুনাইত।

ক্যাম্পে ব্রহ্মদেওএর প্রত্যহই কাজ থাকে। তাহার তেজারতির বেড়াজালে সে মুল্লুকের অনেকখানিই আচ্ছন্ন। ফিরিবার সময় একবার সে আস্‌রফীকে দেখিয়া যাইত। কথাবার্ত্তা খুব বেশী হইত না। 'কেমন আছিস্ রে বেটা ?' ব্রহ্মদেওএর সাধা প্রশ্ন ছিল। 'বেশ আছি, মা ভাল আছে ?' আস্‌রফীর বাঁধা উত্তর ছিল। দিন যত যাইতে লাগিল, বাপের প্রতি আস্‌রফীর মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। তাহার বাবার উপর যেন তার মনে সন্দেহের একটা গাঢ় দাগ পড়িয়া গেল। প্রত্যহ বৈকালিক আদালতে, আমার পাশে, ক্যাম্বিসের দোলান চেয়ারে আস্‌রফী বসিয়া থাকিত। বাংলা ইংরাজী খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রিকার ছবি দেখাই ছিল তার কাজ। ব্রহ্মদেও হাকিমের পাশে তাহার পুত্রকে দেখিয়া খুব উৎফুল্ল হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু একটির পর একটি করিয়া প্রত্যেক মৌজার প্রজা আসিয়া যখন ব্রহ্মদেও সিংএর নামে নালিশ করিত, তার আদালত ফৌজদারী, জাল জুয়াচুরী, জোর জবরদস্তীর কথা বিবৃত করিত, আস্‌রফীর মন তখন বিকৃত হইয়া যাইত। মুখ বিবর্ণ করিয়া সে তাম্বুর ভিতর পলাইত। আমি যখন কাজ সারিয়া তাম্বুর ভিতরে যাইতাম, দেখিতাম, আস্‌রফী নীরবে শুইয়া আছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুইটা ফুলিয়া গিয়াছে।

এ ত ভারি বিপদ হইল! বালকের মনে আঘাত দেওয়া ত আমার উদ্দেশ্য ছিল না। মনে করিতাম, কৌতূহলপরবশ হইয়াই সে আমার মেঠো আদালতের বিচারাভিনয় দেখে। এ অভিনয় তাহার কোমল মনে কিসের ছাপ অঙ্কিত করিতেছে, তাহার সন্ধান লই নাই। এক দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা আস্‌রফী, তোমার কি ভাল লাগছে না,—তুমি কি তোমার মার কাছে ফিরে যাবে ?'

'কোথায়, চন্দ্‌রখা ?'

'হাঁ, তোমার বাড়ী ?'

'না, আমি চন্দ্‌রখায় যেতে চাই না।' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মা যে সেখানে আছে,—তা না হলে আমার ইচ্ছা হয়, তোমার সঙ্গে বিদেশে চলে যাই।'

'কেন ?'

বালক উত্তর করিল না। তার পর হাসিয়া বলিল—'এ দেশে একটা প্রবাদ আছে জান ?'

'কি প্রবাদ, বল না !'

'বাভন লোগ্ সব হ্যায় বেইমান।

পাঁচ পোনিয়া কা লে গিয়া জান !'

'দেখ হাকিম, এত দিন আমি ভাবতাম, বাভনদের

'কে সেই মহাজন ?'

বৃদ্ধ বলিল—'কেন, সেই বাভন, বরম্‌দেও সিং !'

আস্‌রফী চুপ করিল। বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিল। "আমি চাম্পাইডিহা ফিরে গেলি। অনেক বছর গেল। বেটারা কেউ আসে না। আমি তুবার একবার যাই, দেখে আসি। আমার মৌজার খাল বাঁধ্‌তে লাগ্‌লি। তুবছর চন্দ্‌রখা ন্যই যাই। আজ দশ বছর হ'ল। এক দিন আমার ছোট ছানা বিসাই, সাঁঝের বেলা এলো। এই নাত্‌নিটা তার কোলে, সঙ্গে নাই আর কেউ। তার ঠোঁট দেখলি শুখা, গা দেখলি আগুন। আমি বল্লি—'কি হ'লরে বাপ্‌ বিসাই? কেন আস্‌লি?' বিসাই বল্‌লে 'মাই এলো, বৌকে লিল। আমাকেও চায়। তাই এই কুঁরীকে তোর কাছে রাখতে আলি।' 'সে কি কথারে বাপ, বিসাই, আর ভাইরা তোর কোথায় গেল?' বিসাই বল্লে, 'সে খবর কি তোর কাছে নাই পৌঁছেরে আপা? ক্ষেতজমী ত সব নিলু নিলামে ডেকে, সেই বাভন। হপনা মনের তুঃখে মুলুক ছেড়ে গেল। তারা বল্লে রাজার মাল বাকী, কোর্‌কী এল। চান্দ ভাই, রন্‌বাজ ভাই, সুন্দ্‌রা ভাই, ঘর থেকে বেদখল হ'তে, চাবাগিচায় খাট্‌তে গেল। আমি রই—সেই বাভনের জমী, মোদেরই জমী, ভাগে করি—'

আবার আস্‌রফী বাধা দিয়া বলিল—'কে সেই বাভন?'

চাম্পাই বলিল—'কেন, বাভন সেই চন্দ্‌রখার মহাজন বরম্‌দেও।'

বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিল—

"বিসাইএর গলা কাঠ হ'ল। বল্লে 'বড্ড পিয়াস, ছাথি ফাটে।' জল দিলি। তু'দিন বেহুঁস্‌ থাকে। তার পর জীউ ছাড়ে। জীউ ছেড়ে চলে গেলরে বাপ্‌, চলে গেল, এই কুঁরীকে রেখে। পাঁচ বেটার কেই রইল না কাছে রে বাপ্‌! চান্দদের তল্লাস করি। কোন সন্দাশ্‌ মিল্‌ল না।—"

বৃদ্ধ এবার থামিল।

আমি লক্ষ্য করি নাই—আস্‌রফীর তুই গণ্ড বাহিয়া চক্ষুর জল গড়াইতেছে। চাম্পাইএর নয়ন-কোণ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠ তার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। সেদিন, সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত ধরণীর নির্জ্জন এক প্রান্তে, চাম্পাইএর করুণ কাহিনী আমাকে আত্মহারা করিয়া তুলিল। আমি বলিলাম—'চাম্পাই, আজ এইখানে থাক্‌। কাল আবার তোর কথা শুনব।'

চাম্পাই বলিল—'আমার তুখের কথা আর কত তুই শুনবি রে বাপ হাকিম্‌! আমার কথা যা বলতে এসেছি, তা আজই তোকে বলি। এমন করে আমার কথা ত কেউ নাই শুনে রে বাপ্‌!'

আমি বলিলাম 'তবে বল্‌।'

ছয়

বৃদ্ধ গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার আরম্ভ করিল।

"আজ দশ বছর এমনি করেই কাট্‌ছে রে বাপ। মুনিস জন লাগাই, খেতের কোদো, অরহর, ধান সব ঘরে আনি। বাভন আসে, তুভাগ নিয়ে যায়, এক ভাগ আমার লাগে রাখে। ক'দিন আর বুড়া আছে, রে বাপ। দিন ত ফুরাইএ এল রে বাপ্‌। এখন ভাবনা এই নাত্‌নিটাকে নিয়ে। তাকে কে রাখেরে বাপ্‌, তাকে কোথায় রাখি? মৌজা যদি পায়, তিসরির গ্রামের অনুপা, তার বেটার সাথে কুঁরীর বিহা দিতে চায়। মৌজা কইরে আমার, চাম্পাইডিহা ত বাভন ঘরে বাঁধা!

"আমার খুঁটকাটা এই ডিহি। আমার মেহনতে এর বিল, এর জমী। আমার পয়সায় এর খাল বাঁধা হয়ে ধান হল। তু' চার ঘর পরজা যা আমিই বসালি। আমার ত বেটা পুত কেই রইল না। আমার হাতের তৈরী এই ডিহিটাকে মরণকালে যদি এই নাত্‌নিটাকে দিয়ে যেতে পারি, তা হলে সুখে মরি!'

"বাভনকে বলি আমার গাই, ভৈঁস, কাড়া, সব নিয়ে মৌজা ছেড়ে দে রে বাপ্‌ মহাজন। বাভন বলে 'তা হতে পারে না, মৌজার হক্‌ মালিকি তার হলো।' আমি সুধাই, 'কবে তা হ'লে রে বাপ্‌ মহাজন?' বাভন বলে, 'আদালতের ডিক্রী হ'ল, বাঁশগারি দখল হলো।' আমি এসবের কিছুই না জানি। মুরখু সাঁতাল, ডিক্রীর কথা বাঁশগারির কথা, কি জানেরে বাপ হাকিম্‌!

"এখন ত সরকারের জরীপ চ'ড়ল রে বাপ। আমার কিছু কিনারা করবি কি না বলে দে। মহাজনের হকের

টাকা আমি মিটাএ দিব রে বাপ্‌। হকের ধন কেন রাখবো রে! দেরে বাপ্‌ হাকিম্‌ আমার মৌজা ফিরাএ দে, আমি সব বেচে খুচে মহাজনের দেনের টাকা শুধে দিচ্ছি,' এই বলিয়া বৃদ্ধ দাঁড়াইল। তার কোমরে বাঁধা ছোট একটি বাঁশের চোঙ্গা হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া আমার টেবিলে রাখিয়া বলিল—'এই টিকাইয়ৎএর দেওয়া আমলনামা আমার দলিল, আর কিছু নাই রে বাপ, আমার।'

আমি বলিলাম—'জরীপের সময় বিবাদ কেন নাই দিলি?"

বৃদ্ধ বলিল—"বিবাদ ত দিলি, কিন্তু নাই লিখ্‌ল তোর আমিনে। বাভন তাকে কাগজ কি দেখাল। আমিন বল্লে "চাম্পাই তোর দখল নাই। তোর হক্‌ বার বছর হল নিলামে খরিদ করল বরম্‌দেও সিং। তারি নামে চাম্পাইডিহা জরীপ হবে।' আমি বলি—'কি বলিস্‌রে বাপ্‌ আমিন, যেদিন থেকে জঙ্গল কেটে ডিহি হ'ল, সেই দিন থেকে আজও আমি চাম্পাইডিহা দখল করে আছি। চাষ-আবাদ আমিই করছি, পরজাদের খাজনা চাঁদা আমিই আদায় করছি। আমার নামে মৌজা না লিখে, বাভনের নামে নাই লিখ বাপ্‌ আমিন—ধরম হবেক্‌ নাই!' আমিন শুন্‌ল না আমার কথা। তার পর থেকে রোজই আসি তোর তাম্বুতে। সব গাঁয়ের লোক আসে। তাদের জমী জমা বুঝায়ত করে যায়, আমার ডাক নাই হয়। তোকে ধরব, ধরব নিতি নিতি মনে করি, তোকে একা পাই না। আজ ত পাইলি, সব কথা বল্‌লি। এখন আমার উপায় করে দেরে বাপ্‌! নাতনিটার কিনারা করে দে।"

বৃদ্ধ থামিল। আমি বলিলাম—'কাল কাগজপত্র দেখে বলব।'

'তোর সোণার কলম হবে রে বাপ্‌ হাকিম, দেখিস, আমার কথা নাই ভুলিস'—এই বলিয়া চাম্পাই নাতনির হাত ধরিয়া বিদায় লইল।

সাত

শয়নের পূর্ব্বে আস্‌রফীর মুখে এক উপকথা শুনিয়া চাম্পাইএর কথা ভুলিব, এ আশায় সেরাত্রি নিরাশ হইতে হইয়াছিল। আহারের পর অন্যদিনের মত সে খাটে না গিয়া চেয়ারে বসিল। বলিল—'একটা কথা বলব।'

আমি বলিলাম—'কি কথা বল।'

আস্‌রফী বলিল—'আমি এ বুড়ার মামলায় কি কর্ত্তে পারি?'

আমি বলিলাম—'ব্যাপার যা শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে, তোমার বাপ ওর সব পথ মেরে রেখেছেন। আইনের জোরে বুড়োর উপকার কিছুই করতে পার্ব্বো না, মনে হচ্ছে।' বালক উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রশ্ন করিল—'তবে কি উপায় তার কর্ব্বে তুমি?'

আমি বলিলাম—'তাই ভাব্‌ছি। আইনে ত কোনো উপায় খুঁজে পাই না!'

বালক হঠাৎ গম্ভীর হইল। কি ভাবিয়া আবার বলিল—'তবে কেমন তোমার আইন, আর কিসের তুমি হাকিম? চাম্পাইএর মৌজা চাম্পাইএর নামে না লিখে তোমরা আমার বাপের নামে লিখবে? এটা কি ধরম হবে?'

সরলচিত্ত বালকের মুখে এ কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। হাসিয়াই আমি বলিলাম 'আইন কানুন, ধরম অধরমের কথা তুমি কি জান আস্‌রফী?'

আস্‌রফী দমিল না—বলিল 'তা না বুঝি, কিন্তু চাম্পাই-ডিহা চাম্পাইএর নামেই তোমাকে লিখ্‌তে হবে। আমার বাপের নাম কেটে দাও।'

আমি বলিলাম 'আচ্ছা, কাল দেখব।'

তুজনেই নীরবে শয্যা গ্রহণ করিলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষেই উঠিয়া, আসরফী বন্দ্‌রখা যাইবার অনুমতি চাহিল। কিছু মতলব আঁটিয়াছে ভাবিয়া আমি তাহাকে আর বাধা দিলাম না।

বৈকালে যখন এজলাসে বসিলাম, দেখিলাম, বেড়ার এক ধারে চাম্পাই তার নাত্‌নির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সামনে অনেক লোক। সকলেরই মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন। আমার সেই একঘেয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি চলিতে লাগিল। দেরী কিছুই লাগিতেছিল না। নবমীর পাঁঠা বলির মত, একের পর এক, বাদী প্রতিবাদীকে ডাকা হইতেছিল। তু'চার মিনিট তাহাদের বক্তব্য শুনিয়া, নাম কাটা ও নাম যোগ, যন্ত্রের মতই চলিতেছিল।

বেলা যখন পাঁচটা, দেখিলাম, আস্‌রফী আসিয়াছে।

সে আমার টেবিলের ধারে, লাল খেরুয়ায় বাঁধা দলিল দস্তাবেজের একটি প্রকাণ্ড বোচ্‌কা আনিয়া রাখিল। আমার কাণে কাণে বলিল 'বাপও এসেছে, তাকে সাম্‌নে ডাক।' ইঙ্গিতে ব্রহ্মদেও আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আস্‌রফীর মুখে আজ এক অপূর্ব্ব আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গণ্ডদ্বয় তার আরক্তিম। অধরে তার হাসির তরঙ্গ খেলিতেছে। ব্রহ্মদেওএর আনন আজ বিবর্ণ। সুগৌর সুউচ্চ তার কপাল আজ যেন কালিমামাখা। চক্ষু তার কোটরগত। ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক।

পিতা-পুত্রের এই ভাবান্তর দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য বলিলাম 'ব্রহ্মদেও, আজ তোমার বিশেষ কিছু কাজ আছে না কি আমার কাছে?'

ব্রহ্মদেও বলিল—'বিশেষ জরুরী কাজ, ধর্ম্মাবতার! আজ আস্‌রফী তার বাপের সব পাপ্ ধু'য়ে ফেলতে চায়। আস্‌রফীই আমার একমাত্র সন্তান। তাকে অসুখী করে, ধন দৌলত জমি-জরাত নিয়ে কি আর হবে, হুজুর? ছেলে-বেলা থেকেই দেখছি, আস্‌রফীর অন্য রকম ভাব। জাতের ধরম সে বুঝে না! তা, তারই জন্যে আমি এত করেছি—সে যদি তা তুচ্ছ করে', পায়ে ঠেল্‌তে চায়, আমি কেন তাতে বাধা দিতে চাই! সে আজ যা কাণ্ড করতে যাচ্ছিল, ভগবান তার থেকে আস্‌রফীকে বাঁচিয়েছেন, এই আমার পরম ভাগ্য।'

বাধা দিয়া আস্‌রফী বলিল, 'কাজের কথাটা বলিয়া ফেল না বাবা, রাত হয়ে যাচ্ছে যে, অনেক দূর থেকে তোমার খাতকরা সব এসেছে যে'—

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আস্‌রফী খাতকদের কথা কেন বলে? ব্রহ্মদেওকে বলিলাম—'কি ব্যাপার, খুলেই বল না।'

ব্রহ্মদেও বলিল "বল্‌তেই ত এসেছি আজ, ধর্ম্মাবতার! আস্‌রফী আজ কুঁয়ায় ডুবে মরতে চেয়েছিল। সে তান ধরেছে, আজ ষোল বছর ধরে আমি ধান আর টাকার জন্যে যে সমস্ত জমী-যায়গা, ক্রোক করে দখল করেছি, তা সব দেনীদের ফিরিয়ে দিতে হবে। সব দলিল আজ তোমার সামনে পুড়িয়ে দিতে হবে। আমার বুকের রক্ত আজ জল হয়ে গেল। ছেলের সঙ্গে ছেলের মাও বাহানা নিলে "আস্‌রফীর আমার কিসের অভাব। পৈতৃক যা আছে, তা নিয়ে সকলের সুখেই কাটবে। পরের ধন সব ফিরিয়ে দাও।" কাণ্ড যা হল তা আর কি বলব! মায়ে পোয়ে দুজনেই সারাদিন ইন্দারার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে। আমি কত বুঝালাম। তারা শুন'ল না। যাদের সুখের জন্যে আমার এই সারা জীবনের খাটুনি, তারাই যদি মাথায় লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে চায়, তা হলে আমি আর কি করতে পারি?"

ব্রহ্মদেও একটু থামিল। পাগড়ীর কাপড়ের কোণ দিয়া চোখের জল মুছিল। তার পর আরম্ভ করিল—"আস্‌রফী যেদিন থেকে জন্মেছে, আমার তেজারতির হিসাবপত্র, জমিজমা, দলিল-দস্তাবেজ সব তারই নামে করা হয়েছে। ধরতে গেলে সে-ই এ সবের মালিক। সে যদি তা দান করতে চায়, বিলিয়ে দিতে চায় খুইয়ে দিতে চায়, সেই-ই তার ফল ভোগ করবে। আমি তার কাছ থেকে কিছুই চাই না। কাল থেকে আমি কাশীবাসী হব। আস্‌রফী তার সাধ পূর্ণ করুক। আমি কণ্টক হতে চাই না তার পথে।' ব্রহ্মদেও থামিল। আস্‌রফী বলিল, 'তোমার সামনেই এ বিষয়ের নিষ্পত্তি হবে। তবে, হুজুর, তোমার খতিয়ান আনাও। আমি এক এক করে এই দলিলগুলি ছিঁড়ে যাচ্ছি—তুমি সঙ্গে সঙ্গে মূল আসামীদের নাম লিখে যাও। শেষ হ'লে বাপ আর আমি সব সই করে দেব।'

আমি হাকিমি চালে উপদেশ দিতে চাহিলাম—"ব্রহ্মদেও, তুমি আপন ইচ্ছায় এতে রাজী আছ ত! আস্‌রফী তুমি যা করছ, তার ফল কি তা ভেবে দেখেছ ত!

ব্রহ্মদেও বলিল—'আমি আর কদিনই বা বাঁচব! আস্‌রফীকে হারিয়ে ধন-দৌলত নিয়ে কি কর্ব্ব? আমাদের মন ঠিক করেছি, হুজুর, আপনি সব ব্যবস্থা করে দিন।'

আস্‌রফী বলিল—'পরের ধন নিয়ে বড় হ'য়ে কি লাভ? আমি বুঝি না বুঝি, এ দলিলগুলির শেষ টুকরোকে পুড়িয়ে ছাই না করলে আমার তৃপ্তি নাই।'

* * * *

এক এক করিয়া নাম পড়িতে লাগিল আস্‌রফী, এক এক করিয়া নাম কাটিতে লাগিলাম আমি। টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া টেবিলের নীচে সব দলিল জমা হইতে লাগিল।

সর্ব্বশেষে পড়িল চাম্পাই মাঝী। চাম্পাই নিকটে আসিলে—আস্‌রফী সুধাইল 'কই তোর বেহাই অনুপা?'

চাম্পাই কহিল 'এই যে আছে।'

আস্‌রফী বলিল—'চাম্পাই, চাম্পাইডিহা তোর নামেই থাকল—কুঁয়ার সাদিতে আমাকে ডাক্‌বি'ত?'

চাম্পাই আনন্দে অধীর হইয়া বলিল—'ভালারে বাপ, বাভন ছোকরা, তোরা না আসলে আমার নাত্‌নিটার সাদি কে দিবে রে বাপ।'

সেদিনকার মত কাজ শেষ হইল। আস্‌রফী নিজের হাতে ছেঁড়া দলিলের টুকরাগুলি কুড়াইয়া লইয়া, অদূরে এক গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। দূরে দেখা গেল, দীর্ঘ যষ্টী হাতে চাম্পাই যাইতেছে। বাম হস্ত তার নাত্‌নির কাঁধে। পিছনে তার অনুপা আর তার বেটা বিরধা।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এসসি

দ্রুতগামী গাড়ী

পৃথিবীতে যতগুলি গাড়ী আছে, তার মধ্যে তিনখানি হ'চ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী। প্রথম মার্কিণ বৈজ্ঞানিক Malcolm Campbellএর গাড়ী ঘণ্টায় ১৬৮ মাইল চলে; দ্বিতীয় একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকের গাড়ী ঘণ্টায় ১১৬ মাইল চলে; তৃতীয় মিশর যুবরাজ Djelaleddinএর গাড়ী ঘণ্টায় ১১৪।১১৫ মাইল চলে। যুবরাজের গাড়ীর বিশেষত্ব হ'চ্ছে এই যে, তাঁর গাড়ীর যন্ত্রপাতি সব পিছন দিকে, আর বসবার জায়গা সামনের দিকে। বলা বাহুল্য যে, এ তিনখানি গাড়ীই মোটরকার।

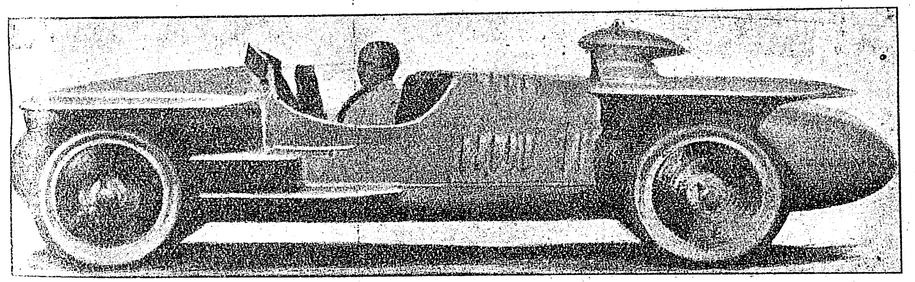

মিশর যুবরাজের গাড়ী

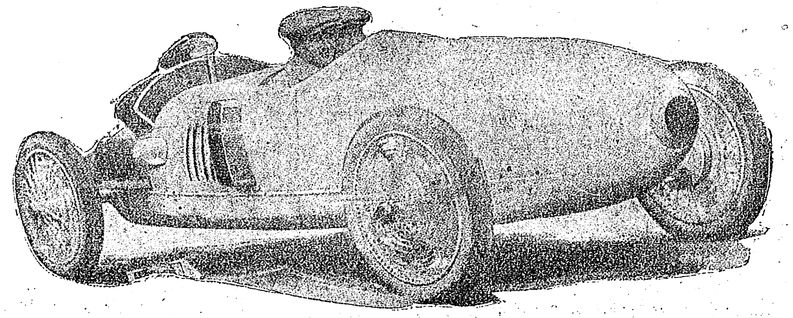

জার্ম্মান বৈজ্ঞানিকের গাড়ী

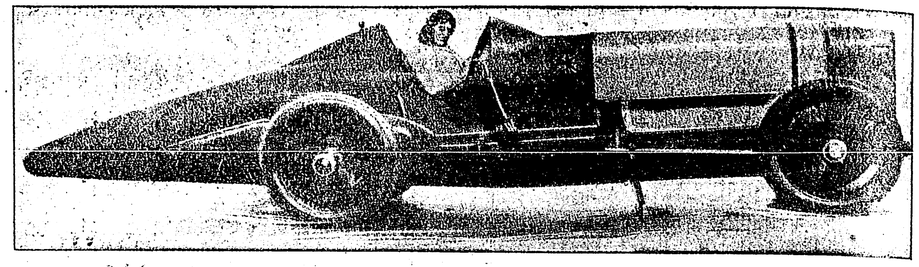

মার্কিন বৈজ্ঞানিকের গাড়ী

স্বপ্ন-সঞ্চার। (Adrenalin glandএর রস সেবন ক'রে এক ব্যক্তি পতনের স্বপ্ন দেখ্‌ছে। তার মনে হ'চ্ছে, সে যেন একটি ১৮ তলা বাড়ীর ছাতের উপর থেকে পড়ে যাচ্ছে)

স্বপ্ন-সঞ্চার

প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ স্বপ্ন ব্যাপারটাকে একেবারে অলীক বলে সিদ্ধান্ত ক'রেছেন। তাঁরা বলেন, স্বপ্ন শুধু খাদ্যের গুণের উপরই নির্ভর করে; অর্থাৎ খাদ্য যদি উত্তেজনীয় হয়, আমাদের শরীর ও মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তখন আমরা নানারূপ উদ্ভট স্বপ্ন দেখি; কিন্তু খাদ্য যদি স্নিগ্ধ জাতীয় হয়, আমাদের শরীর ও মস্তিষ্ক শীতল থাকে, তখন আমরা সুখে নিদ্রা যাই। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ আজকাল নানারূপ ঔষধ প্রয়োগে যে কোনও লোককে ইচ্ছানুরূপ স্বপ্ন দেখাবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। Adrenalin, Pituitary glandএর রস পান করিয়ে বহু লোককে কলহ, ভয়, পতন ইত্যাদির স্বপ্ন তাঁরা ইচ্ছামতো দেখিয়েছেন।

সূর্য্য-কিরণ

রৌদ্র মানব-জীবনে যে কত উপকারী, তা' আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না। সম্প্রতি Dr. C. B. Little ও W. T. Bodie নামক দুজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক'রে দেখেছেন যে, সূর্য্য-কিরণ মানবের অস্থিসমূহ দৃঢ় ক'রে তাদের শক্তিশালী ক'রে তোলে। তাঁরা বলেন "এমন কি জন্মাবধি দুর্ব্বল, ক্ষীণজীবী শিশুকে যদি প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে সূর্য্য-কিরণে রাখা যায়, সে যে শীঘ্রই সুস্থ ও সবল হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই জন্যই বোধ হয় সদ্যোজাত শিশুকে প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়ার একটা নিয়ম প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

সূর্য্য-কিরণ। (একটি রুগ্ন, ক্ষীণজীবী শিশুকে নিয়মিতভাবে রৌদ্রে রাখবার পর তা'র একখানি ছবি)

জলের সাইকেল।(বৈজ্ঞানিক নব-নির্ম্মিত সাইকেল আরোহণ ক'রে জল-বিহার ক'রছেন)

জলের সাইকেল

জলের উপর যাতে বেশ ইচ্ছামতো বেগে একজন লোক ভ্রমণ ক'রতে পারে, সেজন্য একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক George R. Stevenson একটি নৌকাযুক্ত দ্বিচক্রযান নির্ম্মাণ ক'রেছেন। গাড়ীটির উপর দিকে বসবার জায়গা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সমস্তই একটি দ্বিচক্র যানের (Bicycle) মতো, এবং নৌকাগুলির তলায় চাকা লাগান আছে। বাইসাইকেলের মতো চালালেই নৌকাগুলি জলের উপর চাকার সাহায্যে সবেগে ভেসে চলে; এবং আরোহী নিজের ইচ্ছামতো গতির হ্রাসবৃদ্ধি ক'রে জলের উপর ভেসে চলেন।

প্রেমত্রাণ চিরুণী

সম্প্রতি Lettice Apperley নাম্নী একজন মার্কিণ কুমারী সেখানে এক রকম সুন্দর চিরুণীর প্রচলন ক'রেছেন, যেটা মাথায় থাক্‌লে কোনও কুমারী যে কারুর প্রেমে আবদ্ধ হয়েছেন, সেটা লোকে বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারে। সেই চিরুণীগুলির উপর কোনও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রণয়ীযুগলের চিত্র অঙ্কিত থাকে। সুতরাং সেই

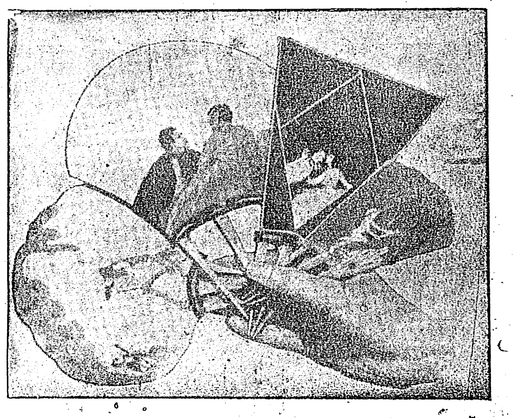

প্রেমত্রাণ চিরুণী।

চিরুণী ব্যবহার ক'রলে, যে-কোনও কুমারী অসংখ্য কুমারের অবিরাম প্রেমভিক্ষা করার যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যান।

সঙ্গীতের সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ

S. D. Snavely নামক একজন সৌখীন ভদ্রলোক ফনোগ্রাফের সঙ্গে ঘড়ির alarmএর সংযোগ ক'রে প্রত্যহ সকালে গান শুন্‌তে শুন্‌তে নিদ্রাভঙ্গ ক'রবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার ক'রেছেন। ফনোগ্রাফের সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গের নিরূপিত সময়ে alarm bellএর কাঠিটি

সঙ্গীতের সঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ। (এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের দ্বারা Snavely সাহেবের প্রত্যহ সকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়)

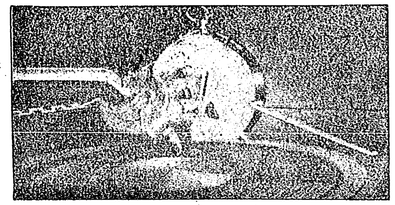

নড়ে উঠলে, রেকর্ড চক্রের গতিরোধক যন্ত্রটি রেকর্ড চক্রের তলদেশ থেকে সরে যায়, অমনি রেকর্ডটি ঘূরতে থাকে। Sound boxটি রেকর্ডের উপর পূর্ব্ব হ'তেই ঠিক ক'রে বসান থাকে বলে' সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডের গান বাজ্‌তে থাকে, আর তাই শুন্‌তে শুন্‌তে ভদ্রলোকের নিদ্রাভঙ্গ হয়।

দেশভক্তের ব্রত

নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে দেশের অর্থবৃদ্ধি করার

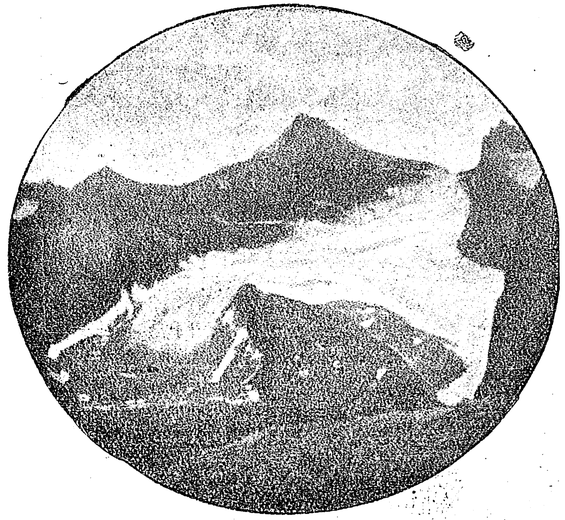

তুষার-মণ্ডিত Alaskaর একটি দৃশ্য

দেশভক্তের ব্রত (তুষার-মণ্ডিত Alaskaর Smith সাহেব অর্থ অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছেন)

উদাহরণ Dr. Philip S. Smith নামক একজন মার্কিণ দেখিয়েছেন। সুদূর উত্তরে তুষারমণ্ডিত Alaskaয় কোনও মণিরত্নখনি প্রাপ্ত হওয়া যেতে পারে কি না, তা' দেখবার জন্য দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরে তিনি ক্রমাগত চেষ্টা ক'রে এসেছেন। চেষ্টার ফলে কোনও খনি বা রত্নগর্ভা নদী তিনি আবিষ্কার ক'রতে পারেন নি বটে, তবে কয়েকটি

দেশভক্তের ব্রত (Philip S. Smith এর একখানি ছবি)

Smith সাহেবের নবাবিষ্কৃত নদীগুলির মানচিত্র

নূতন নদী আবিষ্কার করেছেন, যদ্দ্বারা বাণিজ্য হিসাবে মার্কিণ রাজ্য ভবিষ্যতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন ক'রতে পারবে।

বাক্‌যন্ত্র

Cancerএর মতো দুরারোগ্য ব্যাধি গলদেশে জন্মিলে, চিকিৎসকগণ রোগীর প্রাণরক্ষার জন্য সেই স্থানে অস্ত্রোপচার ক'রে থাকেন। এইরূপে রোগীর প্রাণরক্ষা হয় বটে, কিন্তু সে তার বাক্‌শক্তি চিরকালের জন্য হারায়।

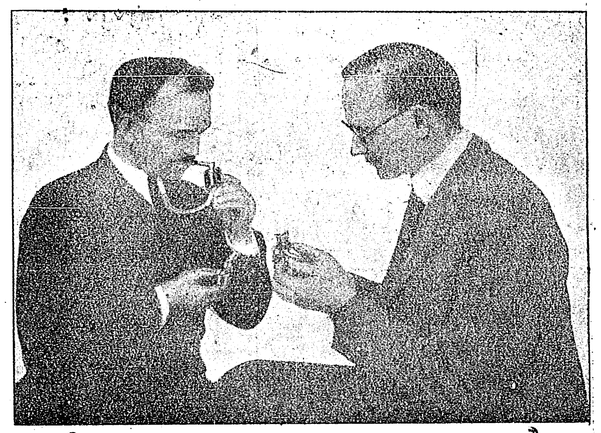

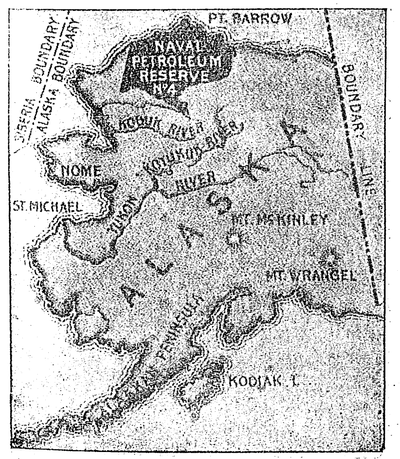

বাক্‌যন্ত্র (বৈজ্ঞানিক রোগীকে বাক্‌যন্ত্র পরিয়ে দিচ্ছেন)

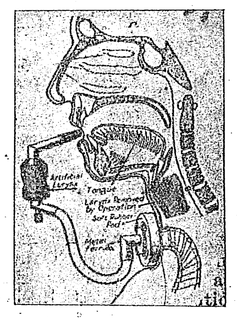

বাক্‌যন্ত্র (বাক্‌যন্ত্র প'রবার ও তা' দিয়ে কথা কহিবার প্রণালী)

এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলিত হয়ে একটি সুন্দর যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রেছেন, যেটি গলদেশে সংলগ্ন ক'রে দিলে, রোগী ইচ্ছামতো কথা কহিতে পারে, কোনও অসুবিধা হয় না।

প্রাচীন ছবি
(১৮৪০ খৃষ্টাব্দে Kodak ক্যামেরায় তোলা একখানি আলোকচিত্র)

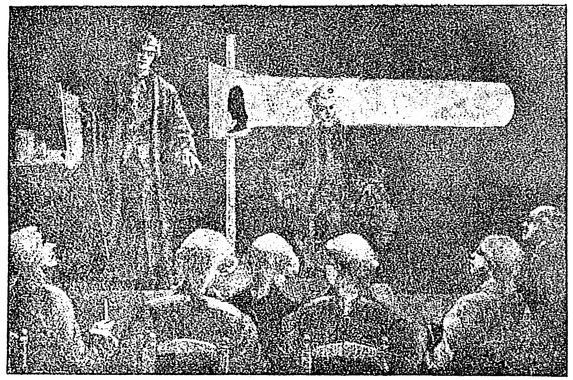

বর্ত্তমান কোডাক (Kodak) ক্যামেরার প্রাচীনতম পুরুষ

আলোকচিত্রের জন্মকথা
(দুইশত বৎসর পূর্ব্বে নবীন কেরাণীর অবসর সময়ে ফটো তোলবার একটি দৃশ্য)

আলোকচিত্রের জন্মকথা

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে কোনও অফিসের একজন নবীন কেরাণী অবসর-সময়ে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ক'রতে ক'রতে "ফটোগ্রাফের" উদ্ভাবন করেন। কোনও লোককে অন্ধকার ঘরের ভিতর বসিয়ে বাহির হতে দেওয়ালের একটি ছিদ্র দিয়ে একখানি Sensitised কাগজের উপর তীব্র আলোক নিক্ষেপ ক'রে সেই ব্যক্তির আলোকচিত্র গ্রহণ ক'রতে হ'ত। এইজন্য সেই ব্যক্তিকে প্রায় দীর্ঘ ২০।২৫ মিনিট ধরে স্থিরভাবে এক জায়গায় বসে থাকতে হ'ত। পরে কালের বিবর্ত্তনে নানারূপ বৈজ্ঞানি[illegible] যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়ে বর্ত্তমান উন্নত ক্যামেরার জন্ম হ[illegible]।

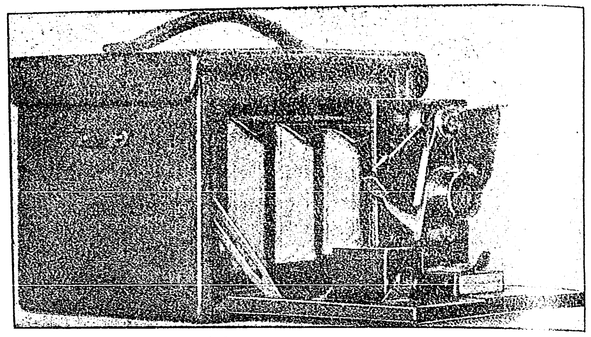

বেতারে ফটো

বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান হতে পারে, কিন্তু তা' দিয়ে আলোক-চিত্রের আদান-প্রদান যে সম্ভবপর হতে পারে, তা' বৈজ্ঞানিকদের কল্পনার বাহিরে ছিল। সম্প্রতি মার্কিন বেতার অফিসের একজন বৈজ্ঞানিক Capt Richard H. Rogers বেতারে আলোক-চিত্র তোলবার ব্যবস্থা ক'রেছেন। একখানি আলোক-চিত্রের ভিতর দিয়া তীব্র আলোক একটি যন্ত্রের উপর নিক্ষেপ ক'রতে হয়। সেই নিক্ষিপ্ত আলোক

১৮৮৪ সালের তৈয়ারী কোডাক ক্যামেরা

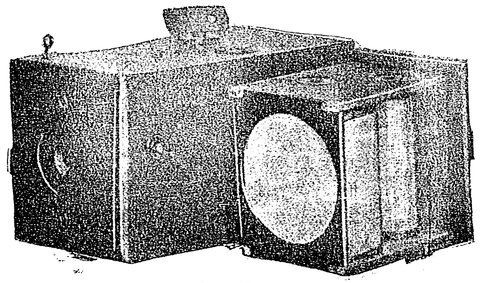

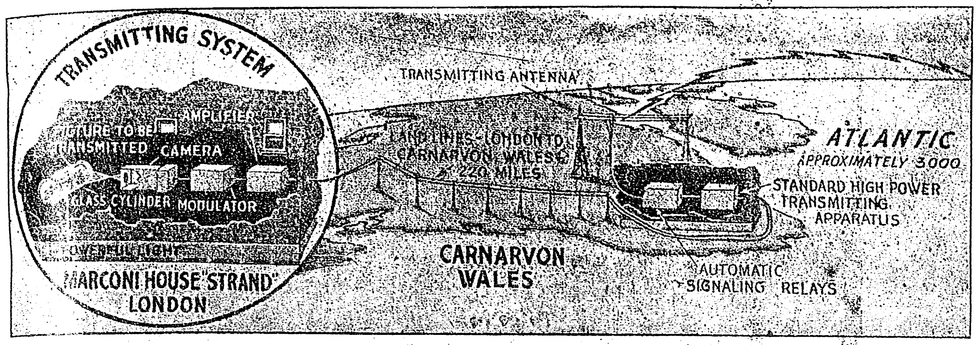

বেতার ফটো ১

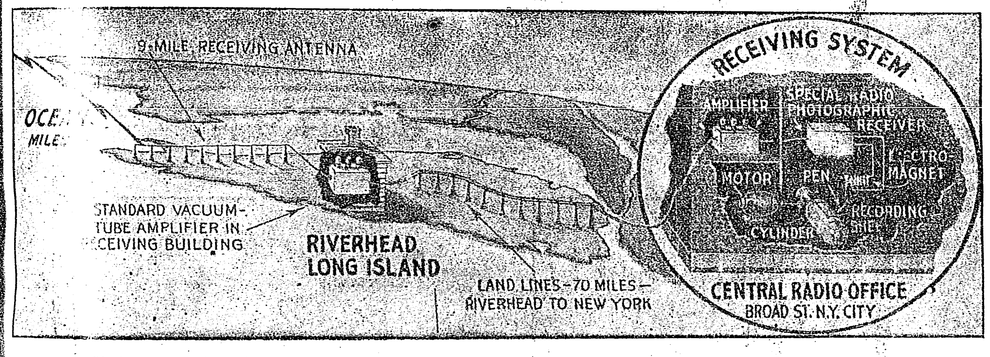

বেতারে ফটো ২ (বেতারে ফটো পাঠাবার ও বেতারে ফটো গ্রহণ করবার যন্ত্র)

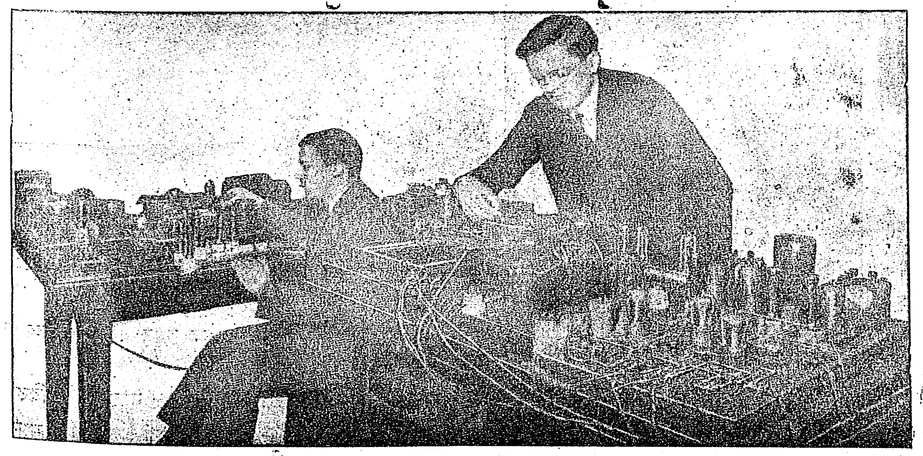

বেতারে ফটো (এই যন্ত্রের দ্বারা বেতার পরিবর্ত্তক বলে পরিণত আলোকচিত্র গ্রহণ ক'রতে হয়)

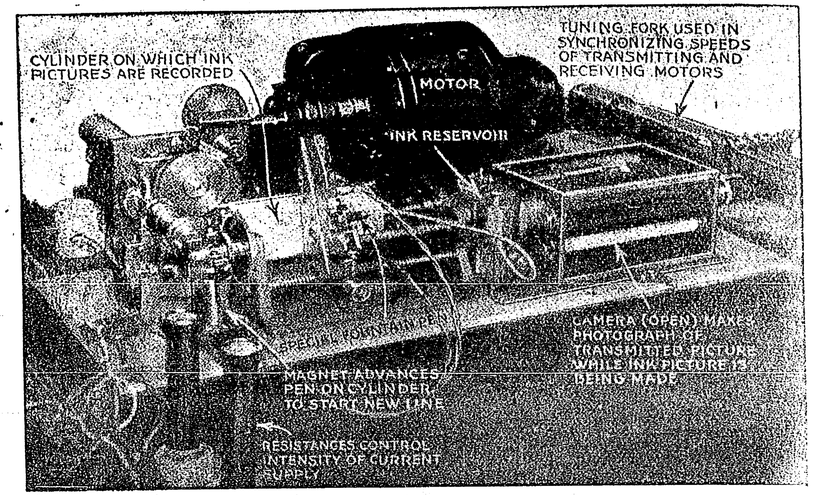

বেতারে ফটো (এই যন্ত্রের দ্বারা আলোকচিত্রগুলি বেতার পরিবর্ত্তক বলে পরিণত হয়)

President Coolidgeএর একখানি আলোকচিত্র

বেতারে ফটো
(President Coolidgeএর লণ্ডন হইতে বেতারে নিউইয়র্ক সহরে প্রেরিত আলোকচিত্র)

যন্ত্রের ভিতরে গিয়া প্রথমে বৈদ্যুতিক পরিবর্ত্তক বল (impulse) ও তৎপরে বেতার পরিবর্ত্তক বলে পরিণত হয়। তৎপরে যন্ত্রের সাহায্যে সেই আলোক-চিত্রের প্রতিকৃতি স্থানান্তরে প্রেরিত হয়। এইরূপে লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক সহরে অনেকগুলি প্রতিকৃতি পাঠান হয়েছে।

ক্যামেরায় চোর ধরা

ধড়িবাজ চোর বা হত্যাকারীকে অনেক সময় ধরেও ধরতে পারা যায় না ; সেজন্য লোকার্ড (Locard) নামক একজন বৈজ্ঞানিক একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করেছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির পোষাক পরিচ্ছদ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ধূলো ময়লা গ্রহণ ক'রে তাঁর নব-নির্ম্মিত ক্যামেরার দ্বারা বৃহত্তর চিত্র নিয়ে তা' থেকে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের সমর্থন ক'রতে পারেন। এমন কি সেই ধূলো ময়লার পার্থক্য থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন্ শ্রেণীর চোর, তাও নিরূপণ ক'রতে পারেন।

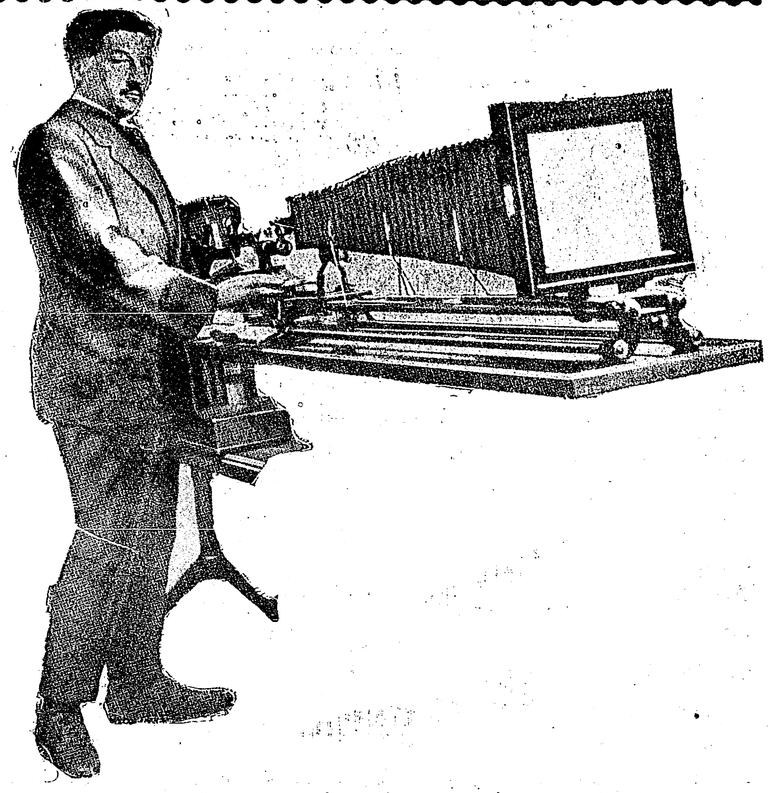

চোরধরা ক্যামেরা—(Locard সাহেব তাঁর নবাবিষ্কৃত ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন)

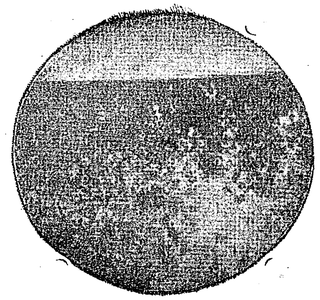

চোরধরা ক্যামেরা ১

(Locard সাহেব ক্যামেরা দিয়ে নোট জালিয়াতের নখের ভিতর থেকে ময়লা সংগ্রহ ক'রে তা'র ফটো তুলে তার দোষের সমর্থন ক'রছেন)

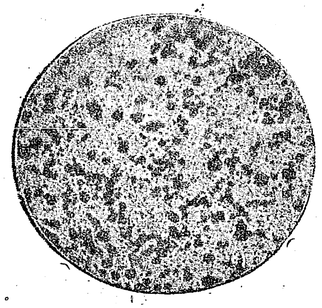

চোরধরা ক্যামেরা ২

(Locard সাহেব ক্যামেরা দিয়ে টাকা জালিয়াতের নখের ভিতর থেকে ময়লা সংগ্রহ ক'রে তা'র ফটো তুলে তার দোষের সমর্থন ক'রছেন)

নিশীথ-রাতের ঘুম

শ্রীসমীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ

[দান্তে গাব্রিয়েল রসেটীর My Sister's Sleep
কবিতাটীর ভাবাবলম্বনে]

যীশুর জন্মিবার পূর্ব্বদিন। রাত্রি প্রায় ১২টা। অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে। ছিন্ন-ভিন্ন, শুভ্র মেঘের ফাঁক দিয়া ম্লান চন্দ্রালোক কুয়াসাচ্ছন্ন ধরণীর উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। একটী ছোট দোতলা বাড়ীর নীচের ঘরে একটী ম্লান দীপ জ্বলিতেছিল। এক ধারে খাটের বিছানার উপর একটি তরুণী এক মাস অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা ভোগের পর সবেমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মেয়েটীর মা এক মাস রাত্রি-জাগরণের পর কন্যার বিছানা হইতে নামিয়া একটি ছোট্ট স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন, ও একটী ছোট টুলের উপর বসিয়া ম্লান দীপালোকে মেয়েটীর জন্য একটী পশমের গলাবন্ধ বুনিতে লাগিলেন। মাঝখানের দুয়ার খুলিয়া, পাশের ঘর হইতে বছর বাইশের একটি যুবক প্রবেশ করিল।

যুবক। প্রমীলা কেমন আছে মা?

মা। চুপ, আস্তে কথা বল। এইমাত্র ঘুমিয়েছে। আজ এক মাস ধরে সারারাত ছট্‌ফট্ করেছে; এক দিনও ত এমন ঘুমায়নি অরুণ?

যুবক। "ঘুমিয়েছে! আঃ বাঁচলুম!" বলিয়া যুবকটি তরুণীর শয্যার কাছে গিয়া, ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। একটু পরে স্তব্ধ হইয়া মাতার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর ঘরের কোণে, একখানি চেয়ারে বসিয়া, একখানি পুস্তকের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

মা। এই যে গলাবন্ধটা দেখ্‌ছ অরুণ, এটা আজ রাত্রেই শেষ হয়ে যাবে; কাল সকালে ওকে এটা পরিয়ে দিতে পারব। ওকে কত দিনে ভাত দেওয়া যাবে অরুণ?

যুবক কথার জবাব দিল না। একদৃষ্টে খোলা বইখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

মা। এই যে জাফ্‌রাণী রঙটা, এটা ও ভারী পছন্দ করে; তাই আগাগোড়াই জাফরানী রঙের করলুম।

[যুবক কথার উত্তর দিল না। একটা নিশাচর পাখী ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। বহু দূরে একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। স্তব্ধ রাত্রি। আরও নিস্তব্ধ সেই ছোট্ট ঘরখানি; এত নীরব যে নীরবতার পদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ বাদে টং টং করিয়া গির্জ্জার ঘড়িতে বারটা বাজিল। বিক্ষুব্ধ শান্তি, একটু আন্দোলিত হইয়া আবার ধীরে ধীরে স্থির হইয়া আসিল। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যুবকটি কহিল,—

"ভগবান যীশু জন্মালেন মা।"

মা। যীশু জন্মালেন? এমনি একটা নিশীথ রাত্রে ভগবান কৃষ্ণও আঁধার কারায় জন্মেছিলেন। নমস্কার কর বাবা।

[সহসা উপরের ঘরে একটা চেয়ার সরানর শব্দ হইল। মনে হইল কে যেন এতক্ষণ বসিয়া ছিল,—হঠাৎ ঘড়ির আওয়াজ শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। সেই শব্দে ত্রস্ত হইয়া মাতা তাড়াতাড়ি নিদ্রিতা কন্যার বিছানার নিকট গেলেন। মেয়েটির মুখের দিকে তিনি অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর কন্যার কপালে হাত দিয়াই তিনি পাথরের মত নিশ্চল হইয়া গেলেন। অসহ্য বেদনায় তাঁহার মুখ বিকৃত হইয়া গেল। তিনি কহিলেন "এ কি হল অরুণ, আমার প্রমীলা কোথায় গেল?"

যুবকটি বই হইতে মুখ না তুলিয়া বলিল—"আমি অনেকক্ষণ থেকে জেনেছি মা, ও নেই।"

সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল। তাহার আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া ফোঁটা কয়েক অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। আর তাহার মা অর্দ্ধসমাপ্ত গলাবন্ধটা হাতে করিয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সঙ্গীত

[রচনা—শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ]

কত ভয়ে ভয়ে আকুল হৃদয়ে—
কত ব্যথা সয়ে দাঁড়ানু এসে;
লাজে নত শিরে নয়নের নীরে,
তোমারি দুয়ারে দিবস শেষে।

মোহের বিকারে বিপদ আঁধারে,
সীমারেখাহীন কাল পারাবারে;
আপনারে ছলি', পথে একা চলি',
দিশেহারা শুধু বেড়ানু ভেসে;
তাই বারেবারে বাঁচাতে আমারে
এস কাণ্ডারি নিমেষে হেসে!

তোমারি আসন রাখিয়া শূন্য
সয়েছি জীবনে অশেষ জ্বালা;
আপনার মাঝে গেঁথেছি শুধুই
হাসিকান্নার দীর্ঘ মালা!

ধূলি মাঝে যাহা হয়েছিল ধূলি,
কণ্ঠে যখন নিজে নিলে তুলি;
অন্ধ নয়ন গেল মোর খুলি
নিমেষ পরশে বুঝিনু শেষে—
আমারি লাগিয়া আছ হে জাগিয়া
ভুবনে ভুবনমোহন বেশে!!

[সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা]

ইমল-কল্যাণ—একতালা।

স্থায়ী।

	৩				১				২´			
II {	নর্সা	নধা	পধনা	|	পক্ষা	পা	পধনা	I	পধনা	ধা	পক্ষপা	|
	ক০	ত০	ভ০০		য়ে০	ভ	য়ে০০		আ০০	কু	ল০০	
	৩				০				১			
|	পধনা	ধপক্ষা	গমগরা	|	রগা	রা	গমা	|	গরা	রা	ন্‌া	I
	হৃ০০	দ০০	য়ে০০০		ক০	ত	ব্য০		থ্য০	স	য়ে	
	২´				৩				০			
I	রা	গরা	ন্‌রা	|	গমা	গরা	-ন্‌রসা	|	সন্‌া	সা	রা	|
	দাঁ	ড়া০	নু০		এ০	সে০	০০০		লা০	জে	ন	

১ ২´ ৩
| গা মগা রা I সা নৃসনা ধা | নৃধা পা হ্মপা |
ত শি॰ রে ন য়॰॰ নে র॰ নী রে॰

০ ১ ২´
| হ্মা ধা নৃধনা | রা গা হ্মগা I পা পা পধা |
তো মা রি॰॰ ছ য়া রে॰ দি ব স॰

৩
| র্নসা নধপা -হ্মগহ্মপা } II
শে ষে॰॰ ॰॰॰॰

অন্তরা।

০ ১ ২
II { গা গা পহ্মা | ধা পা র্সনা I সা র্সা নর্রা
মো হে র॰ বি কা রে॰ বি প দ॰

৩ ০ ১
| র্সা না সা | না র্রা র্গর্মা | র্গা র্রা -র্সা
আঁ ধা রে সা মা রে॰ খা হী ন

২´ ৩ ০
I না -র্সা নধা | পধা নপা হ্মগা } | { রা গা হ্মপা |
কা ল্ পা॰ রা॰ বা॰ রে॰ আ প না॰

১ ২´ ৩
| নধা হ্মা পা I পা হ্মা ধা | নধা পধা পহ্মগা |
রে॰ ছ লি প থে এ কা॰ চ॰ লি॰॰

০ ১ ২
| রা গা হ্মপা | গা মা গরা I না রা গা |
দি শে হা॰ রা শু ধু॰ বে ড়া নু

৩ ০
| সরা গমা -পধনর্সধপহ্মগরসা } | { সনা -সা রা |
ভে॰ সে॰ ॰॰॰॰॰॰॰॰॰ তা॰ ই বা

১ ২´ ৩
| গা মগা রা I সা নৃসা না | ধনা ধা পহ্মপা |
রে বা॰ রে বাঁ চা॰ তে আ॰ মা রে॰॰

০ ১ ২
| হ্মা ধা নধনা | রা গা -া I হ্মা গা হ্মপা |
এ স কা॰ন্ ডা রি ॰ নি মে ষ॰

৩
| পা পধনা -র্সনধপহ্মগহ্মপা } II
হে সে॰॰ ॰॰॰॰॰॰॰

সঞ্চারী।

০ ১ ২´
II { সা নৃসা পা | পা নধা -পা I হ্মা ধা নধা |
তো মা॰ রি আ স॰ ন্ রা খি য়া॰

৩ ০ ১
| হ্মপা হ্মা -গরা | রা গা হ্মপা | গমা গা রা I
শূ॰ ন্য ॰॰ স য়ে ছি॰ জী॰ ব নে॰

২´ ৩ ০
I না রা সরা | গরা নৃরা -সা | না সা রগা |
অ শে ষ॰ জা॰ লা॰ ॰ আ প না॰

১ ২´ ৩
| রা সনা না I রা সা না | ধনা ধা হ্মপা |
র মা॰ ঝে গেঁ থে ছি শু॰ ধু ই॰

০ ১ ২´
| না রা গা | -হ্মহ্মা পা ধা I -না র্সা -র্রর্সা |
হা সি কা ন্না র দী র্ ঘ ॰॰

৩
| নর্রা র্সনা -ধপহ্মপা } |
মা॰ লা॰ ॰॰॰॰

আভোগ।

০ ১ ২´
| { গা গা মপা | ধর্সা সা র্সা I র্সধা না র্সা |
ধূ লি মা০ ঝে০ যা হা হ ০ য়ে ছি

৩ ০ ১
| র্সা র্রনর্সা র্সা | না -র্রর্া র্গা | র্মা -র্রা নর্সা I
ল ধূ০০ লি ক ন্ ঠে য খ ন্ নি০

২´ ৩ ০
I র্সনা র্রা র্সা | নধা পধপক্ষ্মা -গরা | সা -ররা গা |
জে০ নি লে তু০ লি০০০ ০০ অ ন্ধ ন

১ ২ ৩
| ক্ষ্মপা -া রা I গা ক্ষ্মপা -া | পা ক্ষ্মধা -া |
য়০ ন্ গে ল মো০ র্ খু লি০ ০

০ ১ ২´
| গা ক্ষ্মা পা | পা ধনা না I ক্ষ্মা ধা নর্সা |
নি মে ষ প র০ শে বু ঝি নু০

৩ ০ ১
| র্সা নধা -পমপা } | { সন্া সা রা | গা মা গরা I
শে ষে০ ০০০ আ০ মা রি লা গি য়া০

২ ৩ ০
| সা ন্সা ন্া | ধ্া ন্ধ্া প্ক্ষ্মপ্া | ক্ষ্ম্া ধ্া ন্ধন্া |
আ ছ০ হে জা গি০ য়া০০ ভু ব নে০০

১ ২´ ৩
| রা গা ক্ষ্মা I গা ক্ষ্মা পা | পা পধনা -র্সনধপক্ষ্মাগক্ষ্মাপা } II II
ভু ব ন মো হ ন বে শে০০ ০০০০০০০

শোক-সংবাদ

৺কালীনাথ মিত্র

৺কালীনাথ মিত্র

গত ২৭শে মাঘ সোমবার কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণীগণের অগ্রণী কালীনাথ মিত্র সি-আই-ই মহাশয় ৮৫ বৎসর বয়সে অমর-ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি কেবল যে বিজ্ঞ, বহুদর্শী, প্রবীণ আইনজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা নয়; সকল প্রকার জনহিতকর অনুষ্ঠানেও তিনি যোগ দিতেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যরূপে তিনি কলিকাতাবাসীর যথেষ্ট মঙ্গল-সাধন করেন। ১৮৯৯ সালে মেকেঞ্জী স্বায়ত্ত-শাসন আইনের প্রতিবাদ-কল্পে কলিকাতা কর্পোরেশনের যে ২৮ জন সদস্য পদত্যাগ করিয়া তেজস্বিতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দেন, কালীনাথ মিত্র মহাশয় সেই সাবাস আটাশের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে, বাঙ্গালার আইন-ব্যবসায়, কলিকাতা হাইকোর্ট এবং সাধারণ প্রতিষ্ঠান যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহার আর পূরণ হইবার নহে। আমরা কালীবাবুর পরিবার-বর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী

বাঙ্গালাদেশের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিতার ওস্তাদ রাধিকা-প্রসাদ গোস্বামী মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। বাঙ্গালা-দেশের মধ্যে সেকালে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের প্রধান কেন্দ্র ছিল; বিষ্ণুপুরের রাজবংশ সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় এই বিষ্ণুপুরেই জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত সঙ্গীতেরই চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন এবং দেশের মধ্যে প্রধানতম সঙ্গীত বেত্তা বলিয়া সমাদর লাভও করিয়াছিলেন। অল্পদিন পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ নগরীতে যে সঙ্গীত-মজলিসের অধিবেশন হয়, গোস্বামী মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় সঙ্গীত-বিশারদগণ তাঁহার সঙ্গীত-পারদর্শিতার যথেষ্ট সমাদরও করিয়াছিলেন—তিনি সেখানে উচ্চ পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি শয্যাগত হন, এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই লোকা-

স্তরে গমন করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশ একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা হারাইয়া প্রকৃতপক্ষেই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। আমরা গোস্বামী মহাশয়ের আত্মীয়-স্বজনগণের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

৺যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

"নায়কে"র অন্যতম স্বত্বাধিকারী যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত ৭ই ফাল্গুন প্রত্যূষে ইহলোক ত্যাগ করিয়া, পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪১ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে কিছুদিন ধরিয়া তিনি রোগ-শয্যাশায়ী ছিলেন। নায়কের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তিনি মধ্যম পুত্র। যুগল ভ্রাতার সহযোগিতায় নায়কের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, মিষ্টভাষিতা, আশ্রিত-বাৎসল্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে তিনি পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার নাবালক চারিটি পুত্র, একটী জ্যেষ্ঠ ও একটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিধবা পত্নী, বৃদ্ধা জননী বর্ত্তমান। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা জানাইতেছি।

৺দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা গভীর শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, বাঙ্গলার সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহারই উদ্যোগে বঙ্কিমের জন্মস্থান কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্কিম-তীর্থে প্রতি বৎসর বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দের সমাবেশ হইয়া আসিতেছে। তিনি সম্প্রতি মাতামহের জীবন-চরিত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—কিন্তু আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই অকালে প্রস্থান করিলেন। প্রার্থনা করি, তাঁহার পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুন।

বাদ-প্রতিবাদ

সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক ?

(প্রতিবাদ)

শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিগত ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত লিখিত "সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখিকা আক্ষেপ করিয়াছেন যে "সতীত্ব" কথাটা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে আজকাল বিপুল বাগ্‌যুদ্ধ চলিতেছে, কিন্তু এই সতীত্ব শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এবং সতীত্বই বা প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা এ পর্য্যন্ত খোলাখুলি ভাবে কোথায়ও আলোচিত হয় নাই।" উক্ত প্রকারে তিনি এই বিষয়ের খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করিয়া নারীর সতীত্ব-সমস্যার যে সমাধান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও সৎসাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার এই সমাধান তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা বিদুষী রমণীর পক্ষে সত্য হইলেও, তাহা যে আমাদের নারী-সমাজের ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক নারীর পক্ষেই সত্য, এ কথা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আমার বোধ হয়, লেখিকা এ কথা অবগত নহেন যে, অনেক সময়ে দেশ-কাল-পাত্রাদিভেদে, বিশেষতঃ সামাজিক ব্যাপারসমূহে, প্রকৃত সত্য যাহা,—সমাজের মঙ্গল হেতু, অন্ততঃ প্রকাশের জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিয়া,—তাহাও কিছু সময়ের জন্য অপ্রকাশ রাখিতে হয়; নতুবা সামাজিক অবস্থা সকলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, এবং দেশ-কাল-পাত্রাদি বিবেচনা না করিয়া, অসাময়িক সত্য প্রকাশের ফলে, জগতের ইতিহাসে, সত্যের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয়াধিক্য হইয়া মানব-সমাজে কতবার কত যে ভীষণ অকল্যাণ সংঘটিত হইতে শুনা গিয়াছে তাহার সীমা নাই।

যে আশঙ্কার কথা আমি বলিলাম, সেই আশঙ্কা যে লেখিকার মনেও প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে অতর্কিতে দুই একবার উঁকি মারে নাই, তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? তিনি যে 'আকুতি' বা মনোধর্ম্মের প্রভাব বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—'প্রবৃত্তির স্রোতে গা-ভাসাইয়া দেওয়ার স্বপক্ষে তিনি কিছু বলেন নাই, এবং পাঠক-পাঠিকারাও যেন সেরূপ মনে না করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে',—তাঁহার এ সকল উক্তির তাৎপর্য্য কি? ইহাতে তো স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সমাজের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার এই সত্য প্রকাশ করিতে তিনিও মনে একটু আশঙ্কা ও সংশয় অনুভব করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আজ যখন নারী-সমাজ হইতেই কোনও উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা কর্ত্তৃক ঐ সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তাহাতে আনন্দিত হইবারই কথা। কিন্তু আনন্দের পরিবর্ত্তে আমার মনে যুগপৎ যে সংশয় ও আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে, সম্যক্‌ভাবে আলোচনা দ্বারা তাহা দূর করিয়া কোনও স্থির মীমাংসায় উপনীত হইবার ইচ্ছায়, লেখিকার প্রকাশিত সত্য সম্বন্ধে যাহা আমি সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আমার বক্তব্য এই যে, যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে নারীগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সম্যক্ উন্নতি হইয়া, তাঁহারা সভ্য ও শিক্ষিত জগতের অন্যান্য নারী-সম্প্রদায়ের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মের প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হইয়া সর্ব্বপ্রকারে পুরুষের সাহায্যকারিণী হইতে এবং অত্যাচার নির্য্যাতন প্রভৃতি হইতে বুদ্ধি ও কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থা না হয়েন, তত দিন পর্য্যন্ত লেখিকার প্রকাশিত সত্য বর্ত্তমান নারী-সমাজে প্রচারিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত নহে। কেন না, শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব হেতু, অশিক্ষিতা দুর্ব্বলচেতা নারী তাঁহার এই সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা না বুঝিয়া, পুরুষের স্বতঃ চিত্তাকর্ষী দেবোপম কোনও মহৎ গুণে আকৃষ্ট হইলে, এবং দেহ ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করতঃ সেই গুণের আদর বা পূজা করিবার জন্য উন্মুক্ত বাতাসে স্বাধীন ভাবে বাহির হইতে পারিলে, যে, প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে না, তাহাতে বিশ্বাস কি? সুতরাং লেখিকা তাঁহার এই সত্য বর্ত্তমান সমাজে প্রকাশিত করিয়া সঙ্গত কি অসঙ্গত আচরণ করিয়াছেন, তাহার বিচারের ভার স্বয়ং লেখিকা এবং 'ভারতবর্ষের' অন্যান্য পাঠক-পাঠিকাগণের উপর ন্যস্ত করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। এক্ষণে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন লেখিকার প্রবন্ধের তাৎপর্য্য, আমার বক্তব্য বিষয়, এবং আমাদের বর্ত্তমান দুর্ব্বল নারী-সমাজের সকল প্রকার হীনাবস্থার বিষয়, বিশেষভাবে বিবেচনা ও বিচার করিয়া তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন।

প্রবন্ধের শেষভাগে লেখিকা কবীন্দ্র রবীন্দ্রের ভাষায় কুসংস্কার-প্রপীড়িত দুর্ভাগ্য দেশের মঙ্গল কামনাচ্ছলে, তাঁহার আপন প্রাণের অতি উচ্চ গোপন আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের নিকট কাতর ভাবে জানাইয়া যে প্রার্থনা করতঃ প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন, তাহাতে আরও মনে হয় যে, তিনি শুধু উচ্চ শিক্ষিতা নহেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ভগবানে ভক্তি বিশ্বাসও আছে; তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি বোধ হয় আমাদের নারী-সমাজের সমগ্র নারীকেই তাঁহার কল্পিত আদর্শে গড়িয়া লইয়াছেন; নতুবা, তাঁহার এই সতীত্ব সমস্যার সমাধান কখনই তিনি সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতে সাহসী

হইতেন না। আমাদের নারীসমাজের অধিকাংশই অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা। তাঁহারা এই সত্যের মর্য্যাদা বুঝিয়া, দেহ-মনের পবিত্রতা রক্ষা করতঃ; তাঁহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মজীবনের সমস্ত আচার ব্যবহার সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে সমর্থা আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। পরন্তু লেখিকা যদি তাঁহার এই সত্য প্রকাশিত করিবার জন্য ব্যগ্র না হইয়া উহা মনে মনে রাখিতেন, এবং অন্যান্য নারীগণকে উহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি কর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে এই সত্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা সাধন করিতে মৌখিক উপদেশ প্রদানে যত্নবতী হইতেন, তাহা হইলে মনে হয়, তাঁহার এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং মহৎ উদ্দেশ্য কালে পরিপূর্ণ হইবার আশা সুদূর হইলেও খুব সুনিশ্চিত হইত। লেখিকা বলিয়াছেন যে, প্রকৃত মহত্ত্ব বা গুণের আদর বা পূজা করিলে তাহাতে নারীর সতীত্বের হানি হয় না—যদি না তাহাতে অভিভূতা হইয়া পড়া যায়। কিন্তু এ কথা তাঁহার বুঝা উচিত যে, শিক্ষিতা নারীর ন্যায়, অশিক্ষিতা নারীর মনোধর্ম্মগুলি শিক্ষার অভাব হেতু সুসংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত না হওয়ায়, সে কখনই বিবেকবুদ্ধির বলে সেই অভিভূত অবস্থা বা আসক্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থা হয় না; এবং কেবলমাত্র সামাজিক কঠোর শাসনের ভয়ে ভিন্ন, জ্ঞানের প্রভাবে স্বামীকে ব্রহ্মের প্রতীক্ বা ঈশ্বরের সাকার বিগ্রহ-স্বরূপ উচ্চ ভাব হৃদয়ে পোষণ করতঃ তাঁহাতে অটল অচল ও সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা সুগভীর স্বামী-প্রেমে একনিষ্ঠাবতী হইতেও পারে না। সুতরাং এইরূপ অশিক্ষিতা নারী উন্মুক্ত বাতাসে স্বাধীন ভাবে বেড়াইবার অধিকারও পাইতে পারে না; নতুবা যিনি স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ সুগভীর প্রেম অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রাখিতে সমর্থা, তিনি দেহ মনের পবিত্রতা রক্ষা করতঃ উন্মুক্ত বাতাসে বেড়াইবার স্বাধীনতা পাইবারও যোগ্যা এবং তিনি স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের কোনও মহৎ গুণের পূজা বা আদর করিয়াও স্বামীর কাছে প্রত্যবায়ভাগিনী হয়েন না এবং সমাজেও তাঁহার আচার ব্যবহার দূষণীয় বিবেচিত হয় না; কিন্তু যেখানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে, সেইখানেই চারিদিক হইতে আপত্তি ও সোরগোল হইতে থাকে। কেন না সমাজ কখন ব্যভিচার সহ্য করিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত তো আমরা প্রতি দিনই সমাজে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

আর একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। লেখিকা বলিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের নারী সমাজের তুলনায় আমাদের নারী-সমাজে সতী নারীর সংখ্যা যে শতকরা হিসাবে অনেক বেশী, তাহাতে আমাদের আনন্দে অধীর হইবার বা গর্ব্ব প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। কেন না আমাদের দেশের নারীর সতীত্বে গোঁজামিল, গলদ ও ফাঁকির মাত্রাও খুব বেশী। কিন্তু যদিও এ কথা অনেকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিবেন, তথাপি খুব অল্প লোকেই তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সাহসী হইবেন। নারী-সমাজের সে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই, বরং ঘরের কথা পরের কাছে প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। ইহাতে আমাদের সৎসাহসের অভাব আছে বলিয়াও লেখিকার আক্ষেপের কোনও কারণ দেখি না। যাহা হউক, লেখিকার এই কথাটী সত্য হইলেও, এ সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, আমাদের নারীগণের সতীত্বে যে সকল গোঁজামিল, গলদ ও ফাঁকি বর্ত্তমানে দেখা যায়, তাহার জন্য আমাদের দেশের বহুদর্শী ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য মুনি ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত শাস্ত্রসকল ও প্রাচীন কালের সামাজিক বিধি-বিধানসমূহ সম্পূর্ণ দায়ী নহে। আমাদের শাস্ত্র ও সামাজিক বিধি-বিধান সকল, যাহা আধুনিক শিক্ষিত সমাজে কুসংস্কার বলিয়া বিবেচিত ও উপেক্ষিত হয়, তাহা এক সময়ে নারীর সতীত্বের যে অতি উচ্চ মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কালপ্রভাবে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সতীত্বের সে মহান্ আদর্শের স্থান আমাদের বর্ত্তমান নারী সমাজ হইতে ক্রমশঃই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এবং ইহাই, অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণ যে সতীত্বের গোঁজামিল, গলদ ও ফাঁকির মাত্রাধিক্যের অন্যতম প্রধান কারণ, এ কথা বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। আমাদের দেশের নারীর শিক্ষা সভ্যতা ও কর্ম্ম আমাদের দেশের উপযোগী হওয়াই উচিত। বিদেশীয় ভাষা শিক্ষায় কোন দোষ হয় না, কিন্তু বিদেশীয় আচার ব্যবহার ও সামাজিক রীতিনীতির অনুকরণ করিলে মানব-সমাজে কিরূপ শোচনীয় অধঃপতিত অবস্থায় থাকিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত হতভাগ্য বঙ্গসন্তান, ততোধিক তাহাদের অশিক্ষিত দুর্ব্বল নারী-সমাজ! বর্ত্তমানে যতই গোঁজামিল, ফাঁকি, গলদ আমাদের দেশের নারীর সতীত্বে দেখা যাক্ না কেন, লোকে যখন সুদৃঢ় সমাজ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া সমাজের বিধি, নিষেধ ও শাসন সকল মানিয়া চলিত, সমাজ-বন্ধন যখন এত শিথিল ছিল না, সেই প্রাচীন কালের কথা বাদ দিলেও, বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় সভ্য ও শিক্ষিত জাতির নারী-সমাজের তুলনায় ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের নারী-সমাজেই প্রকৃত সতী নারীর সংখ্যা অধিক, এবং বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত সতীত্বের আদর্শ যদি জগতে কোথাও কিছু থাকে, তবে তাহা এই বঙ্গদেশেই আছে। নারী মাত্রেই সৃষ্টির আদিকারণভূত মহা-আদ্যাশক্তির অংশ বিশেষ। বিশেষতঃ ভারতের মধ্যে বঙ্গনারীতে সেই মহাশক্তির যে কি মহাবিকাশ আছে, তাহা যেদিন বঙ্গের নারী-সম্প্রদায় সুশিক্ষার প্রভাবে সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, সেই দিন হইতেই বাস্তবিক ভারতের আবার সুদিন ফিরিয়া আসিবার সূত্রপাত হইতে থাকিবে। আমার বোধ হয়, এই জন্যই বুঝি, বঙ্গের নারী-শক্তির প্রভাব ও মর্য্যাদা অনুভব করিয়া, স্বার্থত্যাগী মহানুভব দেশবন্ধু দাস মনোমোহন নাটমন্দিরের রঙ্গমঞ্চে স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতিকল্পে আহূত কোনও এক সভাতে কবিবরের কোনও একখানি প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটকের সমালোচনায় কথা প্রসঙ্গে বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর অন্য সকল দেশের নারী-জাতির তুলনায় আমাদের বঙ্গনারীর এমন কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা অন্য দেশের নারীতে নাই; আর এই জন্যই বোধ হয়, বর্ত্তমান সময়ে ভারতব্যাপী গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের সহিত

ভারতীয় নারী-সমাজ-সমস্যার সমাধানেরও তীব্র আন্দোলন ও আলোচনার সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। অধঃপতিত পরাধীন জাতির পক্ষে তাহাদের নারী-সমাজের এই মহাজাগরণ যে সত্যই অদূর-ভবিষ্যতে শক্তি ও স্বাধীনতা লাভের নিদর্শন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের কর্ত্তব্য এখন, নারী-সমাজের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করতঃ নারীগণকে যোগ্যতানুসারে স্বাধীনতা এবং কর্ম্মক্ষেত্রে নারী-জনোচিত সকল প্রকার কর্ম্মের প্রতিযোগিতায় প্রবেশাধিকার দেওয়া। তাহা হইলে তাঁহারা বিপদকালে আত্মরক্ষা করিতে এবং পুরুষ-সমাজকে সকল প্রকার কার্য্যে সহায়তা প্রদান করিতে পারিবেন। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কুসংস্কারের সীমাবদ্ধ গণ্ডী সকল কাল-[illegible] হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। নতুবা অসময়ে গর্ব্ব ও [illegible] পূর্ব্বক তাহাদের উচ্ছেদসাধন করিতে গেলে, বরং বিপরীত ফল ফলিবারই সম্ভাবনা অধিক। যত দিন আমাদের নারী-সমাজ সম্যক্ রূপে সুশিক্ষিতা হইয়া স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য না হইতেছেন, তত দিন সামাজিক কুসংস্কারের উচ্ছেদসাধন করতঃ তাহাদিগকে অন্যায় স্বাধীনতা দিয়া এবং লেখিকার প্রকাশিত সতীত্ব-সমস্যার সমাধান নারী সমাজে প্রচারিত করিয়া দিলে, বহু দিনের পুরাতন বাঁধ ভাঙ্গিয়া দুর্ব্বল নারী-সমাজের উপর দিয়া যখন স্বাধীনতার প্রবল বন্যার প্রবাহ বহিতে থাকিবে, তখন অধিকাংশ অশিক্ষিতা নারীই যে লেখিকার এই সত্য-সমাধানের দোহাই দিয়া উচ্ছৃঙ্খল-বৃত্তি-পরায়ণা ও স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া সেই প্রবাহের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দিশেহারা হইয়া চলিয়া যাইবে, তাহার পরিণতিই বা কি হইবে, কে বলিতে পারে? লেখিকা কি তখন তাহাদিগকে সেই প্রবল প্রবাহের মুখ হইতে ফিরাইয়া রক্ষা করিতে পারিবেন? যদি না পারেন; তবে আমাদের নারী-সমাজের মধ্যে সতীত্বের যে গোঁজামিল, গলদ ও ফাঁকি দেখিয়া তিনি আশঙ্কিত হইয়াছেন, তাহার মাত্রা যে আরও অধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে এবং তাহার পরিণাম নারী-সমাজের পক্ষে যে কি ভয়াবহ হইয়া উঠিবে, তাহা কি তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছেন? আমার মনে হয়, তিনি যে মহান্ সত্য প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই মহাসত্যের অনাবিল আনন্দে ও মত্ততায় এত অধিক পরিমাণে অধীরা ও আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, এতদূর ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিবার শক্তি তাঁহার তখন ছিল না, অথবা থাকিলেও তিনি সে বিবেচনা করিবার কোন আবশ্যকতাই বোধ করেন নাই। আমাদের দেশের নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে যদি এইরূপ শাস্ত্রীয় কঠোর বিধি-বিধানের দ্বারা নিয়ম ও সংযমের মধ্য দিয়া সামাজিক সুশাসন ও সুশৃঙ্খলার ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে এ অধঃপতিত পরাধীন দেশের অশিক্ষিত দুর্ব্বল নারী-সমাজের আজ যে আরও কত ভীষণ শোচনীয় দুরবস্থা চোখে দেখিতে হইত, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে! তাই আবার বলি, যত দিন আমাদের নারী-সমাজ সম্যক্ রূপে শিক্ষিতা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বলবতী হইয়া আত্মরক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সমর্থা না হয়, তত দিন লেখিকার প্রকাশিত সতীত্ব-সমস্যার এই সমাধান সমাজে প্রচারিত হইয়া নারী সাধারণ কর্ত্তৃক গৃহীত বা প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহার ফল সমাজের পক্ষে কখনই শুভজনক হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

সাময়িকী

এই চৈত্র মাসের 'ভারতবর্ষে' যে মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তাঁহারও কি পরিচয় প্রদান করিতে হইবে? বাঙ্গালা দেশে এমন কেহ কি আছেন, যিনি 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি, বাঙ্গালার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের পরিচয় জানেন না?

আমাদের দেশে পূর্ব্বে দেখিয়াছি, চৈত্র মাস পড়িলেই গ্রামের গ্রহাচার্য্যগণ ধনী-নির্ধন সকলের বাড়ীতে যাইয়া আগামী বৎসরের পঞ্জিকা শুনাইয়া আসিতেন; কে রাজা, কে মন্ত্রী, কত আড়া জল, দুর্গোৎসবে দেবীর কোন্ যানে গমনাগমন, ফলং কি, এ সকল কথা গৃহস্থগণ গ্রহাচার্য্যের মুখে শ্রবণ করিতেন এবং বৎসরের ফলাফল শ্রবণে পুণ্য-সঞ্চয় করিয়া গ্রহাচার্য্যগণকে দক্ষিণা দানে পরিতুষ্ট করিতেন। এখন বাজারে নূতন পঞ্জিকার ছড়াছড়ি হওয়াতে গ্রহাচার্য্যগণের একটা আয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে; বিশেষ 'কে বা হইল রাজা, আর কে বা মন্ত্রীবর' এ সংবাদ এখন গ্রহাচার্য্যের নিকট না লইয়া 'রয়টারের' মারফৎই জানিতে পারা যায়। এখনকার নূতন পঞ্জিকা অন্য ক্ষেত্র হইতে শুনিতে হয় এবং তাহার ফল, মনোকষ্ট, হা হুতাশ!

কিন্তু তাহা বলিয়া উপায় নাই; 'ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকাদিগকে ইংরাজী মতে নববর্ষের পঞ্জিকা শ্রবণ করাইব। সে পঞ্জিকার বিলাতী নাম বজেট অর্থাৎ আগামী বৎসরের আয় ব্যয়ের আনুমানিক তালিকা। এ তালিকা সকলেরই শুনিয়া রাখা কর্ত্তব্য; কারণ ইহাতে ষড় রসের সমাবেশ আছে, এবং এই তালিকার তালিম

দেওয়া উপলক্ষে ব্যবস্থাপক সভাদিতে যে বাগ্‌বিভূতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা স্বয়ং মহাদেবও কখন প্রদর্শন করিয়াছেন কি না, এবং করিতে পারেন কি না, সন্দেহ। অতএব 'বৎসরের ফলাফল' 'পশুপতি'র নিকট না শুনিয়া ভারতের ও বাঙ্গালার রাজস্ব-সচিবদ্বয়ের মুখে অবগত হউন।

প্রথমেই ভারতের আয়-ব্যয়ের কথা নিবেদন করিতেছি। অস্মিন বর্ষে (অর্থাৎ ১৯২৫ এপ্রিল হইতে ১৯২৬ মার্চ্চ পর্য্যন্ত) রাজস্ব-সচিব ভারতের রাজস্বের আয় ১৩৩ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন আর খরচের বাবদ ধরিয়াছেন ১৩০ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা। তাহা হইলে ৩ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা আয় উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বজেটে যে সকল বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা :—

বাঙ্গালাকে তাহার দেয় রাজস্বের মধ্য হইতে যে ৬৩ লক্ষ টাকা কয়েক বৎসর হইল মকুব দেওয়া হইয়া আসিতেছিল, তাহা আরও তিন বৎসর মকুব দেওয়া হইবে।

মান্দ্রাজকে ১২৬ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশকে ৫৬ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাবকে ৬১ লক্ষ টাকা ও ব্রহ্মদেশকে ৭ লক্ষ টাকা দেয় রাজস্বের মধ্য হইতে মকুব দেওয়া হইবে।

এবারের বজেটের মোট খরচের বরাদ্দের পরিমাণ ১৩০ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে ৫৬ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা সমর বিভাগের খরচ বাবদ ধরা হইয়াছে।

চাকুরী কমিশনের সুপারিশ মত ভারত সরকারের উপরিতন কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি বাবদে ২৫ লক্ষ টাকা অধিক খরচা ধরা হইয়াছে।

১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত নূতন দিল্লী নির্ম্মাণের বাবদ ১০ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা খরচ হইবে।

এবার ইন্‌কম ট্যাক্সের আয় ১৭ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

বাণিজ্য শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে। ভুষা মালের উপর শতকরা ২॥০ টাকা হারে যে আমদানী শুল্ক লওয়া হইত তাহা তুলিয়া দেওয়া হইবে ও এক্ষণে প্রতি এক এক গেলন পেট্রলে মাত্র চারি আনা হিসাবে শুল্ক লওয়া হইবে।

১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে টাকার মূল্য হইবে দেড় শিলিং করিয়া। গত বৎসরে টাকার দর ইহা অপেক্ষা কম ছিল।

বিমান বিভাগের ইমারত তৈয়ারী বাবদ ৪৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

ডাক মাশুল বা লবণের শুল্ক হ্রাস করা হইবে না।

উপরিলিখিত বর্ণনার মধ্যে যে কয়টি কথা আমাদের আমরা প্রকাশ করিলাম, তাহা পাঠ করিলেই এবং সপ্রীতি মনোযোগ করিলেই ভারত-গবর্ণমেণ্টের বজেটের স্বরূপ অবগত হইত পারিবেন ; সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের ন্যায় বৃথা বক্তৃতা করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। একটী বিষয়ের দিকে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর ৬৩ লক্ষ টাকা ভারত-গবর্ণমেণ্টের সেলামী দিবার ব্যবস্থা ছিল ; কিন্তু বিশেষ দয়া-পরবশ হইয়া এবং বাঙ্গালা দেশের অবস্থা কাহিল দেখিয়া, ভারত গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব কয়েক বৎসর উক্ত সেলামী রেহাই দিয়াছিলেন, এবং এ বৎসর ঘোষণা করিতেছেন যে আগামী তিন বৎসরের জন্য এ সেলামী রেহাই দেওয়া হইল। এ জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে বেইমানী করা হয়।

অতঃপর ঘরের কথা, অর্থাৎ আগামী বৎসরে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে বাঙ্গালার রাজস্ব-সচিব মহোদয় কি বলিতেছেন তাহা শ্রবণ করুন।

গত বৎসর কাউন্সিল বজেটে ১০, ২৬, ৯৮,০০০ টাকা আয় এবং ১০ ৩০, ৯৭০০০ টাকা ব্যয় দেখান হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরের সমস্ত আয় ব্যয় খতাইয়া দেখা যাইতেছে যে, এবার আমাদের ৬৬॥০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে যদি আমাদিগকে আমাদের প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ভারত সরকারকে ভাগ দিতে হইত, তবে আমাদের ২৬॥০ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি পড়িত।

আগামী বর্ষে মোট আয় ১০, ৫৫, ১১০০০ টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। উহা গত বৎসরের রাজস্ব হইতে ১০॥০ লক্ষ টাকা বেশী। আবগারী বিভাগ হইতে ১৭ লক্ষ টাকা আয় বেশী হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমে ভাল হইতেছে বলিয়া ষ্টাম্প হইতে ১০ লক্ষ টাকা আয় বেশী হইবে ধরা হইয়াছে। আগামী বর্ষে মোট ব্যয় ১১,৪৪,১১০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান হইয়াছে। উহা বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত ব্যয়তালিকা হইতে ১৩৬ লক্ষ টাকা বেশী। আমাদের বর্ত্তমান বৎসরের আয় হইতে ব্যয় ৮৯ লক্ষ টাকা বেশী হইবে।

সাধারণ শাসন বিভাগে বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত ব্যয় তালিকা হইতে আগামী সনে ৬॥০ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে। ইহার কারণ বর্ত্তমান বৎসর ঐ বিভাগের ব্যয়ে মন্ত্রীদের বেতন ব্যয়ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ৮৩,০০০ টাকা গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসনের জন্য সার্কেল অফিসার নিয়োগের বাবদ ব্যয় হইবে।

পুলিশ বজেটে, গত বৎসরের সংশোধিত ব্যয় তালিকা হইতে ৩ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় ধরা হইয়াছে। এই বৃদ্ধির কারণ লী কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে কার্য্য করায় খরচ বৃদ্ধি ভ্রমণের ভাতা এবং বিপ্লববাদীদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়।

উপরে যে সকল ব্যয়ের বিবরণ দেওয়া হইল, সে গুলি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের খাস বিভাগের ব্যয়। ইহা ব্যতীত আর একটী বিভাগ আছে, যাহার নাম হস্তান্তরিত বিভাগ। এ বিভাগের ব্যবস্থা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের মতানুসারে মন্ত্রীগণ করিয়া থাকেন। গত বৎসর ত মন্ত্রী-বিভ্রাটের জন্য স্বয়ং লাট বাহাদুরকেই এই 'হস্তান্তরিত' বিভাগকে আবার 'হস্তে' লইতে হইয়াছিল। এবার না কি পুনরায় মন্ত্রী বাহাল হইবে এবং হস্তান্তরিত বিভাগগুলি পূর্ব্বের মত হস্তান্তরিত হইবে, এবং তাহার ব্যয়ের বিবরণ বজেটে বিবৃত হইয়াছে। নিম্নে তাহার সার সঙ্কলিত হইল।

স্বাস্থ্য

আগামী বৎসরের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগে ১,২৫,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। এই টাকা দেশবন্ধু দাশের প্রস্তাবানুসারে পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে জেলা বোর্ড সমূহের হস্তে দেওয়া হইবে।

শিক্ষা

বর্ত্তমান বৎসরে শিক্ষা বিভাগে, গত বৎসরের চেয়ে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় ধরা হইয়াছে। উহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ ২ লক্ষ টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রাম কলেজের জন্য একটী হিন্দুহোষ্টেলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল স্কুলের জন্য সাহায্য করা হইবে।

পল্লীগ্রামে জলকষ্ট নিবারণ

গত বারের বজেটে পল্লী গ্রামের জলকষ্ট নিবারণের জন্য মোট ৫০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এবারকার বজেটে পল্লীর জলকষ্ট নিবারণের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা ধরা হইয়াছে।

কচুরী পানা ধ্বংস

বাঙ্গালা দেশে কচুরীপানা ধ্বংসের জন্য এবারকার বজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ২১ হাজার টাকা। আর বাঙ্গলা দেশে খেজুরে গুড়ের উন্নতি বিধানের জন্য ৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

বিগত শিবরাত্রির ছুটীর সময় মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দুই দিন সভার অধিবেশন হয়। প্রথম দিনে মঙ্গলাচরণের পর মেদিনীপুরের জজ্ সাহেব উৎসবের উদ্বোধন করেন। তাহার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্থানীয় খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মাইতি মহাশয় অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুললিত অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণে তিনি রাজা

রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সমস্ত পরলোকগত সাহিত্যিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সাহিত্য-সেবার বিবরণ বিবৃত করিয়াছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর পরিষদের সদস্যগণ রবীন্দ্রনাথের 'রাজা-রাণী'র অভিনয় করেন। পরদিনের সভায় কয়েকটী প্রবন্ধ পঠিত হয়; তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম-এ, বি-এল মহাশয়ের প্রবন্ধ বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নাড়াজোলের কনিষ্ঠ কুমার বাহাদুর এবং ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়দ্বয় বিদেশাগত সাহিত্যিকগণের অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন এবং কনিষ্ঠ কুমার বাহাদুর সকলকে প্রীতিভোজনে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের সাহিত্য-সেবকগণের, বিশেষভাবে স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত মনীষি বাবু ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর একাগ্রতা ও আগ্রহ বিশেষ প্রশংসার্হ।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাঁহারা লাট-বেলাট হইয়া আসিতেন, তাঁহারা পাঁচ বৎসর ব্যাপী কার্য্যকালের মধ্যে কেহই ছুটী লইয়া 'হোমে' যাইতে পারিতেন না, পাঁচ বৎসর পরে একেবারে বিদায়। ইহাতে না কি লাট বাহাদুরেরা এখন হাঁফাইয়া উঠিতেছেন; বিশেষতঃ দেশের যে প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে না কি বিলাতের কর্ত্তাদের সঙ্গে বড়লাট বাহাদুরের মধ্যে মধ্যে পরামর্শের প্রয়োজন হইয়াছে; সে পরামর্শ তার বা পত্রযোগে হওয়া নানা কারণে বাঞ্ছনীয় নহে। এই শেষোক্ত কারণে আমাদের বড় লাট মাননীয় লর্ড রেডিং বাহা[illegible] আগামী এপ্রিল মাসে বিলাত যাইতেছেন; চারি মাস পরেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে বাঙ্গলার গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড লিটন বাহাদুর বড় লাটের কার্য্য করিবেন এবং মাননীয় ষ্টিফেনসন সাহেব এই চারিমাস বাঙ্গলার লাটগিরি করিবেন। বিহারের লাট মাননীয় সার হেনরী হুইলার বাহাদুরও এপ্রিল মাসে তিন মাসের ছুটীতে বিলাত যাইবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ প্রণীত ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত নূতন পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক "গোলকুণ্ডা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—১৲।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বি-এল প্রণীত (নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু লিখিত ভূমিকা সহ) "রাণীর কবর" প্রকাশিত হইল; মূল্য—॥০।

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত বি এ প্রণীত উপন্যাস "লাল-পতাকা" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১[illegible]

৺দীননাথ ধর প্রণীত "উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর" প্রকাশিত হইল; মূল্য—॥০।

পরশুরাম রচিত ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার [illegible] বিচিত্রিত "গড্ডালিকা" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১।০।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত—মহাকবি বিদ্যাপতি বিরচিত "কীর্ত্তিলতা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—১৲।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "[illegible]কের বালাই" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲।

ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রণীত "প্রাচীন হিন্দু দণ্ডনীতি" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল; মূল্য—১॥০।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সোহাগী" প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৵০।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

নাগ পঞ্চমী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.